ঝাঁসীর রাণী

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৬৩

প্রকাশক

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট

অজিত গুপ্ত

মুদ্রক

রণজিৎকুমার দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

পাঁচ টাকা

ভূমিকা

আমার শৈশব কেটেছে অন্য এক যুগে, অন্য এক দেশে। প্রকৃতি সে-দেশে একাধারে কঠোর ও কোমল। পদ্মার উন্মত্ত তরঙ্গ একদিকে যেমন গ্রাস করত গ্রাম আর জনপদ, অন্যদিকে তেমনি শরতের স্নিগ্ধ সকালে যখন প্রতিমার খড়ের কাঠামোতে মাটি পড়ত, তখন দেখা যেত সবুজ ঘাসে ঘাসে শিউলি ফুলের সমারোহ, আকাশের অসীম নীলে শাদা মেঘের লঘুসঞ্চার আর ধান ক্ষেতের মাথায় মাথায় বাতাসের অবিশ্রান্ত লুটোপুটি। আবার কখনও মেঘলা দিনের অস্পষ্ট জ্যোৎস্না রাতে বাইরে তাকালে চোখে পড়ত আদিগন্ত মাঠের মায়াময় রূপ। সেইসব দিনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল অজস্র রূপকথা। সে-পরিবেশে সবই যেন রূপকথার রূপ নিত। শোনা গল্প বারবার শুনেও তৃপ্তি হত না। এই সময় একদিন ঝাঁসীর রাণীর গল্প শুনিয়েছিলেন দিদিমা। লণ্ঠনের আবছা আলোতে তাঁর মৃদু কণ্ঠের সেই গল্প এক আশ্চর্য রূপকথার মতো বোধ হয়েছিল।

সেইসব দিনের মতো সেই মানুষটিও আজ বিগত, সঙ্গে সঙ্গে বিগত হয়েছে সেইসব রূপকথা। তবু সেইদিন থেকেই ঝাঁসীর রাণীর কাহিনী আমার মনে ভাস্বর হয়ে আছে।

তারপর শিক্ষা ও ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে সঙ্গে যখন জাতীয় জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা বাড়ল তখন ঝাঁসীর রাণীর কাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ এক গ্রন্থ রচনার বাসনাও মনে উদয় হল। কিন্তু প্রচেষ্টার শুরুতেই দেখলাম ১৮৫৭-৫৮ সালের অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমাদের জানবার অবকাশ একান্ত সীমাবদ্ধ। ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখা বই ছাড়া প্রামাণ্য বই-এর একান্ত অভাব। প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্র বা অন্য কোন নজীর মেলাও দুরূহ। একমাত্র রজনীকান্ত গুপ্ত ব্যতীত ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশাল অভ্যুত্থান সম্পর্কে আর কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাই হয়নি। কিন্তু তা না হলেও এই অভ্যুত্থানের গুরুত্বকে মর্যাদা দেবার সময় আজ এসেছে।

অবশ্য সেদিন এই অভ্যুত্থানে ভারতীয়দের প্রবল ইংরেজ বিদ্বেষ দেখে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়েছিল নিঃসন্দেহ, তাই সযত্ন-প্রয়াসে ইতিহাস থেকে তারা এই দুটো বছরকে অংশত মুছে দিতে চেয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে নির্মম অত্যাচার এবং নির্বিচার নরহত্যা করেই শুধু তারা ক্ষান্ত হয়নি, এই অভ্যুত্থান সম্পর্কে যা-কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণ সমস্ত বিলুপ্ত করবার জন্য তারা এই সংক্রান্ত সব কাগজ-পত্র হস্তগত করেছিল। ইংরেজ সামরিক নেতা হিউরোজ ঝাঁসী আক্রমণের আগে রাথগড় কেল্লা আক্রমণ প্রসঙ্গে বলছেন :

'The Shahzada of Mundsore was not in the fort as proved by an unopened letter from the Rajah of Banpoor to his address found...........'

'An immense mass of Native correspondence'. (State Papers preserved in the Military Deptt. Vol. IV Page 57-8).

কাল্পির যুদ্ধক্ষেত্রে হিউরোজ যে ঝাঁসীর রাণীর ব্যক্তিগত পেটিকা এবং চিঠি-পত্র পেয়েছিলেন সে-কথা বই-এর মধ্যেই উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সে-সব কাগজ পত্রের হদিশ চিরতরে বিলুপ্ত। তবু ইতিহাসের সত্য অত সহজে অবলুপ্ত হয় না। ভারতের যে-যে স্থানে এই অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেখানকার মানুষ তাকে কি ভাবে গ্রহণ করেছিল তার নজীর পেয়েছি লোকগীতি, ছড়া, রাসো এবং প্রচলিত বিবিধ কাহিনীতে। স্থানীয় লোকদের অনেকেই আজও রাণীর মৃত্যু অস্বীকার করে। আজও ঝাঁসীর রাণী স্থানীয় গাথা আর কিংবদন্তীর মাধ্যমে জীবিত। গ্রামবাসীরা তাঁর কাহিনী শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনও নিয়ত স্মরণ করে।

এ তো গেল একদিকের কথা। অন্যদিকে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান বা ঝাঁসীর রাণী সম্পর্কে আমাদের প্রকৃত তথ্যের একান্ত অভাব। তার ফলে আমাদের পক্ষ থেকেও নির্মম অবহেলা ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। তাঁতিয়া টোপীর একটি পরিচ্ছদ (সম্ভবতঃ তাঁর অন্তিম পরিচ্ছদ) আজও অজ্ঞাত কারণেই বিলেতে রয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এর রেসিডেন্সীকে কেন্দ্র করে একদিন ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের চূড়ান্ত সংগ্রাম হয়েছিল। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল অবধি সেখানে ব্রিটিশ পতাকা সমুন্নত গর্বে উড়েছে। ১৯৪৭ সালে তা অবশ্য অপসারিত করা হয়েছে কিন্তু শোনা যায় তার পরিবর্তে সেখানে জাতীয় পতাকা আজও ওঠেনি। উক্ত রেসিডেন্সী শুধু ব্রিটিশের গৌরব ও সংগ্রামের এক বিশাল স্মৃতিমন্দির হয়েই আজ বিরাজ করছে। নিহত ইংরেজদের নামের তালিকা তার দেয়ালে দেয়ালে উজ্জ্বল লিপিতে খোদিত, তাদের সমাধিস্থানগুলি পুষ্পসজ্জিত। কিন্তু ভারতীয় পক্ষ থেকে আজও সেখানে নিহত ভারতীয়দের স্মৃতি রক্ষার কোন আয়োজনই হয়নি। তাদের নাম সেখানে কোথাও মেলে না। ভারতীয় রক্ত অজস্র ধারে ঝরে সিক্ত করেছিল কোন্ ভূমি তারও কোন নিশানা মিলবে না। সিংহাসন সেদিন যাঁদের ছিল, কলমও ছিল তাঁদের অধিকারে। তাই তাঁরা যা লিখে গিয়েছেন, যা যেমনভাবে শিখিয়ে গিয়েছেন, তাই আমরা পড়েছি, শিখেছি এবং দেখেছি। ঝাঁসীতে রাণীর একটি মূর্তি ভিন্ন অপর কোন স্মৃতি চিহ্নই নেই। আর গোয়ালিয়ারে একটি ক্ষুদ্র স্মৃতিবেদী মাত্র তাঁর অন্তিম শয্যার স্থান নির্দেশ করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমার এ-গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত। কিন্তু রচনা অগ্রসর হবার সময়ে আরও নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হল আমাকে। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্তের সাহায্য ব্যতীত এ-কাজ সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে

সম্ভব হত না। তিন বছর ধরে তিনি নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। এই সুযোগে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রসিদ্ধ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের উৎসাহ পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। শ্রীযুক্ত মজুমদার বই-এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পূর্বে অনুগ্রহ করে পড়ে দেখেছেন। তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবেই কৃতজ্ঞ।

এ-প্রসঙ্গে যাঁদের কথা স্মরণ করছি তাঁদের মধ্যে স্বর্গত গোবিন্দরাম চিন্তামণি তাম্বের নাম অগ্রগণ্য। সেই নিরহঙ্কার, সরল ও উদারচেতা মানুষটিকে পুনর্বার শ্রদ্ধা জানাই। এ-গ্রন্থ রচনায় তাঁর অপরিমেয় উৎসাহ এবং আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি। তাঁর কাছে রাণীর সম্পর্কে বহু তথ্যের সংগ্রহ ছিল। তাঁর পিতা চিন্তামণি তাম্বে, চিমাবাঈ ও ঝাঁসীর অন্যান্য কয়েকজন অন্তঃপুরিকার সাহায্যে রাণীর সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সংগ্রহ থেকে এমন অনেক তথ্য আমি পেয়েছি যেগুলি প্রচলিত বই-এ মেলে না। রাণীর পৌত্র শ্রীলক্ষ্মণরাও ঝাঁসীওয়ালে বার্ধক্য এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বরোদার রাজরত্ন তাম্বে, ঝাঁসীর বৃন্দাবনলাল বর্মা, আমেদাবাদের নওলেকার পরিবার, বরোদার তাম্বে পরিবার, গোয়ালিয়ারের সর্বশ্রী বি. কে. দে, বিধান মজুমদার, ভারতকুমার ঝামার ও শ্রীযুক্ত ভালেরাও, ঝাঁসীর শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়, মেজর ও শ্রীমতী ভড়ভড়ে, মেজর পাঠক এবং শ্রীভগবান প্রসাদ গুপ্ত প্রভৃতির নামও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ঝাঁসীতে শ্রীমতী শালিনী ভড়ভড়ে এবং মেজর পাঠকের সাহায্য না পেলে সেখানকার কেল্লা দেখতে আমার সবিশেষ অসুবিধা হত। আমার জ্যেষ্ঠ মাতুল শ্রীযুক্ত শচীন চৌধুরী এই পুস্তক রচনায় ও ভ্রমণে সবিশেষ সাহায্য করেছেন। আমি যে রাণীর একখানি প্রামাণ্য জীবন-চরিত রচনা করি তাতে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইতিহাস কংগ্রেসের মারফত যাঁদের কাছে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে ধন্যবাদ জানাই শ্রীযুত টিকেকার ও শ্রীশোভন বসুকে।

আমার এ-গ্রন্থ প্রচলিত অর্থে ইতিহাস নয়, রাণীর জীবন-চরিত লেখার বিনীত প্রয়াস মাত্র। অনবধানতার ফলে যদি এ-গ্রন্থে কোনও ভুল ত্রুটি ঘটে থাকে আশা করি সেজন্য সহানুভূতিশীল পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন।

এই বইখানি শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ আগ্রহ সহকারে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য তিনি আমার অশেষ ধন্যবাদভাজন। প্রকাশক নিউ এজ পাবলিশার্স এ-গ্রন্থের মুদ্রণকালে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

বহুজনের সাহায্য ব্যতিরেকে আমার একার পক্ষে এই গ্রন্থ রচনার কাজ সুসম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। তাঁদের সকলকেই আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাই।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য

বিজন ভট্টাচার্যকে

27 Imli Bazar,
Indore.

20, January 1956.

Greatly appreciate your attempt in undertaking this difficult task and wish you all success.

Laxman Rao Jhansiwala.
Grandson of Maharani
Laxmibaisahiba.

পটভূমি

বুন্দেলখণ্ডে একটি মাঘের সন্ধ্যা। পর্বতাকীর্ণ লালমাটির প্রান্তরের শেষে, প্রত্যহের মতো সেদিনও সূর্য গেল অস্তাচলে। আদিগন্ত আকাশ সোনালী লালে ইমনকল্যাণ গলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা চলল বাসরঘরে। প্রতি গোধূলিতে চিরস্বয়ম্বরা সন্ধ্যার এই প্রিয়াভিসার। তখন গরু চরিয়ে ফিরছে কিষাণী মেয়েরা। কাঁপাগলার ডাক বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে ছোট ছেলে ডাকছে পথ হারানো মহিষকে। ক্লান্ত চিরন্তন একটি দিনের অবসান।

কাঠকুটো শুকনো পাতা জ্বালিয়ে পথের পাশে বসেছে লোধী ছেলেমেয়ে মজুরদের দল। ওদের জীবনের প্রারম্ভে ও অবসানে কোন নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নেই। জননী বুন্দেলখণ্ডের মতোই তাদের পাথুরে কপাল। সে কপালে ফুল ফোটে না ফল ধরে না। নবজন্মে আনন্দ নেই, মৃত্যুতে শোক আছে। তবু তারা বাঁচে, কাজ করে, গান গায়। মেলার দিনে প্রিয়াকে চুড়ি পরায় পুরুষ, জননী শিশুকে ঘুম পাড়ায় ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে।

এই যে মানুষ, তাদের মাঝখানে সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বস, শুনবে তারা বলছে ঝাঁসীর রাণীর কথা। আমার তোমার কাছে ঝাঁসীর রাণী ইতিহাসের একটি পাতা মাত্র। তাদের কাছে যদি বল, রাণী তো কবে মারা গিয়েছেন,—তখন সেই সব মানুষ তোমার দিকে তাকাবে। যুগযুগান্তের বোঝা বয়েছে তারা, ধৈর্য তাদের রক্তে। তাই তারা প্রতিবাদে ছটফটিয়ে উঠবে না। সরল এবং সহজাত বিশ্বাসে বলবে—"রাণী মরগেই ন হোউনী, আভি তো জীন্দা হোউ।" তারা বলবে, রাণীকে লুকিয়ে রেখেছে বুন্দেলখণ্ডের পাথর আর মাটি। অভিমানিনী রাণীর পরাজয়ের লজ্জা ঢেকে রেখেছে জমিন্, আমাদের মা। ঝাঁসীতে লছমীতাল হ্রদের পাশে এসে দাঁড়ালে তুমি দেখবে, লছমীতালের জলে কালোছায়া ফেলে অপেক্ষা করছে এক ভাঙা মন্দির। অবহেলায়

অনাদরে একান্ত জীর্ণ তার দেহ। সর্বত্র আগাছা জন্মেছে। তার পাশে কাপড় কাচে বুন্দেলখণ্ডের গরীব মানুষ যত। তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও তুমি শুনবে ঝাঁসীর রাণীর কথা। তারা বলবে—

'পত্থর মিট্টিসে ফৌজ বনাই,
কাঠ সে কটোয়ার ;
পাহাড় উঠাকে ঘোড়া বনাই,
চলি গোয়ালিয়ার।'

আমার তোমার চোখে রূপকথা নেই। তুমি বলবে, এ কার কথা বলছ! তারা বলবে ঝাঁসীর রাণীর কথা।—তারা বলবে, রাণী যদি হাতে মাটি তুলে নিতেন তো সেই মাটি ফৌজ বনে যেত, কাঠ তাঁর হাতের স্পর্শে হয়ে উঠত উদ্যত তরবারি। পাথর ছুঁয়ে তাকে ঘোড়া বানিয়ে তিনি গোয়ালিয়ার চলে গিয়েছিলেন।

কাল্পীর পথে চলতে বুড়ো কিষাণের সঙ্গে যদি দেখা হয়, সে বলবে—এই কাল্পীর মাটিতে লড়াই করেছিলেন রাণী, এখানেই কোথাও লুকিয়ে আছেন তিনি, হয়তো এই মাটির বুকেই। তাঁর দিন চলে গিয়েছে, মৌকা আর নেই। হতমান রাণী তাই মানুষকে আর মুখ দেখান না।

ঝাঁসী, কাল্পী, গোয়ালিয়ার, সর্বত্র সাধারণ মানুষ বলবে রাণীর মৃত্যু নেই।

ভাণ্ডীরের ও ঝাঁসীর মাঝখানের পথে মানুষ বলবে, এখনো মাঝরাতে কখন কখন দেখা যায় বাঈসাহেবকে। সারেংগী ঘোড়ী ছুটিয়ে শিশুপুত্রকে নিয়ে তিনি চলেছেন। স্বল্পজ্যোৎস্নায় বাঈসাহেবের গলার মোতির মালা, তরবারি, সব স্পষ্ট দেখা যায়।

ঝাঁসী কেল্লার নিচে যে অশীতিপর বৃদ্ধ টাংগাওয়ালাদের কাছে ঘাস বিক্রি করে, সে পরমবিশ্বাসের সঙ্গে বলবে, কত শরতে গভীর রাত্রিতে হিম-ঝরা বাতাস আর অজস্র জ্যোৎস্নার মায়াতে পৃথিবী যখন স্বপ্ন দেখছে, তখন সে নিজের চোখে দেখেছে, দুর্গপ্রাকারে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে আছেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। অবিশ্বাসী বলবে, তা হয় না। সে বলবে, তুমি জান না তাই। রাণী তো আর মরেনি! 'বাঈসাহেব জরুর জীন্দা হোউনী।'

তবে কোথায় রাণী লক্ষ্মীবাঈ ? তাঁকে যদি পেতে চাও তো সেই

সব জায়গায় যেতে হবে, সেই সব মানুষকে জানতে হবে, যারা আজো মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তাদের বাঈসাহেব মরেনি। কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছেন তিনি। তখন এই সব অশিক্ষিত, দরিদ্র, কিষাণ-কিষাণী মানুষের মনের বিশ্বাস থেকে আস্তে আস্তে প্রতিভাত হবে এক অপূর্ব নারী, এই ভারতবর্ষের হারান দিনের এক আশ্চর্য মেয়ে।

আমাদের দেশের অন্তরের সবটুকু সত্য নিঙড়ে যদি একটি আধারে ধরা যায় তো তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈ। একটি মেয়ের সম্পর্কে যদি শতবর্ষ ধরে জনসাধারণ জেনে থাকে, মাটি তাঁর হাতে সংগ্রামী সৈনিক হয়ে উঠত, কাঠ তাঁর হাতের স্পর্শে হয়ে যেত তরবারি, পাহাড় হয়ে যেত গতিচঞ্চল ঘোড়া, তবে সে মেয়ে কিরকম ? শক্তিরূপে দুর্গাকে আমরা আহ্বান করি বছরে একবার। কিন্তু গল্পে, গানে, গাথায়, বহু মানুষের মনে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর আজও নিত্যপূজা, নিত্য আরাধনা।

এই যে মানুষের শ্রদ্ধা, এ কি শুধু ভাবপ্রবণ মনের উচ্ছ্বাস ? এর কি কোন ভিত্তি ছিল না ?

সেই সব কথা জানতে হলে চলে যেতে হবে একশ' বছর আগেকার বুন্দেলখণ্ডে। জানতে হবে ঝাঁসীকে। আর যেতে হবে তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে। কেননা, রাণী লক্ষ্মীবাঈ তো একটি বিচ্ছিন্ন এবং একক চরিত্র নন। ছিয়ানব্বই বছর আগে ভারতবর্ষের বুকে বুটপরা পা রেখে মাড়িয়ে দিয়েছিল ইংরেজ। ভারতবর্ষের পাঁজর ভেঙে আর্তনাদ উঠেছিল সেদিন। সেই আর্তনাদই পরে মুখর হয়ে উঠেছিল একটি প্রতিবাদের সমুদ্রগর্জনে। কেঁপে গিয়েছিল তাতে শাসকের সিংহাসন। সমুদ্রপারের রাজপ্রাসাদে অর্ধপৃথিবীশ্বরী মহারাণীর মনে শান্তি ছিল না, চোখে ছিল না ঘুম। সেই দিনের ভারতবর্ষের মনের কথা হচ্ছেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। সেদিনের অসংখ্য ভুল ত্রুটি অক্ষমতা পরাজয় সব ছাপিয়ে একটি কথা সত্যি ছিল। সেটি হচ্ছে বিদেশী নাগপাশের বিরুদ্ধে প্রথম সচেতন বিদ্রোহ। সেই চেতনা যতদিন থাকবে ততদিন রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নাম অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের দেশে। তাঁর যোগ্য কোন স্মৃতিসৌধ না থাকলেও রাণীকে কেউ ভুলবে না।

ঝাঁসীর মাটিতে বনস্পতি বৃদ্ধ হয়। তার শিকড় থেকে মাথা তোলে নতুন গাছ। এমনি করে চলেছে যে চিরন্তন জীবন-প্রবাহ, তাতে রাণীর স্মৃতি নিয়ত পূজা পাচ্ছে হাজার মানুষের নিত্য স্মরণে। সৌধ তাঁর অমর হয়ে নিত্য-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ইট কাঠ পাথরে নয়, মানুষের মনে রাণীর নিত্য আবাহন। ঝাঁসীর সেই দুর্ধর্ষ কেল্লা আজও রয়েছে, যার দক্ষিণবুরুজ থেকে একদা যুদ্ধের রক্তনিশান উড়িয়ে দিয়েছিলেন রাণী। বিশাল কালো দেহ নিয়ে জং ধরে পড়ে আছে রাণীর দুই প্রিয় কামান ভবানীশঙ্কর ও কড়কবিজলী। ইংরেজের গোলার আঘাতগুলি আজও ঝাঁসী নগরীর প্রাচীর গাত্রে সুস্পষ্ট। সবচেয়ে উপরে রয়েছে মানুষ। যাদের জন্য তিনি লড়েছিলেন জীবন পণ রেখে, আর বাজি হেরে গিয়ে সেই বাইশ বছরের জীবন আহুতি দিয়েছিলেন গোয়ালিয়ারের রণক্ষেত্রে।

যতদিন মানুষ জোর করে বলবে, 'রাণী মরগেই ন হৌউনী', ততদিন রাণীর মৃত্যু নেই। ১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন তাঁর মরদেহ ভস্ম হয়ে গিয়েছে সত্য। তবু তিনি অমর। ভারতবর্ষের মানুষ তাঁর মৃত্যু স্বীকার করেনি।

'অমর হ্যায় ঝাঁসী কি রাণী।'

এক

আজকের মানচিত্রে ঝাঁসী যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা মাত্র। ১৮৫৮ সালের পর থেকে তার সমগ্র পরিচয় বিলুপ্ত। কিন্তু সময়ের নৌকোর মুখ ঘুরিয়ে দাও, ভেসে যেতে দাও তাকে সেই দিনের ঘাটে, দেখবে বুন্দেলখণ্ডের রূপ রয়ে গিয়েছে অপরিবর্তিত। ভারতবর্ষের একেবারে মধ্যস্থানে এক টুকরো রুক্ষ দেশ। প্রকৃতি সেখানে কৃপণা। পুবে, দক্ষিণে, উত্তরে অজস্র অঞ্জলিতে শস্যসম্পদ ছড়িয়ে দেশলক্ষ্মী ফুলে ফলে সমৃদ্ধা। সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, সুখদা বরদা জননী। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডে তাঁর ভৈরবী মূর্তি। সেখানে পাথর পাহাড় আন্দোলিত ভূমি রুক্ষ, নদী ক্ষীণতোয়া।

বহুদিন আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বাল্যে, এই বুন্দেলখণ্ডেই ছিল শস্যসম্ভারে ভরা শ্যামলশ্রী ঘন অরণ্য, জনপদ গড়ে উঠেছিল সর্বত্র। কিন্তু মানুষ নির্মমভাবে সেই অরণ্য উচ্ছেদ করে বুন্দেলখণ্ডকে মেঘের প্রসাদ থেকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করেছে। এই দেশের বুক দিয়ে বয়ে গিয়েছে দশার্ণ এবং বেত্রবতী, কিন্তু তারা আজ শীর্ণপ্রায়। তাদের কূলে কূলে প্রফুল্ল জম্বুপুঞ্জ আজ আর ফলভারে আনত হয়ে নেই। কোন বিস্মৃত যুগে সেই পথ দিয়ে যে নীলাঞ্জন ছায়াবাহী মেঘ নির্বাসিত প্রেমিকের অশ্রু বহন করে অলকাপুরীর দিকে গিয়েছিল, আজ তার দর্শন একান্ত দুর্লভ।

কখন সখন মেঘ সেখানে আজ যদি বা দাঁড়ায় চাষীরা তুলো বোনবার স্বপ্ন দেখে। গম, জোয়ার, অড়হর আর বাজরার বীজ প্রাণের অঙ্কুর মেলে ধরে তখন।

একশত বছর আগে ঝাঁসী ছিল বুন্দেলখণ্ডের একটি অন্যতম স্বতন্ত্র সংস্থা। সেদিন তার মাঝখান দিয়ে সর্বদা নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে তেহরী অরছা রাজ্যের একটু সীমান্ত থাকত। কাজেই ঝাঁসী ছিল দুইভাগে বিভক্ত। সম্পূর্ণ সীমানার পুবে পশ্চিমে একশ' মাইল, উত্তরে দক্ষিণে ষাট মাইল।

এই স্বল্পপরিসর রাজ্যটির পর্বতসঙ্কুল অনুর্বর বুকে লাঙলের ঘা দিয়ে পৃথিবীকে ফসলের ভাষায় কথা কওয়াবার চেষ্টা বছর বছর ব্যর্থ হয়ে যেত। বৈশাখের খরাতে জল চেয়ে কিষাণী বৌ মেয়েরা ডালা মাথায় 'ভাদোয়া' গেয়ে বৃথাই ফিরত। তবু সেখানে নানা মানুষ বাসা বেঁধেছিল। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, আহীর, বুন্দেলা, বানিয়া, চামার, কাচ্ছি, কোরি, লোধী, কূর্মী সবাই এসেছিল ঝাঁসী। মৌ থেকে ঝাঁসী, ঝাঁসী থেকে কাল্পী হয়ে কানপুর, আর আগ্রা থেকে সাগর, এই তিনটি পথ দিয়ে, গাধা ঘোড়া আর উটের পিঠে চাপিয়ে বছর বছর খাদ্যশস্য আসত বাইরে থেকে। তা ছাড়া আসত ঘোড়া আর হাতীর মালিকরা। ঝাঁসী ছিল ঘোড়া ও হাতী বেচাকেনার একটি প্রধান কেন্দ্র।

রাজধানী ঝাঁসী ছিল আগ্রা থেকে একশ' বিয়াল্লিশ মাইল দক্ষিণে। এলাহাবাদ থেকে বান্দার পথে দু'শ' পঁয়তাল্লিশ মাইল পশ্চিমে। কলকাতা থেকে সাতশ' চল্লিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে।

সমৃদ্ধ নগরী ঝাঁসী নিয়ে গর্ব করে অধিবাসীরা বলতেন—

'নিচুমে পুণা, উঁচামে কাশী,
সবসে সুন্দর বীচমে ঝাঁসী।'

ঝাঁসীর কথা জানবার আগে বুন্দেলখণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা প্রয়োজন। কেননা, বুন্দেলখণ্ডে মরাঠা বংশ স্থাপনের প্রাক্কালে ঝাঁসীতে এসেছিলেন নেবালকর বংশ। এই নেবালকর বংশের বধূ হয়ে ঝাঁসীতে এসেছিলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

বুন্দেলখণ্ড ছিল বুন্দেলাদের দেশ। মহাভারতের যুগে বুন্দেলখণ্ড, চেদি, দশার্ণ ও বিদর্ভ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। চন্দেল্ল রাজপুতদের সময় ঝাঁসী ছিল সুসমৃদ্ধ। চন্দেল্ল রাজপুতগণ ঝাঁসী ও বুন্দেলখণ্ডের সর্বত্র প্রস্তর জলাধার নির্মাণ করেছিলেন। তার কিছু কিছু আজও বিদ্যমান। চন্দেল্ল রাজপুতদের পর হাতবদল হতে হতে মোগল অধিকারে এল বুন্দেলখণ্ড।

বুন্দেলখণ্ডের রাজধানী তখন অরছা। ষোড়শ শতাব্দীতে, বুন্দেলা রাজা মলখান সিংহের মৃত্যুর পর রাজা হলেন তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্রপ্রতাপ। অরছা নগরী তাঁরই কীর্তি। নগণ্য জনপদটিকে তিনিই সুসমৃদ্ধ করলেন। অরছার রাজারা দিল্লীর বাদশাহকে

নিয়মিত কর দিতেন না। মাঝে মাঝে কিছু নজরানা দিয়ে খুশি রাখতেন মাত্র।

রুদ্রপ্রতাপের দ্বিতীয় পুত্র মধুকর শাহের কাছ থেকে বড়ৌনী জায়গীর নিয়েছিলেন বুন্দেলাবীর বীরসিংহ দেব। অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বীরসিংহ দেব নিজস্ব সেনাদল গঠন করলেন। অধিকার করলেন মোগলাধিকৃত নরোয়ার, মৈনা, জাট, কড়েরা ও ভাণ্ডীর। আকবর, অরছার রাজা রামসিংহ ও গোয়ালিয়ারের খাসকরণের সঙ্গে যে বাহিনী পাঠালেন, বীরসিংহ তাকে পরাভূত করলেন।

ইতিমধ্যে মনান্তর ঘটেছে পিতা ও পুত্রে। প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র সেলিম রুখে দাঁড়িয়েছেন পিতা আকবরের বিরুদ্ধে। তাঁকে দমন করবার পরোয়ানা নিয়ে আবুল ফজল আসতে লাগলেন মধ্যভারত অভিমুখে। সশঙ্কিত সেলিম তখন বীরসিংহ দেবের বন্ধুত্ব কামনা করলেন।

সেলিমের মূল্যবান বন্ধুত্ব, সেলিমের যৌবনে ও মধ্যাহ্নে কিনেছেন মহামূল্য দিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি। ইতিমধ্যে আনারকলির মৃত্যুদণ্ড কাজে পরিণত হয়েছে। তরুণজীবনের স্বপ্ন তাঁর কুঁড়ি থেকে ফুলে বিকশিত হবার আগেই পিষে গিয়েছে পাষাণ সমাধির নিচে। উত্তরজীবনে বীরকেশরী শের আফঘান নিহত হয়েছিলেন এবং দুনিয়ার আলো নুরজঁহা স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন স্বামীর হত্যাকার্যের পরোক্ষ নিয়ন্ত্রাকে। বীরসিংহ স্বীয় কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই রাজকীয় বন্ধুত্ব ক্রয় করলেন।

প্রয়াগধামে সাক্ষাৎ হল দু'জনের। সেলিমের সাহায্য প্রার্থনায় রাজী হলেন বীরসিংহ দেব। শর্ত রইল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সেলিম বীরসিংহ দেবকে রাজ্য গঠনে সাহায্য করবেন। অতঃপর সৈয়দ মুজফ্ফরের সঙ্গে প্রয়াগ থেকে তিনি এলেন বড়ৌনী। এসেই জানলেন, ইতিমধ্যে মোগল সেনাসহ আবুল ফজল নরোয়ারে পৌঁছে গিয়েছেন। পরাইছেঁ গ্রামে আছেন তিনি। এখানে বীরসিংহ দেবের সঙ্গে আবুল ফজলের ভয়াবহ যুদ্ধ হল। প্রবল সংগ্রামের পর পরাজিত আবুল ফজলের মাথা কেটে নিলেন বীরসিংহ দেব। লাল রেশমের পুলিন্দায়, রূপার থালায় প্রয়াগধামে

সেলিমের কাছে পাঠালেন সেই ছিন্নমস্তক। আনন্দে আত্মহারা হলেন সেলিম। বীরসিংহ দেবকে বড়োনীর জায়গীরে তিলক নিয়ে বসবার অনুমতি দিয়ে দূত করে পাঠালেন চম্পৎরাওকে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সঙ্গে সঙ্গে বীরসিংহ দেবের জন্য উপঢৌকন হিসাবে রত্নখচিত তলোয়ার, ছত্র, চামর ও ডঙ্কা নিয়ে গেলেন। মহাধুমধামে বড়োনীতে বীরসিংহ দেবের রাজতিলক হল।

এদিকে আবুল ফজলের মৃত্যুতে আকবর তখন শোকাহত। দুইদিন অন্নজল গ্রহণ করলেন না তিনি। আবুল ফজল ছিলেন অসাধারণ গুণী, বুদ্ধিদাতা ও প্রিয়মিত্র। সেলিমকে তিনি স্নেহ করতেন। বাদশাহের অনুরোধে তাঁকে পাঠশিক্ষা দিয়েছেন, গল্প বলেছেন। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই আবুল ফজলকে হত্যা করাতে এতটুকু বাধল না সেলিমের ?

মর্মাহত বাদশাহকে সান্ত্বনা দেবার জন্য খান আজম, রাজারাম কছবাহা, শেখ ফরিদ, রাজা ভোজরায়, দুর্গাদাস প্রভৃতি একত্রিত হলেন। সেলিমের মাতুল মানসিংহ অনুরোধ করলেন—'জাঁহাপনা, সেলিমকে ক্ষমা করুন। তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন না।' আকবর বললেন—'দিল্লীর তখ্‌ত কখন উত্তরাধিকারীর জন্য খালি থাকবে না। কিন্তু আবুল ফজলের স্থান চিরদিনই খালি থাকবে।'

মহাদুঃখ প্রশমিত হল, কিন্তু পরক্ষণেই নিদারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন বাদশাহ। ধরে আনতে হবে হত্যাকারী বীরসিংহ দেবকে।

সংগ্রামের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল। বীরসিংহ দেবের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন বিভিন্ন বুন্দেলা সামন্তগণ। গোয়ালিয়ার থেকে এলেন সুজানরাও পঁওয়ার, প্রতাপ রায় ও সুজানশাহ্‌।

বীরসিংহ দেব বড়োনী থেকে দতিয়া, দতিয়া ছেড়ে এরছ, এরছ থেকে দুনী এবং দুনী থেকে আবার দতিয়া এসে শাহজাদা সেলিমের সঙ্গে মিলিত হলেন। বাদশাহী সৈন্য চরম হয়রাণ হল। নিরূপায় আকবর পরাজয় স্বীকার করলেন। সেলিমকে আগ্রায় আহ্বান করলেন পুনর্মিলনের জন্য। সেলিমের পিছন পিছন সমস্ত মোগলসৈন্য চলে গেল আগ্রায়। বীরসিংহ দেব নিশ্চিন্ত হলেন।

সেলিমের মাতা যোধপুরী বেগমসাহেবার এই সময় মৃত্যু হল। তারপর পুনর্বার আকবর বীরসিংহ দেবের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠালেন। অরছার সীমান্ত যুদ্ধে বীরসিংহ দেব বিজয়ী হলেন। এবার তিনি সমগ্র অরছা রাজ্যে স্বাধিকার ঘোষণা করলেন। সুশাসক, জনপ্রিয় রাজা বীরসিংহ দেব দতিয়া, ধামৌনী ও ঝাঁসীতে তিনটি কেল্লা বসালেন। বললেন—ধামৌনী গড়-এ ফৌজ থাকবে, দতিয়ার গড় হবে মনোহর ও রমণীয়, ঝাঁসীর গড় হবে সিংহ ও হাতীর সঙ্গে মৌকা নেবার যোগ্য। জনশ্রুতি এই, বার্ধক্যের প্রান্তে উপনীত হয়ে তিনি দতিয়া থেকে ঝাঁসীর দিকে তাকিয়ে কেল্লা দেখতে পাননি। বলেছিলেন, 'আঁখমে পুরা ঝাঁসী দিখাই যাতি।'

সেই থেকে রাজ্যের নাম হল 'ঝাঁসী'।

দুই

বীরসিংহ দেবের পর ইতিহাস সময়ের পাখায় ভর দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভরে গড়িয়ে গেল। কয়েকজন অনুল্লেখ্য রাজার পর, ঝাঁসীর রাজা হলেন মহোবার জায়গীরদার চম্পৎরাও-এর ছেলে, বুন্দেলখণ্ডের মুকুটমণি ছত্রসাল। বুন্দেলখণ্ডকে মোগল শাসন থেকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করেছিলেন ছত্রসাল। বুন্দেলখণ্ডের গৌরব তিনি।

মহোবা জায়গীর বর্তমান ছত্রপুর জেলায়। চম্পৎরাও-এর সঙ্গে মহোবার অধিকার নিয়ে মোগল দরবারের ঝগড়া লেগেই ছিল। চম্পৎরাও ঘোষণা করলেন—বুন্দেলাকো বুন্দেলারাজ, মোগল অধিকার মানব না। শুরু হল লড়াই এই ধৃষ্ট জবাবের উত্তরে। নিহত হলেন সম্মুখ সমরে চম্পৎরাও-এর জ্যেষ্ঠপুত্র কিশোর সারবাহন। শোকাতুরা স্ত্রীকে নিয়ে চম্পৎরাও মোর পাহাড়ের জঙ্গলে আত্মগোপন করে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন।

কটেরা গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে মোর পাহাড়ের জঙ্গলে বিক্রমসংবৎ ১৭০৫-এ জ্যৈষ্ঠ মাসে ছত্রসালের জন্ম হল। শৈশব

থেকে ছত্রসাল পাহাড় ও জঙ্গলে মানুষ হতে লাগলেন। মোগলসৈন্য চম্পৎরাওকে কতবার বেষ্টন করে ফেলেছে। শিশুপুত্রকে নিয়ে চম্পৎরাওকে তখন দুর্গমতর অঞ্চলে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে। এরকম ঘটনা বারবার ঘটেছে। এমন কি একদিন নিদ্রিত ছত্রসালকে অরক্ষিত ফেলে তাঁরা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিশুকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পাবেন বলে ভরসা ছিল না চম্পৎরাও-এর। কিন্তু ভাগ্যক্রমে নিরাপদে পাওয়া গেল ছত্রসালকে। সেইদিনই রাণী নৈহার চলে গেলেন শিশুকে নিয়ে। কালক্রমে ছত্রসাল মহাবলী ও চতুর হয়ে উঠলেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি স্বপ্ন দেখলেন স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনার। সেদিন সুদূর মহারাষ্ট্রে সহ্যাদ্রি পর্বতের শিখরে শিখরে দুরন্ত ঘোড়াকে বশ মানাতে মানাতে আর একটি যুবক সেই স্বপ্নই দেখছিলেন। তিনি শিবাজী।

দিল্লীর তখ্‌তে তখন আওরংগজেব। সংগীত, শিল্প ও কাব্যের ওপর 'মৌত্‌কা-পরোয়ানা' লিখে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবি ভূষণ। কানপুরের সমীপবর্তী তিকবাঁপুর গ্রামে বিক্রমসংবৎ ১৬৭০-এ তাঁর জন্ম। বীররসে সঞ্জীবিত তাঁর কাব্যে বুন্দেলখণ্ডী ও ব্রজবুলি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটেছে।

কথিত আছে, আওরংগজেব একদা বিদ্রূপ করলেন কবিদের। বললেন—'তোমাদের কাব্য শুধুমাত্র রাজা-মহারাজার স্তবস্তুতি। তাতে সত্য নেই।' তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন কবি ভূষণ। যুক্তকরে নিবেদন করলেন, বাদশাহ্ তাঁকে লিখিতভাবে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি একটি কবিতা শোনাতে পারেন। আওরংগজেব প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ভূষণ বললেন—

> 'কিবলে কে ঠৌর বাপ বাদশাহ শাহীজঁহা
> তাকো কয়েদ কিয়ো মানো মক্কে আগি লাই হ্যায়॥
> বড়ো ভাই দারা য়াকো পকড়ি কৈ কয়েদ কিয়ো
> মেহরহুঁ নহী য়াকো জয়ো সগে ভাই হ্যায়॥
> বন্ধু তৌ মুরাদবক্স বাঁদি চুক করিবে কো
> বীচ লৈ কুরাণ খুদা কি কসম খাই হ্যায়॥
> ভূষণ সুকবি কহৈ সুনৌ নবরংগজেব
> এতে কাম কীন্‌হে ফেরি পদশাহী পাই হ্যায়॥'

কোরাণে পূজ্য পিতাকে বন্দীকরণ, পিতৃতুল্য দারাশুকোকে ও সন্তানতুল্য মুরাদবক্সকে হত্যার উল্লেখে, প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে ক্রোধে অন্ধ হলেন আওরংগজেব।

ভূষণ অগত্যা রাজরোষ মাথায় নিয়ে পলায়ন করতে লাগলেন দক্ষিণে। সন্ধান করতে লাগলেন একটি স্বাধীন ও নির্ভীক হিন্দুরাজার। মহারাজা ছত্রসাল সাদরে স্থান দিলেন ভূষণকে। ভূষণ রচনা করলেন ছত্রসাল দশক। ছত্রসালের প্রতাপ সম্বন্ধে ভূষণ বলেছেন—

'চাক চক চমূকে অচাক চক চঁহু ওর,
চাক সি ফিরতি ধাক চম্পতি কে লাল কী।
ভূষণ ভণত পাত্‌সাহী মারি জের কীন্হীঁ,
কাহু ওমরাব না করেরী করবাল কী॥
সুনি সুনি রীতি বিরদৈত কে বড়প্পন কী,
থপ্পন উথপ্পন কী বানি ছত্রসাল কী।
জংগ জীতিলেবা তে বৈ দামদেবা ভূপ,
সেবা লাগে করণ মহেবা প্রতিপাল কী॥'

সেই সময় বুঁদীর হাড়া-রাজা ছত্রসালও বিদ্রোহী হয়েছিলেন আওরংগজেবের বিরুদ্ধে। ভূষণ এঁদের যুগ্ম প্রশস্তিতে গাইলেন—

'ইক হাড়া বুঁদী ধনী মরদ মহেবা বাল
সালত নৌরংগজেবকো য়ে দোনোঁ ছত্রসাল॥
ঐ দেখো ছত্তা পতা ঐ দেখো ছত্রসাল।
ঐ দিল্লী কি ঢাল ঐ দিল্লী ঢাহনবাল॥'

ছত্রসালের কাছে বিদায় গ্রহণ করে ভূষণ গিয়েছিলেন শিবাজীর কাছে। শিবাজীর সন্ধান করতে করতে ভূষণ পুণার প্রান্তে পৌঁছলেন এক সন্ধ্যায়। দেখলেন, তাঁর পথরোধ করে দাঁড়িয়েছেন খর্বাকৃতি সুঠাম দেহ এক অশ্বারোহী। নিস্পৃহভাবে তিনি মকাই খাচ্ছেন। ভূষণের উদ্দেশ্য শুনে তিনি শিবাজীকে নিন্দা করলেন বললেন—'সে গাঁওয়ার মানুষ। যুদ্ধ লড়ে। যুদ্ধ বোঝে। কবিতার সে কি বোঝে? তার সম্বন্ধে কি কোন কবিতা রচনা সম্ভব?' ভূষণ তখন শিবাজী প্রশস্তিতে যে কবিতা রচনা করলেন তা আজও হিন্দী পাঠকসমাজে সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা। তিনি বললেন—

পেলেন বান্দা এবং হামিরপুরের কিয়দংশ। এই শেষোক্ত ব্যক্তি অতি অল্পদিনই সুবেদারী করেছিলেন। তাঁর পর বান্দা-রাজ্যের ভার পেয়েছিলেন শম্‌সের বাহাদুর, বাজীরাও পেশবা ও মস্তানীর প্রণয়জাত সন্তান। অনুপম সুন্দরী, চিত্তমনোহারিণী মস্তানীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ ছত্রসাল মস্তানীকে উপহার দিয়েছিলেন বাজীরাওকে। বাজীরাও মস্তানীকে শুধু সভাতেই নয়, হৃদয়েও স্থান দিলেন। দুঃখের বিষয় যে এই প্রণয়ে অভিশাপ ছিল। বাজীরাও-এর মারাঠী পত্নী এবং আত্মীয়বর্গ মস্তানীর বিরুদ্ধে ছিলেন। বাজীরাওকে কৌশলে মস্তানীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন তাঁরা। ভগ্ন হৃদয়ে মস্তানী বলেছিলেন—

'আঙ্গনামে আয়ে থে মহারাজ,
যব গাহির আঁধিয়ার।
বীচমে তৌসা তুফান বহায়ে
হো ন সকে পার॥'

'তুমি এসেছিলে অঙ্গনে গভীর রাতে, কিন্তু মধ্যে যেন দুরন্ত তমসা নদীর স্রোত আমি পার হতে পারলাম না।' বাজীরাও-এর অকালমৃত্যুর অনেকখানি কারণ হচ্ছে মস্তানীর সঙ্গে তাঁর নিরন্তর বিচ্ছেদ। দুঃসাহসী, নির্ভীক, বীরহৃদয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পরেও বেঁচেছিলেন মস্তানী। তাঁরই পুত্র শম্‌সের বাহাদুর। বান্দার নবাববংশের উৎপত্তি এই শম্‌সের বাহাদুর থেকে। এই বংশ আজও বিদ্যমান। ঝাঁসীর ভার পেলেন নরোশংকর মোতিবালে।

নরোশংকর মোতিবালে ঝাঁসীর কেল্লা ঘিরে নগরী স্থাপনা করলেন। ধীরে ধীরে গড়ে উঠল জনপদ।

নরোশংকর মোতিবালের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বাসরাও লক্ষণ হলেন ঝাঁসীর শাসক। সেই সময় একদা এক ব্যক্তি এসে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, তিনিই হচ্ছেন পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মৃত বীর সদাশিবরাও, যাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক, বিশ্বাসরাও এই ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য করলেন। পুণাতে খবর গেল, জাল সদাশিবরাও ও বিশ্বাসরাও ঝাঁসীতে বসে মিত্রতা করছেন। ফলে বিশ্বাসরাও পদচ্যুত হলেন। পুণা থেকে পেশবা প্রথম মাধবরাও, রঘুনাথহরি নেবালকরকে

পাঠালেন বিশ্বাসরাও সম্পর্কে তদন্ত করে বিবৃতি দাখিল করবার জন্য। এই বিবরণীটি দেখে রঘুনাথহরি নেবালকর সম্পর্কে উচ্চ ধারণা হল পেশবা প্রথম মাধবরাও-এর। অতঃপর, ১৭৭০ সালে ঝাঁসীর সুবেদার নিযুক্ত হলেন রঘুনাথহরি নেবালকর।

রঘুনাথহরির পিতা, হরিদামোদর নেবালকর ১৭৪০ সালে খান্দেশে অবস্থিত পারোলার সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ও মধ্যভারতের কেন্দ্রে পারোলা ছিল মরাঠা বাহিনীর একটি বিশিষ্ট সামরিক ঘাঁটি। নেবালকরদের আমলে পারোলা উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে একটি বিশিষ্ট জনপদে পরিণত হল। পারোলার সম্বন্ধে মারাঠা বাহিনী বলতেন—'পুণাতে যা মেলে না, পারোলাতে তা-ও মেলে।' পারোলার বর্তমান অবস্থিতি জলগাঁও ও ধুলিয়া এবং আমালমীর ও নাদীয়াবাদের কেন্দ্রস্থলে।

পারোলার উন্নতি দেখেই হয়তো পেশবা প্রথম মাধবরাও নেবালকরদের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

রঘুনাথহরি বিশেষ যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে চব্বিশ বৎসর কাল ঝাঁসীতে সুবেদারী করলেন। বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য মরাঠা রাজ্যগুলির মতো ঝাঁসীও প্রতিবেশী রাজপুত সামন্তদের নিরন্তর বিরাগভাজন ছিল। রাজপুত রাজন্যবর্গের চোখের সামনে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের পরেও মধ্যভারতে মরাঠাশক্তি খর্ব হয়ে গেল না। বাজীরাও পেশবার অধিকৃত অন্যান্য রাজ্যগুলির চেয়ে ঝাঁসী হয়ে উঠল সমৃদ্ধতর।

রঘুনাথহরি স্বীয় অর্থব্যয়ে ঝাঁসীকে সুসমৃদ্ধ করলেন। ভাল ভাল কামান ঢালাই করে কেল্লাতে বসালেন। শিল্প ও ব্যবসার একটি কেন্দ্র হল ঝাঁসী। রঘুনাথহরি ঝাঁসীর সম্পর্কে নিয়মিত বিবৃতি পেশ করতেন পুণাতে। পুণার দফ্‌তরের সেই কাগজগুলি আজও তাঁর কর্মপটুতার প্রমাণ দেয়।

রঘুনাথহরির চরিত্র থেকে বোঝা যায় এই রকম কয়েকজন দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তিই মহারাষ্ট্রকে একদিন অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষের একটি অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে গড়ে তুলেছিলেন। বিদ্যোৎসাহিতা, শ্রমে ধৈর্য, সহজ সরল জীবনযাপন, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা, চিন্তাকে কাজে পরিণত করবার সাহস, বৃহত্তর স্বার্থের

জন্য অতি সহজে স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ, চরিত্রের দৃঢ়তা, মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত এই যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান, রঘুনাথহরি তার সবগুলিরই অধিকারী ছিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় রমণীরা পরিধান করেন আঠারো হাত শাড়ি। বুন্দেলখণ্ডের মেয়েদের পোশাক ঘাঘ্‌রা। সেখানকার স্থানীয় তাঁতিরা শাড়ি বুনতে জানতেন না। অতএব রঘুনাথহরি দক্ষিণ থেকে তাঁতিদের আনিয়ে ঝাঁসীতে বসত করালেন। ছত্রপুর ও পান্না থেকে বিশিষ্ট বুন্দেলখণ্ডী ধাতুশিল্পীদের আনিয়ে পত্তনী দিলেন মৌরাণীপুর ও ঝাঁসীতে। ঝাঁসীর দুর্গপ্রাসাদে স্থাপনা করলেন একটি শৌখীন গবেষণাগার। গড়ে তুললেন একটি সুন্দর গ্রন্থাগার। নদীয়া, কাশী ও তাঞ্জোর থেকে ভাল ভাল সংস্কৃত বই-এর অনুলিপি করিয়ে আনলেন সুদক্ষ লিপিকারদের দিয়ে। বাঁধাই করলেন বই রেশম ও জরীর বহুমূল্যবান আচ্ছাদনে। ভাগবৎ গীতার বহু সংস্করণ করালেন। কাব্য, সাহিত্য, দর্শনে ভরে উঠল এই গ্রন্থাগার। নেবালকরবংশের উত্তরপুরুষেরা এই গ্রন্থাগারটিকে সবিশেষ যত্ন করে রেখেছিলেন। গঙ্গাধররাও-এর আমলে ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয়। সেখানে আনা হয় এই গ্রন্থাগার। রাণী লক্ষ্মীবাঈও এই গ্রন্থাগারটিকে সবিশেষ রক্ষণাবেক্ষণে রেখেছিলেন। ১৮৫৮ সালে, রাণী যখন যুদ্ধশেষে ঝাঁসী ত্যাগ করেন, তখন ব্রিটিশ ফৌজ প্রাসাদ লুণ্ঠন করবার সময় এই গ্রন্থাগারটিকে ধ্বংস করেন। মূল্যবান সোনা ও রেশমের আচ্ছাদনগুলি ছিঁড়ে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করেন গ্রন্থাগারে। একদা জুলিয়াস সীজারের রোম্যান সৈন্যরা, আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার পুড়িয়ে দিয়েছিল। এই বর্বর কাজ, আজও ঐতিহাসিক বলে গণ্য হয়ে থাকে। অতীব বিশিষ্ট এক একটি কাজকে ঐতিহাসিক বিশেষণ দেওয়া হয়। সেই অর্থে রোম্যানদের সেই বর্বরতা ঐতিহাসিক। কেননা তার তুলনা খুব বেশি নেই। ইংরেজ সৈন্যদের এই কীর্তিও তেমনই বর্বর।

১৭৯৪ সালে এই সুযোগ্য শাসক অবসর গ্রহণ করে ধর্মকর্মে জীবন উৎসর্গ করেন। ঝাঁসীর রাজবংশের বিশিষ্ট বন্ধু কর্নেল শ্লীম্যান বলেছেন, রঘুনাথহরি কুষ্টরোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। তখন

কুষ্ঠরোগের কোন সুচিকিৎসা ছিল না। রঘুনাথহরি এই দুর্ভাগ্যকে নীরবে বহন করেন। কাশীতে গিয়ে গঙ্গার জলে ডুবে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রঘুনাথহরির পরবর্তী ভ্রাতা শিবরাও ভাও তখন ঝাঁসীর সুবেদারী গ্রহণ করলেন।

শিবরাও ভাও জ্যেষ্ঠের যোগ্য ভ্রাতা ছিলেন। ঝাঁসী শহর ঘিরে যে বর্তমান প্রাচীর রয়েছে, তা তাঁর সমসাময়িক।

শিবরাও ভাও দুই বিবাহ করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে ১৭৮৮ সালে জন্ম হয় কৃষ্ণচন্দ্র শিবরাও নেবালকরের। কৃষ্ণরাও-এর স্ত্রী ছিলেন সখুবাঈ। ১৮০৬ সালে কৃষ্ণরাও-এর পুত্র রামচন্দ্ররাও-এর জন্ম হয়। ১৮০৯ সালে জন্ম হয় একটি মেয়ের।

শিবরাও ভাও-এর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে দুটি পুত্র হয়েছিল। ১৮০৩ সালে রঘুনাথ এবং ১৮১৩ খৃস্টাব্দে গঙ্গাধর জন্মগ্রহণ করলেন।

১৮০৪ সালে শিবরাও ভাও-এর সঙ্গে একটি শর্ত অনুষ্ঠিত হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির। পারস্পরিক সামরিক সাহায্য ও মৈত্রীর চুক্তিতে সাতটি শর্ত-সম্বলিত খরীতাটি শিবরাও ভাও বুন্দেলখণ্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি জন বেইলীর মারফত গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠালেন। সেই শর্ত অনুমোদন করে স্বাক্ষর করলেন গভর্নর জেনারেল।

কতকগুলি শর্ত এখানে অনুল্লেখিত রয়ে গিয়েছিল বলে ১৮০৬ সালে শিবরাও ভাও আর একটি নতুন শর্ত দাখিল করলেন। কোঠরাতে জন বেইলী গভর্নর জেনারেল জর্জ বার্লোর হাতে এই শর্ত দিলেন। এই শর্ত দু'খানির বিশদ বিবরণী পরে বর্ণিত হবে। এখানে এই বললেই চলবে যে, শিবরাও ভাও-এর ব্রিটিশ আনুগত্যের পরিবর্তে, কোম্পানি তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের ঝাঁসীর সিংহাসনের উপর অধিকার স্বীকার করে নিলেন। রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁদের স্বাধীনতা থাকল।

১৮১১ সালে কৃষ্ণরাও মারা গেলেন। মর্মাহত হলেন শিবরাও ভাও। জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর তাঁর যে পক্ষপাতিত্ব ছিল তার ফলে পৌত্র রামচন্দ্ররাওকে তিনি উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করলেন। ১৮১৪ সালে মহাধুমধামে রামচন্দ্ররাও-এর 'জনাও' বা পৈতা হয়ে গেলে পরে তিনি উইল করলেন। রামচন্দ্রের বিধবা মাতা

সখুবাঈ-এর সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার তাঁর কারণ ঘটেছিল। কাজেই রাজ্যশাসন বিষয়ে সখুবাঈ-এর কোন কর্তৃত্ব তিনি মানলেন না। গোপালরাও বালকৃষ্ণ আর্লেকরকে নিযুক্ত করলেন নাবালক রামচন্দ্রের অভিভাবক।

দ্বিতীয়া পত্নীজাত রঘুনাথ ও গঙ্গাধরকে বার্ষিক বারো হাজার টাকা করে বৃত্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তি দিলেন। আর সখুবাঈকে ধর্মকর্মের দিকে অধিক মন দিতে বললেন। রাজ্যের সমস্ত অধিকার বিচ্যুত হয়ে সখুবাঈ অপমান ও হিংসায় জ্বলতে লাগলেন। এমন কি শিশু রামচন্দ্রকেও তাঁর শত্রু বলে বোধ হতে লাগল। এই বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ফলে উত্তরকালে ঝাঁসীতে গভীর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল।

শিবরাও ভাও এই রমণীর গতিবিধি দেখে আশঙ্কিত হলেন। অশান্তি এবং দুর্ভাবনার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। ১৮১৬ সালে তাঁর মৃত্যু হল।

১৮১৭ সালে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও শর্ত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত অধিকার দিয়ে দিলেন। ১৮১৭ সালে একাদশবর্ষীয় নাবালক রামচন্দ্ররাও-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত শর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঝাঁসীর সিংহাসনে রামচন্দ্ররাও-এর অধিকার স্বীকার করলেন, মঞ্জুর করলেন তাঁর সুবেদারী।

দরিদ্র ঘরে মাতা ও পুত্রের সম্বন্ধে কোন বিরোধ নেই, সেখানে সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য এই সহজাত মধুর সম্বন্ধের ওপর কোন ছায়াপাত করে না। কিন্তু যেখানে ঐশ্বর্যের বাসা, যেখানে রাজকোষে সঞ্চিত থাকে মণিমুক্তা ধনরত্ন, সেখানে মাতার স্নেহসিঞ্চিত খাদ্যপানীয়ে কখন কখন কালকূট থাকে, বিরামকক্ষের যবনিকার আড়ালে কখন কখন ঘাতক অপেক্ষা করে। ঐশ্বর্য শুধু আশীর্বাদ নয়, সময়ান্তরে অভিসম্পাতও বহন করে আনে। ঐশ্বর্যের মোহে সখুবাঈ বিস্মৃত হলেন তাঁর কর্তব্য। অন্তরে তাঁর ফণিনী গর্জন করতে লাগল। তার বিষক্ষরণে বিষিয়ে গেল তাঁর সমস্ত মন।

সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন সখুবাঈ।

রামচন্দ্ররাও-এর অভিভাবক গোপালরাও মারা গেলেন ১৮২২ সালে। তাঁর স্থান গ্রহণ করলেন নারো ভিকাজী।

রামচন্দ্ররাও-এর একমাত্র বোনের বিবাহ হয়েছিল সাগরের প্রাক্তন সুবেদার বিনায়ক গণেশ চন্দোরকারের পুত্র মোরেশ্বরের সঙ্গে। ১৮১৯ সালে, সাগর ও নর্মদা রাজ্য ব্রিটিশের হাতে যাবার পর থেকে তিনি ৪৭,০০০৲ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি পাচ্ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর মোরেশ্বর সেই বৃত্তির অর্ধেক ২৩,৫০০৲ পাচ্ছিলেন। নাবালক পুত্রকে সরিয়ে মোরেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণরাওকে ঝাঁসীর উত্তরাধিকারী করবার একটি অসম্ভব বাসনা সখুবাঈ-এর মনে জাগল। তার কারণ হয়তো এই, নারো ভিকাজীর আমলে তিনি মন্ত্রীর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। জেনেছিলেন রাজত্ব করবার আনন্দ।

রামচন্দ্ররাও ১৮২৭ সালে সাবালক হলেন। ঠগী দমনের ব্যাপারে বুন্দেলখণ্ডে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮২৪ সালে বর্মার যুদ্ধের সময়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ৭০,০০০৲ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। তা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে দুটি কামান, চারশ' অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন। কর্নেল শ্লীম্যানের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব ছিল। কর্নেল শ্লীম্যান রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ঝাঁসীকে তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলতেন, 'Oasis in a desert'। সমগ্র অবস্থা পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ সরকার রামচন্দ্ররাওকে রাজা খেতাব দেবার সঙ্কল্প করলেন।

সখুবাঈ মরিয়া হয়ে রাজকোষের ধনরত্নসমূহ স্থানান্তরিত করলেন সাগরে, তাঁর কন্যাগৃহে। তাঁর কন্যাও এইসব ষড়যন্ত্রে মাতার সাহায্যকারিণী ছিলেন। রামচন্দ্রের খাদ্যে প্রত্যহ বিষ মেশান হচ্ছে এরকম একটা সন্দেহ করবারও কারণ ঘটল। শঙ্কিত রামচন্দ্ররাও কর্নেল শ্লীম্যানকে জানালেন তাঁর আশঙ্কার কথা।

এইসব আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তকে বিচলিত করতে পারল না। ১৮৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক স্বয়ং ঝাঁসীতে এলেন। ঝাঁসীর কেল্লার উপরের প্রাসাদে দরবারঘর সুসজ্জিত করা হল। একটি শোভন ও সুন্দর অনুষ্ঠানের পর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রামচন্দ্ররাওকে খেতাব

দিলেন—'মহারাজাধিরাজ ফিতুই বাদশাই জাম্নজা ইংলিস্তান মহারাজ রামচন্দ্ররাও বাহাদুর।' ঝাঁসীরাজের সীলমোহরে নাগারা ও চামরের সঙ্গে এই খেতাব খোদাই করতে অনুমতি দিলেন। খোলা দরবারে ব্যবহার করবার জন্য একখানি ব্রিটিশ পতাকা দিলেন। ঝাঁসী থেকে সাগরে গিয়ে বেন্টিঙ্ক রামচন্দ্ররাওকে একখানি সম্মানসূচক অভিনন্দন-পত্র পাঠালেন।

ইতিমধ্যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। মরাঠা রাজ্য ঝাঁসীর উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ রাজপুত রাজা অরছা ও দতিয়া, ঝাঁসীর অন্তর্গত জিগ্নী ও উদয়গাঁও এবং বিল্চারীর পওয়ার রাজপুত সামন্তদের উত্তেজিত করতে লাগলেন। বিক্ষুব্ধ রাজপুত সর্দাররা ঝাঁসী থেকে সাগর অভিযাত্রী বেন্টিঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামচন্দ্র-রাও-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন। বেন্টিঙ্ক জানালেন যে, আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় তিনি হস্তক্ষেপ করবেন না। অতএব, রাজপুত সর্দাররা ভূমিয়াবৎ জাহির করলেন। জমির স্বত্বাধিকার নিয়ে লড়াইকেই বলা হয় ভূমিয়াবৎ। এক কথায় প্রবল স্বেচ্ছাচার ও বিদ্রোহ দেখা দিল। নারো ভিকাজী এবং রামচন্দ্রের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁদের বারো হাজার সৈন্য পরাস্ত হয়ে গেল। ঝাঁসী ও মৌরাণীপুর ছাড়া সমস্ত রাজ্যই বেহাত হয়ে গেল বিদ্রোহীদের হাতে। গোয়ালিয়ারের ইংরেজ রেসিডেন্ট আর. ক্যাভাণ্ডিশ গভর্নর জেনারেলকে জানালেন—'দতিয়া ও অরছার রাজারা একজোট হয়ে ঝাঁসীতে প্রবল অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন। ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ ব্যতীত একা ঝাঁসীরাজ্যের পক্ষে বিদ্রোহ দমন অসম্ভব। চন্দেরী পর্যন্ত গোলমাল ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে। গোয়ালিয়ারের বাইজাবাঈ উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন।'

কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়ে উঠছেন দেখে, অরছা এবং দতিয়ার রাজা ভূমিয়াবৎ দমনের চেষ্টা করলেন। তাঁরা হস্তক্ষেপ করে এই ভূমিয়াবৎ দমনে সাহায্য করলেন। বুন্দেলখণ্ডের সমৃদ্ধতম রাজ্য ঝাঁসীর আর্থিক অবস্থা হয়ে পড়ল শোচনীয়। রাজকোষ শূন্য করেছেন সখুবাঈ। অগত্যা বিপন্ন রামচন্দ্র গোয়ালিয়ার ও অরছার কাছে রাজ্য বাঁধা রেখে টাকা নিলেন,—ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকেও টাকা নিলেন। ঋণের পরিমাণ হল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

বিপন্ন ও ভগ্নহৃদয় রামচন্দ্রের সান্ত্বনা পাবার কোন আশাই ছিল না মায়ের কাছ থেকে। মায়ের দুরভিসন্ধির কথা জানিয়ে বারবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তিনি ঠগীদমনখ্যাত কর্নেল শ্লীম্যানের কাছে। তাঁর ধারণা ছিল মা তাঁকে প্রত্যহ খাদ্যে বিষ দিচ্ছেন। লছমীতাল হ্রদে নিয়ত সাঁতার কাটবার ও ঝাঁপ দেবার অভ্যাস ছিল তাঁর। একদিন লছমীতালের জলে, তাঁর ঝাঁপ দেবার স্থানে, পাথরে বিদ্ধ অবস্থায় তীক্ষ্ণধার বর্শা ও ভল্ল পাওয়া গেল। লাল্লু কোটেলকার ও আনন্দ বর্মা এই দুইজন সাবধান করলেন রামচন্দ্রকে। ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হল। রামচন্দ্ররাও বুঝলেন এ সখুবাঈ-এর কাজ। সখুবাঈ এবং তাঁর সহকারী গঙ্গাধর মূলের আক্রোশ থেকে বাঁচাবার জন্য আনন্দরাও বর্মাকে রামচন্দ্র মৌরাণীপুরে তহশীলদার নিযুক্ত করলেন। কথিত আছে, লাল্লু কোটেলকারের অনুরোধে তিনটি দরিদ্রা বালিকা কাশী সুন্দর ও মান্দারকে ঝাঁসী রাজপ্রাসাদে স্থান দেওয়া হয়। এঁরা তিনজন ভবিষ্যতে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সহকারিণী হয়েছিলেন।

অন্দরে ও বাইরে নানা কারণে আঘাত পেয়ে রামচন্দ্র দিন দিন ভেঙে পড়তে লাগলেন। নতুন খেতাব নিয়ে জাঁকিয়ে রাজত্ব করবার সময় মিলল না তাঁর। ১৮৩৫ সালে অনেক বড় এবং শক্তিশালী আর এক দরবারের পরোয়ানা পেয়ে রামচন্দ্ররাও চলে গেলেন। এমনই জোরদার সেই পরোয়ানা যে, ঝাঁসীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর কোন ব্যবস্থা করবার সময়ও তাঁর মিলল না। তাঁর মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী জেনে সখুবাঈ পূর্বাহ্নে সাগর থেকে কন্যা ও দৌহিত্রকে আনিয়েছিলেন। মরণোন্মুখ জ্ঞানহীন পুত্রের কোলে দৌহিত্র কৃষ্ণরাওকে বসিয়ে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে, রামচন্দ্র ভাগিনেয়কে দত্তক নিয়েছেন। শাশুড়ী ও ননদের অধীনা হয়ে রামচন্দ্রের পত্নীর বেঁচে থাকবার কোন বাসনা ছিল না। তিনি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সখুবাঈ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। জানালেন বর্তমানে কৃষ্ণরাও তাঁর দত্তক পুত্র। যেহেতু সেই পুত্র বিদ্যমান সেহেতু সহমৃতা হবার অধিকার নেই তাঁর। দুর্গ প্রাসাদ তিনি অধিকার করে রাখলেন। কৃষ্ণরাওকে অশৌচ পালন করালেন। দশম

দিনে মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি করবার সময়ে রঘুনাথরাও এসে বাধা দিলেন। তিনি বললেন, যেহেতু তিনি নিজে ও গঙ্গাধররাও রয়েছেন, সেহেতু রামচন্দ্ররাও-এর ভিন্ন গোত্র থেকে দত্তক নেবার কথা ওঠে না। দত্তক গ্রহণের যখন কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হয়নি, তখন এই বালককে স্বীয় পিতার বর্তমানে জনকাশৌচ পালন করান অতীব ধর্মবিগর্হিত কাজ।

এই সময় কর্নেল শ্লীম্যান ঝাঁসীতে এলেন। সখুবাঈ-এর সমস্ত বাধা সত্ত্বেও রঘুনাথরাও মনোনীত রাজা হলেন। সেটা ১৮৩৫ সাল।

রঘুনাথরাও কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ছিলেন সত্য। কর্নেল শ্লীম্যান বলেন ঝাঁসীর সুযোগ্য শাসক রঘুনাথহরি ১৭৯৫ সালে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে কাশীধামে গিয়ে গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করেন। রঘুনাথরাও তাঁর ব্যাধি সত্ত্বেও অতীব ভদ্র মার্জিত উদারচেতা লোক ছিলেন। ১৮৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হল।

রঘুনাথরাও-এর কোন বৈধ সন্তান ছিল না। কিন্তু তাঁর মুসলমানী প্রণয়িনী লচ্ছো বা রোশানের দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছিল। লচ্ছোর বিলাসিতা ও শৌখীনরুচি সম্বন্ধে অনেক গান আজও ঝাঁসীতে প্রচলিত। যথা—

'ফুলেঁ ফুলেঁ পিয়ারী লচ্ছো রঘুনাথকি নার
ফুল সোহাঁরী কেশজুড়া—ফুলেঁ মে বিহার ॥'

মৃত্যুর পর ঝাঁসীর আঁতিয়াতালের সন্নিকটে মেহ্‌দীবাগে লচ্ছোকে সমাধিস্থ করা হয়। রঘুনাথরাও-এর প্রণয়িনীর সমাধিতে একদা ঋতুতে ঋতুতে অঞ্জলি দিত ভিন্ন ভিন্ন ফুলের গাছ। আজ সেখানে ঘাস, আগাছা এবং কাঁটা। যে দুনিয়াতে রাজার তখ্‌তের কোন নিরাপত্তা নেই, সে দুনিয়াতে রাজপ্রণয়িনীদের ভাগ্য প্রায়শঃই করুণ। যৌবনের মদগর্বিত উচ্ছল দিনগুলির অবসানে জীর্ণ সমাধিতেই সাধারণত তাঁদের সমাপ্তি। এই দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন একদিন হতে হয়েছিল জগতের আলো নূরজঁহাকে। তৎকালীন মোগল জগতের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা নূরজঁহা জাহাঙ্গীরের প্রেয়সী, দিল্লীর সিংহাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রা তিনি। শেষজীবনের অবহেলিত দিনগুলিতে রূপ যৌবন এবং ক্ষমতার নশ্বরতার কথা সম্ভবতঃ বারবার মনে হত তাঁর। তাঁর

সমাধিতে উৎকীর্ণ কবিতাটি, যুগেযুগে সমস্ত রাজপ্রণয়িনীদের মনের কথা—

'গরীব গোরে দীপ জ্বেল না
ফুল দিও না কেউ ভুলে
শামা পোকার না পোড়ে পাখ
দাগা না পায় বুলবুলে।'

যা হোক লচ্ছোর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আলি বাহাদুর ঝাঁসীর সিংহাসন সম্বন্ধে নিজের দাবী জানালেন।

রঘুনাথরাও-এর মৃত্যুর পর পুনর্বার ঝাঁসীর সিংহাসন নিয়ে দাবীদারের প্রশ্ন উঠল। দাবী জানালেন চারজন। রঘুনাথরাও-এর বৈধ পত্নী, আলি বাহাদুর, কৃষ্ণরাও বিনায়ক চন্দোরকার এবং শিবরাও ভাও-এর কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধররাও।

কোম্পানির নির্বাচিত কমিশন এই দাবীর বিষয়ে তদন্ত করলেন এবং নির্বাচিত করলেন গঙ্গাধররাওকে।

বারবার আশাভঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন সখুবাঈ। ঝাঁসীর সিংহাসনের উপর আধিপত্য স্থাপনের লোভে তিনি পুত্রের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর নিরন্তর কামনা ছিল পুত্রের মৃত্যু। দৌহিত্রকে রামচন্দ্রের গৃহীত দত্তক হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন স্বীয় দায়িত্বে। হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও, পিতার জীবিতকালে সেই বালককে দিয়ে জনকাশৌচ পালন করিয়েছিলেন। কিন্তু এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সখুবাঈ-এর মনস্কামনা পূর্ণ হল না। কৃষ্ণরাওকে তিনি রাজা করতে পারলেন না। রামচন্দ্রের পর রঘুনাথরাও রাজা হলেন। তারপরে আবার নির্বাচিত হলেন কনিষ্ঠ দেবর গঙ্গাধররাও। ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মতো সখুবাঈ দংশন করতে উদ্যত হলেন।

ঝাঁসীর কেল্লার রক্ষী গোসাবী আখোরাদের উৎকোচ দানে বশীভূত করে তিনি কেল্লা অধিকার করলেন দৌহিত্রকে নিয়ে। এই বালককে পুত্তলি রাজা করবেন এবং প্রিয় পারিষদ গঙ্গাধর মূলেকে মন্ত্রী করবেন, এই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা।

ঝাঁসীর রাজকোষ তখন শূন্য। তা জেনেও সখুবাঈ গোসাবীদের বকেয়া বেতন দাবী করবার জন্য উত্তেজিত করতে লাগলেন। এই অরাজক অবস্থা দেখে গঙ্গাধররাও বুন্দেলখণ্ডের

তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি স্যার সাইমন ফ্রেজারকে জানালেন। ফ্রেজার নিজে স্যার টমাস অব্রির অধীনে সৈন্য আনালেন। সাগর থেকে এলেন সৈন্যসহ অব্রি। ঝাঁসীর কেল্লা ঘিরে ফেলে ফ্রেজার সখুবাঈকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করবার নোটিশ দিলেন। অন্যথায় গোলাবর্ষণ হবে তাও জানাতে কসুর করলেন না।

কেল্লার মধ্যে নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে লাগলেন সখুবাঈ। চারদিন পর উপায়ান্তর না দেখে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি। সখুবাঈকে ঝাঁসী শহরের কাছেপিঠে রাখা যুক্তিযুক্ত ভাবলেন না ফ্রেজার। ঝাঁসী থেকে পনেরো মাইল দূরে বড়োয়া সাগরে, সিন্ধিয়ার একটি প্রাসাদে তাঁকে প্রথমে রাখা হল। তারপর ঝাঁসীর বাইরে, দতিয়া রাজ্যে মাদোরা দুর্গে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। নিশ্চিন্ত হলেন গঙ্গাধররাও।

দীর্ঘদিনের অবহেলায় ও ঋণে ঝাঁসীর রাজকোষ তখন শূন্য। ঝাঁসীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় গঙ্গাধররাও-এর হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিতে ভরসা পেলেন না ফ্রেজার। গঙ্গাধররাও বৃত্তি পেতে লাগলেন এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রস শাসন চালাতে লাগলেন। গঙ্গাধররাও শাসন ব্যবস্থায় আগ্রহ দেখিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করালেন। আনন্দিত হলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রস। শীঘ্রই গঙ্গাধররাও ভার পাবেন ঝাঁসীর রাজ্যের, সে কথাও জানালেন রস।

রাজ্যের প্রতি রাজার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হলেন গঙ্গাধর-রাও। সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকেও তিনি মন দিলেন। কলাশিল্পে তাঁর অনুরাগ আন্তরিক। ঝাঁসীর নাট্যশালায় তাঁর নির্দেশে অভিনয় হয় অভিজ্ঞান-শকুন্তলা। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অন্তে মিলন হয় নায়কনায়িকার। হস্তিনাপুরের রাজপুরীতে মিলন উৎসব শুরু হয়।

তাঁর নিজের জীবনেও প্রয়োজন একটি রাজলক্ষ্মীর। ইংরেজ রেসিডেণ্ট এবং তাঁর যুগ্ম প্রচেষ্টায় ঝাঁসীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠ হয়েছে সুখশান্তি এবং নিরাপত্তা। সুযোগ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কৃষির উন্নতি হয়েছে। শূন্য রাজকোষে আবার জমা পড়েছে টাকা। ঘরে ঘরে

সুখশান্তি, প্রজাবর্গ আশ্বস্ত। কিন্তু নিজের ঘর তাঁর শূন্য। রাণী না থাকলে রাজা হওয়া তাঁর সম্পূর্ণ হবে না। স্ত্রী রমাবাঈ বিগত হয়েছেন বহু আগে। ঘর তাঁর লক্ষ্মী চায়, অন্তঃপুর চায় গৃহিণী। রাজ্য চায় রাণী। সিংহাসন চায় উত্তরাধিকারী। তাঁর নিজের প্রয়োজন একটি সহধর্মিণীর। তৎপর হলেন গঙ্গাধররাও। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা তিন ভাগে বিভক্ত। কোঙ্কনস্থ, দেশস্থ এবং কড়েরা। নেবালকর বংশ কড়েরা শ্রেণীর। স্ব-শ্রেণীতে চট্ করে রাণী হবার উপযুক্ত সর্বসুলক্ষণা কন্যা পাওয়া কঠিন। তাই উত্তরে দক্ষিণে বিভিন্ন স্থানে দূত পাঠান হল।

গঙ্গাধররাও-এর সভাসদ ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া দীক্ষিত স্থির করলেন কানপুরের সমীপে বিঠুরে যাবেন। ১৮১৮ সাল থেকে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও সেখানে ব্রিটিশ সরকারের বৃত্তিভোগী হয়ে বাস করছেন। সেই সঙ্গে প্রচুর মহারাষ্ট্রীয় প্রজা পেশোয়ার উপর নির্ভর করে বিঠুরে এবং তার আশেপাশে বসবাস করছেন। শেষ পেশবা বাজীরাও যদিচ একান্ত পরনির্ভরশীল অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করছেন, তবুও তাঁর সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় সমাজের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। সেখানে মেয়ের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে। এই কথা মনে করে তাঁতিয়া দীক্ষিত চললেন বিঠুরে। ঝাঁসী থেকে কানপুরের পথে রওনা হলেন তাঁরা শুভদিন দেখে।

অনেক পুবে কলকাতায় তখন ইংরেজ সভ্যতা ক্রমবর্ধমান। পশ্চিমে ও মধ্যভারতে তার কোন চিহ্ন নেই। দ্রুত গমনে ঘোড়া, দীর্ঘপথে উট নতুবা ডাকগাড়িই সেখানে একমাত্র বাহন। ঘোড়া পাল্কি ইত্যাদি নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন তাঁতিয়া দীক্ষিতের দল।

একটি শুভক্ষণের জন্য রাজপ্রাসাদে অপেক্ষা করে রইলেন গঙ্গাধররাও।

তিন

কৃষ্ণাজী অনন্ত তাম্বের জন্ম সাল ১৭১৯ খ্রীস্টাব্দ। নাম থেকে বোঝা যায় তাঁর পিতার নাম ছিল অনন্ত কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিশদ

কিছু জানা যায় না। কৃষ্ণাজী ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত ধর্মসাধক ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর ভক্ত। কৃষ্ণাজী বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চরিত্রের বিবিধ গুণে প্রিয় হয়েছিলেন গুরুর কাছে। ব্রহ্মেন্দ্র স্বামীর ভক্তবৃন্দের মধ্যে একজন ছিলেন প্রথম বাজীরাও পেশবা। বাজীরাও-এর সময়ে মহারাষ্ট্র শক্তির দ্রুত উন্নতি সম্বন্ধে বলা যায়—

'বাজী তেরে রাজ মেঁ
ধক্ ধক্ ধরতী হোয়।
জিত জিত ঘোড়া মুখ করে
তিত তিত ফত্তে হোয়॥'

একদা রাজা ছত্রসালের প্রশস্তিতে বাবা প্রাণনাথ এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বাজীরাও-এর সম্পর্কেও বলা যায়, যেদিকে তাঁর অশ্ব মুখ ফেরাত সেইদিকেই স্থাপিত হত তাঁর জয়ধ্বজা। মহারাষ্ট্র জাতির সেই গৌরবময় দিনে দূরদর্শী বাজীরাও পেশবা যোগ্য মানুষ দেখলেই তাকে শিক্ষিত করতেন সমরবিদ্যায়। চোখে ছিল তাঁর উচ্চাশার স্বপ্ন। মোগলশাহীর পতনে সূচিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের উন্নতি। মহারাষ্ট্রকে জয়ী করবার জন্য চাই যুদ্ধকুশলী তরুণ যুবক।

বাজীরাও পেশবার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কৃষ্ণাজী অনন্ত তাম্বে সমর শিক্ষা করলেন। ১৭৩৮ সালে মহম্মদ খাঁ বাঙ্গোশের আক্রমণ থেকে বুন্দেলখণ্ডকে রক্ষা করবার সময় কৃষ্ণাজী অনন্ত তাম্বে গেলেন মরাঠা বাহিনীর সঙ্গে। বুন্দেলখণ্ডে স্থাপিত মরাঠা রাজ্যের একাংশে হামীরপুর ও বান্দার সুবেদারী পেলেন তিনি। তারপর পুণা থেকে তাঁকে ডাকা হল। ১৭৫৯-৬০ সালে তিনি মরাঠা বাহিনীতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ১৭৬১ সালে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে, মরাঠা শিবিরের উত্তর দরজার অধিনায়ক ছিলেন কৃষ্ণাজী। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরাঠাশক্তির শোচনীয় পরাজয় ঘটল। পুণাতে খবর গেল, লক্ষাধিক মণিমুক্তা এবং স্বর্ণমোহর বিনষ্ট হয়েছে। ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন তৎকালীন পেশবা বালাজী বাজীরাও। পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রের স্বল্পসংখ্যক প্রত্যাগত মরাঠা বীরদের মধ্যে কৃষ্ণাজীও ছিলেন।

১৭৬৫ সালে কৃষ্ণাজী পেশবা প্রথম মাধবরাও-এর নির্দেশে

মরাঠা বাহিনীর সহায়তায় নাগপুর ও বেরারের অধিপতি ভোঁসলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্রোতস্বিনী বেষ্টিত গিরিশিখরে অবস্থিত বালাপুর দুর্গ থেকে যুদ্ধ করলেন জানোজীরাও ভোঁসলা। কিন্তু কৃষ্ণাজী তাঁকে পরাভূত করলেন। জানোজীরাও পলায়ন করলেন চন্দা অভিমুখে। নিজাম ও ভোঁসলাদের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য মাধবরাও কৃষ্ণাজীকে মাহুরের গিরিবর্ত্ম রক্ষার দায়িত্ব দিলেন। মাধবরাও-এর কাকা রঘুনাথরাও যে কোন সময়ে পেছন থেকে তাঁকে আক্রমণ করতে পারেন, সে আশঙ্কাও তাঁর ছিল। উমারখেদ-এ ঘাঁটি করলেন কৃষ্ণাজী। তাঁর নিয়মিত বিবৃতিগুলি আজও পেশোয়া দফ্‌তরে রয়েছে।

এইভাবে আজীবন পেশোয়াশাহীকে একনিষ্ঠভাবে সেবা করবার জন্য কৃষ্ণাজীর পদমর্যাদা বেড়ে গেল। পুণাতে শানোয়ার ওয়াড়াতে তিনি একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করলেন। সেটি আজও বিদ্যমান। তবে সে-ভবন আজ তাম্বে পরিবারের অধিকারচ্যুত।

কৃষ্ণাজীর পুত্র বলবন্তরাও উমারখেদ-এ ছিলেন। যুদ্ধের শিক্ষা পুঁথিতে নয়, অভ্যাসে—এই ছিল মরাঠা বীরদের অভিজ্ঞতা। বলবন্ত পিতার সাহচর্যে যুদ্ধবিদ্যা শিখেছিলেন। ১৭৯৪ সালে মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর পুণাতে পেশোয়াশাহীর আসন ঘিরে যে রক্তাক্ত ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তার ঘূর্ণিপাকে কৃষ্ণাজীর নাম বিলীন হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায় না।

বলবন্তরাও দ্বিতীয় বাজীরাও শেষ পেশবার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিম্‌নাজী আপ্পার বিশেষ অনুগত ছিলেন। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে চিম্‌নাজী আপ্পার সঙ্গে তিনি বারাণসী গেলেন। কাশীতে অসিঘাটের সন্নিকটে চিম্‌নাজী আপ্পার বাড়ির কাছে তিনি স্বীয় গৃহ নির্মাণ করলেন। দীর্ঘদিনের অবহেলায় সেই বাড়ি আজ ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে। তবু চিম্‌নাজী আপ্পার বাড়িটি আজও আছে। তার সামান্য দূরেই ভগ্ন প্রাচীর ও ভিত্তি পড়ে আছে তাম্বে পরিবারের।

বলবন্তরাও-এর পুত্র মোরোপন্ত বা মোরেশ্বর তাম্বের জন্ম হয় ১৮১১ সালে। বলবন্তের কবে মৃত্যু হয় সঠিক জানা যায়নি, তবে মোরেশ্বর সাবালক হয়ে চিম্‌নাজীর বংশধরদের কাজকর্মে সাহায্য

করবার আগে নয়। চিম্‌নাজী আপ্পার মৃত্যু হয় ১৮৩২ সালে। বারাণসীর সুবিখ্যাত ধনী থাট্‌লে পরিবারে বিবাহ হয় তাঁর নাবালিকা কন্যা দ্বারকাবাঈ-এর ১৮৩৬ সালে।

কৃষ্ণানদীর দোয়াবে অবস্থিত কাড়ার শহরের সাপ্‌রে পরিবার সুবিখ্যাত ধনী ছিলেন। সে দিনে ব্যাঙ্ক ছিল না। লোকের টাকা গচ্ছিত রাখা এবং সময়মতো তাদের দেওয়া ছিল সাপ্‌রেদের কাজ। কথিত আছে, তাঁদের বাড়িতে নিত্যকর্মে সোনার বাসন ব্যবহৃত হত। এই সাপ্‌রে পরিবারের জনৈকা কন্যার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে বিবাহ হয় মোরোপন্তের। মরাঠা ব্রাহ্মণ বংশের নিয়মানুসারে বিবাহের পরই কন্যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল ভাগীরথীবাঈ।

অসিঘাটের বাড়িতে এই ভাগীরথীবাঈ-এর গর্ভে ২১শে নভেম্বর ১৮৩৫ সালে মোরোপন্ত তাম্বের একটি কন্যা সন্তান হল। মায়ের ইচ্ছায় তার নাম হল মণিকর্ণিকা, সংক্ষেপে মনু।

প্রথম সন্তানই কন্যা, তাতে মোরোপন্ত বা তাঁর স্ত্রীর কোন দুঃখ ছিল না। সন্তান, সন্তানই।

যখন মনু একান্ত শিশু আর হাজারটি শিশুর মতোই হাসি কান্না খেলায় তার দিন কাটত, তখন তার দিকে চেয়ে চেয়ে বাবা মার স্বপ্ন ছিল না কি? নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন ঘর-দুয়ারের, ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির। মা হয়তো ভাবতেন অষ্টবর্ষে গহনা কাপড়ে গৌরী সেজে মনু তাঁর শ্বশুরালয়ে যাবে। ঘরে ঘরে মহালক্ষ্মী আর গণেশ চতুর্থীর পুজোতে শুভাসিনী করে নিয়ে যাবে তাঁর মনুকে। স্বামী পুত্রে মনু তাঁর সুখে সংসার করবে। বাবা হয়তো দিনান্তে গৃহে ফিরে শিশুর কলকাকলী শুনতেন আর ভাবতেন মেয়ে আমার সৌভাগ্যবতী হবে। দেশবিদেশ খুঁজে বর এনে দেব মনুকে।

কিন্তু পিতামাতার স্নেহসিঞ্চিত স্বপনের কোন দূরান্তেও ঠাঁই ছিল না দুর্মদ স্বাধীনতা সমরের। বাজনা যদি কিছু বেজে থাকে তো স্বপ্নে তাঁদের সানাই বেজেছে গৌড়সারং সুরে বিয়ের দিনে, আর সধবা মহারাষ্ট্রীয় রমণীদের আনাগোনায় অলঙ্কার শিঞ্জিত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তলোয়ারে তলোয়ারে ঝন্‌ঝনা তাঁরা কল্পনা করেননি।

সাধে কামনায় যে-হাতে হীরের বালা আর মোতির চুড়ির কথা তাঁরা ভেবেছেন, সেই হাত যে একদিন এক অদম্য উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তলোয়ার তুলে নেবে, সে তাঁরা ভাবেননি। পতিগৃহে মঙ্গলসূত্র এবং কুঙ্কুম তিলকের সীমন্তিনী চিহ্ন নিয়ে মৃত্যু মেয়েদের পরমকাম্য। স্নেহাস্পদের মৃত্যুর কথা যদিচ বাপ মা ভাবেননি, কিন্তু একদিন এক মহামৃত্যু বরণ করে তাঁদের কন্যা যে লক্ষ কোটি নরনারীর মনে যুগান্তব্যাপী শ্রদ্ধার আসন অর্জন করবে, আর তার সমাধিস্থান উত্তরকালে ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠবে, সে কথা নিশ্চয় মোরোপন্ত বা ভাগীরথী কল্পনা করেননি।

তাই অন্য শিশুদের মতোই শৈশব কাটতে লাগল মনুর মায়ের আদরে বাপের স্নেহে কাজল পরে দেয়ালা করে।—ভোরবেলা কলকাকলীর সঙ্গে মায়ের মুখ চেয়ে ঘুম ভেঙে উঠে আর সন্ধ্যাবেলা সেই মুখেরই ঘুমপাড়ানী গান শুনে ঘুমিয়ে পড়ে।

একান্ত ভালবাসা আর সুখশান্তির এই নীড়টুকুতে একদিন আঁধি এল। সে এক সাঁঝের বেলা। উত্তুরে বাতাসে ঝড় বইছে, পাথরের দেয়ালে পেতলের পিদীমের আলোটা দপ দপ করছে আর কালো কালো ছায়া নেচে বেড়াচ্ছে ঘরময়। বাইরে আকাশ দিয়ে সাঁজোয়া পরা ফৌজের মতো সারি সারি চলে যাচ্ছে মস্ত মস্ত কালো কালো মেঘ। এমনি এক সন্ধ্যাবেলা অসিঘাটের সেই বাড়িখানি, আর দুটি মানুষ, একজন বড় একজন শিশু,—তাদের মন আঁধার করে ভাগীরথী চলে গেলেন। পড়ে রইল তাঁর সাধের ঘর সংসার। ঘরের কোণে মহালক্ষ্মী, গণেশ আর বিষ্ণু বিগ্রহ। পূজার বিবিধ সরঞ্জাম, মনুর কাজললতা, দুধের বাটি সবই পড়ে রইল। তাঁর হাতের কল্যাণস্পর্শ ছাড়া সবই তো বোবা আর অর্থহীন। মোরোপন্ত একবার কাঁদলেন, একবার শিশুর মুখ চেয়ে বুক বাঁধলেন। তাঁর মা, বলবন্তের বিধবা পত্নী মনুকে কোলে তুলে নিলেন। দুই বছরের বালিকা মনু কিছুই বুঝল না। সে শুধু দেখল মা কোথায় যেন চলে গেল। রাণীর মতো সেজে, ফুলের দোলায়, রঙীন কাপড়ে। তারপর মন কেমন করে, কতরাত গেল কতদিন এল কতবার ঘুমচোখে হাত বাড়িয়ে মাকে খুঁজে শূন্য বিছানা ছুঁয়ে হাত ফিরে এল, মা আর এল না।

আজকের কথা তো নয়, একশ' সতেরো বছর আগেকার কথা। সেদিনও বারাণসী মস্ত বড় পুণ্যধাম। সাধু, সন্ন্যাসী, দীনদরিদ্র, রোগী, ভোগী, সবায়ের আশ্রয় বিশ্বনাথের চরণ। হরিদ্বার, এলাহাবাদ, জয়পুর, চুণার, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, কলকাতা, কটক আর মহীশূর, সর্বত্র থেকে ব্যাপারীরা এনেছে সেখানে তামা পেতল কাঁসা আর রূপোর বাসন। কাপড় জরি পাথরের জিনিস মাটির পুতুল হাতীর দাঁতের খেলনা চন্দনকাঠের বেসাতি। সিংহলের উপকূল থেকে ডুবুরীরা মুক্তো এনেছে। চিল্কা থেকে এসেছে শঙ্খ কড়ির বোঝা। কলকাতা থেকে গঙ্গায় নৌকো ভাসিয়ে এসেছেন বাঙালী পণ্ডিত, ব্যবসায়ী কর্মচারীর দল। বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সব বাঙালী ব্রাহ্মণ কোনরকম সমাজবিরুদ্ধ কাজ করেছেন তাঁরা অনেকে এসেছেন। তাঁরা আর ফিরে যাবেন না। দেশে ঘরে তাঁদের বলবে 'কেশেড়া বামুন'।

কতরকম মানুষ কতরকম মানসিক যজ্ঞ পূজার সহস্র উপচার। মণিকর্ণিকায় দিবারাত্রি চিতা বহ্নিমান। বোঝা বোঝা আশা আকাঙ্ক্ষা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সেখানে। গঙ্গার জলে মিশে তারা সমুদ্রে বিলীন হবে। আবার নতুন সব আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা জমা হচ্ছে বিশ্বনাথের চরণের তলায়।

দশাশ্বমেধ ঘাটে নিত্য গীতাপাঠ, ভক্তজনের ভজনগান—'দরশন দিজো গিরিধারী, মোহন মুরারী'। সাঁঝগঙ্গার খরস্রোতে কুমারী মেয়েদের মনের সরমাক্ত প্রার্থনাটুকু নিয়ে ভেসে চলেছে ছোট ছোট ঘি-এর প্রদীপ। সব যেমন ছিল তেমনি রইল। কিন্তু একখানি ঘরে সব শূন্য হয়ে গেল।

চিম্‌নাজী আপ্পার তার পূর্বেই মৃত্যু হয়েছে। সেটা ১৮৩৮ সাল। কানপুরের সমীপবর্তী বিঠুরে রয়েছেন শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও। তাঁর আহ্বানে মোরোপন্ত বিঠুর যাওয়া স্থির করলেন। সঙ্গে চললেন তাঁর আত্মীয় কেশবভাস্কর তাম্বে।

বড় বড় ভাও নৌকো বেসাতি আর যাত্রী নিয়ে দেশ দেশান্তরে ফিরছে। তারই একটিতে চললেন মোরোপন্ত। পরম স্নেহে গঙ্গা তাঁকে পৌঁছে দিলেন বিঠুর।

পুণ্যতীর্থ কাশীধামের অধ্যায় শেষ হল।

চার

যুগে যুগে কালে কালে বসুন্ধরার মতো রাজসিংহাসন ও বীরভোগ্যা। মরাঠা সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন শিবাজী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য দু'শ' বছরও টিকল না। উনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই দ্বিতীয় বাজীরাও সেই সাম্রাজ্য তুলে দিলেন ইংরেজের হাতে। তিনি নিজে রইলেন বিঠুরে।

১৮৩৮ সালে প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে প্রায় দশ হাজার লোক পেশবার উপর নির্ভরশীল হয়ে বিঠুরে থাকতেন। বাজীরাওকে ব্রিটিশ সরকার যে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়েছিলেন তা তাঁর নিজের পক্ষে পর্যাপ্ত ; কিন্তু এই বিরাট আশ্রিতের দলকে প্রতিপালন করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বহুদিন ধরে এই সব কর্মচারী সৈনিক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল পেশোয়া দপ্তরের আশ্রয়ে বিভিন্ন জীবিকা নিয়ে দিন কাটিয়েছেন। আজ তাঁদের পেশোয়া রাজ্যহীন, নির্বাসিত। তবু তিনি তাদের-ই। সুদিনে যিনি দেখেছেন, দুর্দিনেও তিনিই দেখবেন।

বিঠুর ঘাটের সন্নিকটে মোরোপন্ত এবং কেশবভাস্কর স্বীয় গৃহ নির্মাণ করলেন। মনু বড় হতে লাগলেন সেখানে। সম্ভবত মোরোপন্ত পেশবার অসংখ্য বিগ্রহাদির হোমশালার পূজাকর্ম তত্ত্বাবধান করতেন।

বৃদ্ধ বাজীরাও এই মা-মরা মেয়েটিকে স্নেহ করতেন। পেশোয়ার উত্তরাধিকারী ধুন্দুপন্থ নানা মনুর চেয়ে আঠারো বছরের বড় ছিলেন। তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। মনুর সঙ্গে তাঁর বাল্যের মিত্রতার কাহিনী হয়তো শুধু কাহিনীমাত্র। বাজীরাও-এর প্রাসাদে মনু কিছু কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। ঘোড়া চড়বার সুযোগও দুই-একবার হয়েছিল। স্বভাবত তেজী এবং দুরন্ত ছিলেন বলে তাঁর খেলার সঙ্গী প্রায়শঃ ছিল ছেলেরা। মনে হয়, মোরোপন্ত যেহেতু সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন, সেইহেতু

যথেচ্ছ খেলা করবার সুবিধা ছিল মন্নুর। শোনা যায় বাজীরাও মন্নুর নাম দিয়েছিলেন ছবেলী অর্থাৎ ময়না।

মন্নুর বাল্যজীবন সম্বন্ধে সর্বাধিক জনপ্রিয় কাহিনী হচ্ছে— একদিন নানাসাহেব, পাণ্ডুরং রাওসাহেব ও বালাসাহেব পেশবার একমাত্র হাতী চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সেই হাতীতে চড়বার জন্য মন্নু বারবার জেদ করেন। নানা এবং রাও তাতে কান দিলেন না। মেয়ের অপমানে ক্ষুব্ধ হৃদয় মোরোপন্ত বললেন— 'তোর ভাগ্যে হাতী কোথায়? তুই সামান্য লোকের মেয়ে!'

মন্নু সগর্বে উত্তর দিলেন—

'আমার অদৃষ্টে একদিন দশটি হাতী মিলবে।'

মেয়ের আট বছর বয়স উত্তীর্ণ হয় দেখে মোরোপন্ত স্বভাবতই চিন্তিত হলেন। তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের ঘরে অষ্ট বর্ষে গৌরী-দানের প্রথা ছিল। এই সময় তাঁতিয়া দীক্ষিত বিঠুরে এলেন।

বাজীরাও পেশবা ঝাঁসীরাজ প্রেরিত বাবা দীক্ষিত ভট্‌কঙ্কর বা তাঁতিয়া দীক্ষিতকে যথাযোগ্য সমাদর করলেন। সাধ্যমতো বিবাহ ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্য ভরসা দিলেন। মোরোপন্ত কন্যার ভাগ্য জানবার জন্য উৎসুক হয়ে তাঁতিয়া দীক্ষিতকে মন্নুর কাশীকৃত কোষ্ঠী দিলেন। তাঁতিয়া দীক্ষিত জন্মকুণ্ডলী পত্রিকা দেখে সবিশেষ আকৃষ্ট হলেন। বললেন, 'এই জন্মপত্রিকা যার, সেই জাতক কন্যা রাণী হবে। তার থেকে তার পতিকূলের নাম অমর খ্যাতি লাভ করবে।'

হৃষ্টচিত্তে মোরোপন্ত জানালেন কন্যা তাঁরই। তাঁতিয়া দীক্ষিত মেয়েটিকে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মন্নুকে সেই ঘরে আনা হল। তাঁতিয়া দীক্ষিত কনে দেখতে লাগলেন। সাড়ে সাত বছর বয়েস, কিন্তু বুদ্ধিতে উজ্জ্বল সপ্রতিভ চেহারা। তাঁর ভাল লাগল।

মোরোপন্তের সঙ্গে তাঁতিয়া দীক্ষিত কথাবার্তা বলছেন,—বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনায় আকৃষ্ট হয়ে পেশবাও মন্তব্য করছেন। এই সময় বাজীরাও-এর আসনের তলা থেকে একটি কালো সাপ ফুঁসে উঠল। ঘরের সকলে বিচলিত, বিমূঢ় হয়ে পড়লেন। অকুতোভয় মন্নু সকলকে চমৎকৃত করে একখানি আসন ঢাকা কম্বল দিয়ে

সাপটিকে চাপা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে এসে সাপটিকে হত্যা করল।

স্নেহকম্পিত হৃদয় মোরোপন্ত, বিচলিত পেশবা, সকলেই মনুকে ভর্ৎসনা করে বললেন,—'সাপটি তো কামড়ে দিতেও পারত।'

মনু বললেন,—'কিন্তু সাপটির ভাগ্য দেখ। শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য সাপটি এল এবং বাজীরাও পেশবা, ঝাঁসীর রাজশাস্ত্রী সকলকে ভয়চকিত করে তুলল। এই জীবনই আমার কাম্য।'

মনুর পরবর্তী জীবনের গৌরবময় পরিণতিই হয়ত জনসাধারণকে এই গল্পগুলি সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা, ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। বিবিধ গল্পে এবং গাথায় রাণীর স্মৃতির প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধাভক্তিই এ-গল্পগুলির উৎস।

মনুকে দেখে সন্তুষ্ট হলেন তাঁতিয়া দীক্ষিত। তাঁর বারবার মনে হল এই কন্যাই ঝাঁসীর রাণী হবার উপযুক্ত। তিনি গঙ্গাধর-রাও-এর সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। আশাতীত আনন্দে বিগলিতচিত্ত মোরোপন্ত সম্মত হলেন। বাজীরাও মোরোপন্তের ঘরাণা সম্পর্কে তাঁতিয়া দীক্ষিতকে বারবার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা বাক্য জানালেন। গঙ্গাধররাওকে সবিশেষ জানাবার জন্য তাঁতিয়া দীক্ষিত ফিরে গেলেন ঝাঁসী।

সানন্দ সম্মতিতে গঙ্গাধররাও সকন্যা মোরোপন্তকে আনবার জন্য যানবাহন পাঠালেন। তাঞ্জাম মাঝখানে নিয়ে সারি সারি ঘোড়সওয়ার টগ্‌বগিয়ে চলে গেল বিঠুর।

কন্যার সন্ধানে আর একটি দল নর্মদার দক্ষিণে ভ্রমণ করছিল। নর্মদা মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে অতি শ্রদ্ধেয় নদী। তিনি চিরকুমারী। একদা তাঁর বিবাহ স্থির হয়েছিল শোণ নদের সঙ্গে। শোণ নদ মহা আড়ম্বরে 'বরাত' নিয়ে ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন দক্ষিণে। বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে তাড়াতাড়ি এলে তাঁর পদমর্যাদার পক্ষে অশোভন হবে। বর দেখবার আগ্রহে অধীর চিত্তে নর্মদা তাঁর দাসী ঝুলাকে পাঠালেন। সে শোণকে দেখে এসে নর্মদাকে বরের সম্বন্ধে যথাযথ বর্ণনা দেবে। পুরুষের চিত্ত দাসীকে দেখে আকৃষ্ট হল। ঝুলাকে বিবাহ করলেন শোণ। এই কথা

জানতে পেরে ক্রুদ্ধা নর্মদা এক পদাঘাতে শোণ এবং ঝুলাকে পূর্বদেশে পাঠিয়ে দিলেন। শোণের অস্থিরমতি স্বভাবের জন্য নর্মদার বিবাহের উপর কোন আকর্ষণ রইল না। তিনি চিরকুমারী থাকবার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং অভিমানে পশ্চিমগামিনী হলেন।

(Colonel Sleeman—Rambles and Recollections P. 15—16).

সেই থেকে নর্মদা চিরকুমারী। তবু তিনি বহুজনের কাছে মা। তাঁর জল তাদের কাছে পুণ্যবারি। তাঁর আশীর্বাদ তারা জীবনে প্রার্থনা করে।

এই নর্মদার উত্তরে কন্যা সন্ধান করে এই রকম সুলক্ষণা কন্যার সন্ধান মিলেছে বলে তাঁতিয়া দীক্ষিত উৎফুল্ল হলেন।

মোরোপন্ত এবং মনুকে নিয়ে উপযুক্ত সমারোহে ফিরে এল ঝাঁসীর রাজপ্রতিভূরা। মনুকে নিয়ে যখন মোরোপন্ত এলেন, তখন ঝাঁসীর রাজঅন্তঃপুরিকা রমণীরা হোমশালার যাজ্ঞিকের কন্যাকে ঝাঁসী নগরীর উৎসব সমারোহ, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ইত্যাদি দেখিয়ে মুগ্ধ করবার প্রয়াস করলেন। বালিকা মনু বললেন—'পেশোয়ার প্রাসাদ যে দেখেছে, ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ দেখে সে মুগ্ধ হবে কি করে?—আর কি পেশোয়া কি ঝাঁসীরাজ, ঐশ্বর্যের মধ্যে চমকপ্রদ কি আছে?'

এই কথা অতিরঞ্জিত হয়ে গঙ্গাধরের কানে গেল। ক্রুদ্ধ গঙ্গাধর মোরোপন্তকে বিঠুরে ফিরে যেতে বললেন। মোরোপন্ত ফিরে গেলেন।

দাক্ষিণাত্য ঘুরে যে দলটি এল, তারা নিরাশ হয়ে ফিরে এল। তখন তাঁতিয়া দীক্ষিত পুনর্বার গঙ্গাধরকে বিঠুরের কন্যাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। গঙ্গাধর সম্মত হলেন। তাঁতিয়া তাঁকে বোঝালেন, রাজঅন্তঃপুরে সেই বালিকা কি বলেছে এবং মেয়েরা তাকে অতিরঞ্জিত করে কি বলেছেন, দুটি ভাষণে নিশ্চয় পার্থক্য আছে। তা ছাড়া সে বালিকা। তার পক্ষে চপল উক্তি করা সম্ভব। তবুও সেই কন্যা পতিবংশের পক্ষে একান্ত মঙ্গলকারিণী, তার থেকে ঝাঁসীর রাজবংশ খ্যাত হবে।

এবার বিবাহের আয়োজন হল। শুভদিনে মোরোপন্ত ও মনু

যখন ঝাঁসীতে প্রবেশ করলেন তখন নগরীর পথ আলোকসজ্জিত। পত্রপুষ্পের মালায় সুসজ্জিত বিভিন্ন নগরদ্বার। বৈশাখী-পূর্ণিমায় সংবৎ ১৮৯৯ এবং ইংরাজী ১৮৪২ সালে ঝাঁসীতে মহাধুমধামে বিবাহ সম্পন্ন হল।

যজ্ঞ হোমে পুষ্প এবং লাজাঞ্জলি দেবার পর গ্রন্থি বন্ধনের সময়ে মনু সভাস্থ সকলকে চমৎকৃত এবং গঙ্গাধরকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করে পুরোহিতকে বললেন, 'চাংগলী বলকট গাঁঠ বান্ধা'—অর্থাৎ গ্রন্থি ভাল করে বাঁধুন।

গঙ্গাধর বালিকাবধূর অঞ্জলি কোষবদ্ধ হাতে গ্রহণ করে হোমাগ্নিতে বারবার ঘি, মধু এবং লাজ বর্ষণ করলেন। অগ্নি সাক্ষী রেখে মনুর কপালে সধবার আয়তী চিহ্নস্বরূপ কুঙ্কুম তিলক আঁকলেন, গলায় পরালেন মঙ্গলসূত্র। করতলে কুঙ্কুম ও লাক্ষার পদ্মচিহ্ন আঁকা হল। পায়ে উঠল স্বর্ণশিঞ্জির ও পদাঙ্গুরীয়। পায়ে স্বর্ণালঙ্কার একমাত্র রাজকুলবধূরা পরতে পারেন। তারপর গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুভ দক্ষিণাবর্ত শাঁখ বাজিয়ে পুরনারীদের সঙ্গে পুরোহিত পূর্বগমন করলেন। পশ্চাতে নববধূকে নিয়ে রাজা গঙ্গাধর ঝাঁসীর রাজসিংহাসনে বসলেন।

অভূতপূর্ব গাম্ভীর্য ও গৌরবে গঙ্গাধরের হৃদয় উদ্বেলিত হল। কালো পাথরের সুবিশাল দুর্গের পায়ের কাছে ছবিখানির মতো প্রাসাদের সমস্ত কোণ থেকে অদৃশ্য পিতৃপুরুষদের কণ্ঠে অশ্রুত আশীর্বাণী উচ্চারিত হল। জ্যেষ্ঠতাত রঘুনাথহরি, পিতা শিবরাও ভাও, হতভাগ্য তরুণ যুবক রামচন্দ্ররাও, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুনাথরাও—মৃত্যুর পর তাঁরা দ্বেষ-বিদ্বেষ বিস্মৃতলোকে। আজ তাঁদের সকলের আশীর্বাদ হৃদয়ে অনুভব করলেন গঙ্গাধররাও। সকলের একমাত্র কামনা, নেবালকর বংশ যেন কখন বিলুপ্ত না হয়। এ বিবাহ শুধু দুটি মানুষের সংসার রচনার জন্য নয়; এর পিছনে আছে রাজসিংহাসনের দাবী। বুন্দেলখণ্ডের এই মরাঠা রাজ্যকে অমর করে রাখতে পারে শুধু উপযুক্ত বংশধর। নেবালকর বংশ চায় উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। রাজপরিবারে ভার্যা শুধু পুত্রের জন্য। তাঁর অন্যান্য ভূমিকা নগণ্য। সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে পুরোহিত আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন—'আজ থেকে পতিগৃহে

বধূর নতুন নামকরণ হল—লক্ষ্মীবাঈ। কল্যাণী, এই নামে তুমি তোমার পতিকুলের গৌরব বর্ধিত কর।'

গঙ্গাধররাও-এর প্রিয় হাতী সিদ্ধবক্স সোনার জরির সাজে সেজে শুঁড় তুলিয়ে রাজপথে ফিরতে লাগল। টগ্‌বগিয়ে চলতে লাগল আরবী ঘোড়া। রঙীন মুরেঠা বেঁধে বাজীওয়ালা মুরগীর আর ভেড়ার লড়াই লাগিয়ে দিল পথের ধারে। রাজার প্রিয় গোলন্দাজ গোলাম ঘোস কেল্লার বুরুজ থেকে ঘনগর্জ, অর্জুন, নলদার আর ভবানীশঙ্কর—এই চারখানা কামানে একশ'বার তোপ দাগলেন। বড় বড় কালো ঘোড়ার পিঠে চড়ে ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রস্ সদলবলে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন উপহার দিয়ে। ঝাঁসীর নাট্যশালায় নাটকাভিনয় চলতে লাগল। ওরছা, দতিয়া ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজারা এলেন নিমন্ত্রণ রাখতে। জলসায় বসে আতরদানিতে আঙুল ডুবিয়ে কানে আর গোঁফে লাগিয়ে ভাল ভাল গোয়ালিয়ার ঘরাণার গাইয়েদের গান শুনে ফিরে গেলেন তাঁরা। রাজপুরীতে নিরন্তর সর্বসাধারণ নিমন্ত্রিত হল। গরীব-দুঃখী অন্ন, বস্ত্র এবং কম্বল পেল। ব্রাহ্মণরা সুবৃহৎ থালা পরিপূর্ণ করে 'পুরাণপুরী', 'শ্রীখণ্ড' এবং 'আনারসা' ভোজন করে 'নকো, নকো' অর্থাৎ না-না বলতে লাগলেন।

ঝাঁসীর রাজকুলের কুলস্বামিনী অর্থাৎ গৃহদেবতা মহালক্ষ্মীর মন্দিরে মহাসমারোহে নবদম্পতির শুভকামনায় পূজা নিবেদিত হল। বিশাল পিতলের আধারে জ্বলতে লাগল নন্দাদীপ। সেই প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলে রাজপরিবারের কল্যাণ কামনা করবে যুগ যুগ ধরে দেবতার কাছে, এই হল শাস্ত্রের বিধান। তার শিখা যদি তৈলাভাবে বা অন্য কোন কারণে নিভে যায়, তবে ঘোর অমঙ্গল।

মোরোপন্ত একমাত্র সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারলেন না। প্রথমে তিনি বিঠুরে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু মনুর সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁর কাছে একান্ত দুর্বহ বোধ হল। পুনর্বার ঝাঁসীতে ফিরে এলেন তিনি। গঙ্গাধররাও তাঁকে সসম্মানে বৃত্তি নির্দিষ্ট করলেন। মুরলীধর মন্দির নির্মিত করে তাতে বাস করতে লাগলেন মোরোপন্ত, মুরলীধরের পূজারী হয়ে।

মোরোপন্তের বয়েস তখন বত্রিশ মাত্র। পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, অটুট

যৌবন। গুরসরাইয়ের বাসুদেব শিবরাও খানওয়ালকরের কন্যার সঙ্গে বিবাহ হল তাঁর। এই কন্যার নাম বিবাহের পর হল চিমাবাঈ। চিমাবাঈ লক্ষ্মীবাঈ-এর চেয়ে দুই তিন মাসের মাত্র বড় ছিলেন। চিমাবাঈ-এর সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈ-এর মাতা কন্যা সখী বন্ধু'র মিশ্রণে একটি মধুর সম্পর্ক রচিত হল।

তখন গঙ্গাধররাও-এর বয়স উনত্রিশ, লক্ষ্মীবাঈ-এর বয়স আট। 'মনু' নামের সঙ্গে বিঠুরের সমস্ত সম্বন্ধই ছাড়তে হল তাঁকে। এখন থেকে তিনি হলেন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

পাঁচ

এতদিন সিংহাসনে শুধু ছিলেন রাজা, এবার তাঁর পাশে এসে বসলেন রাণী। সমুজ্জ্বল হল ঝাঁসীর রাজ-সিংহাসন। কিন্তু রাণীর বয়স খুবই কম। সাত পেরিয়ে সবে আটে পড়েছেন তিনি।

তবু তিনি রাণী। ভার নিতে হল তাঁকে নানাবিধ দায়িত্বের। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের নানাবিধ আচার-নিয়ম শিখতে হল নাবালিকা রাণীকে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী। তাঁদের আহারে নানাবিধ আচার, চাট্‌নি এবং মুখরোচক আনুষঙ্গিকের নিত্য ব্যবহার। গঙ্গাধররাও ভোজনরসিক ব্যক্তি। তাঁর জন্য শ্রীখণ্ড্ তৈরি করতে বিশেষ কুশলের প্রয়োজন হত। রন্ধন-কলাবিদ্ মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অন্তঃপুরে বিবিধ সুখাদ্য তৈরি হত। রাণীকে দীর্ঘদিন সেখানে থেকে নানারকম আচার, চাট্‌নি, ফল কাটবার শিল্প—সব শিখতে হল। পূজার নানাবিধ নিয়ম এবং সেখানে ফুল অর্ঘ্য ভোগ সাজাবার প্রক্রিয়া—তা-ও জানতে হল। বিদ্যাভ্যাস ও অন্যান্য শিক্ষণীয় বিষয়ও শিখতে লাগলেন রাণী অন্তঃপুরে থেকে।

বধূ যাতে রাজ-পরিবারের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন, সেদিকে মনোযোগ ছিল গঙ্গাধরের। বধূকে তিনি যথাসম্ভব সুযোগ দিলেন। কখন তত্ত্বাবধান করতে দিলেন রাজ-গ্রন্থাগারের। সেখানে সারি সারি আধারে রক্ষিত গ্রন্থগুলি দেখে বালিকার মনে

অনেক জিজ্ঞাসা জাগত। গীতার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তাঁর অতি প্রিয় ছিল। বিদ্যাশিক্ষাতে তিনি মন দিলেন।

সেদিনকার রাজ-পরিবারের মেয়েরা থাকতেন একান্ত অন্তঃপুরিকা হয়ে। বিবাহের বন্ধন খুব কম ক্ষেত্রেই প্রাণের বন্ধনে রূপান্তরিত হত। রাজারা সাধারণতঃ ষড়যন্ত্রের ভয়ে নিরন্তর সশঙ্কিত থাকতেন। রাজসিংহাসনের আসন যে নানাবিধ শঙ্কায় কণ্টকিত, তাই ভুলতেন তাঁরা বিলাস, শিকার, সুরা ও সঙ্গিনী নিয়ে। রাজ-মহিষীরা থাকতেন অন্তঃপুরে। সেখানে আশ্রিতা দাসদাসী এবং অনুগৃহীতাদের উপর তাঁদের রাজত্ব চলত। এই ছিল সাধারণ রেওয়াজ। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তার কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হল। তার কারণ হয়তো গঙ্গাধররাও-এর খেয়ালী স্বভাব এবং সহজাত শিল্পী প্রকৃতি। গঙ্গাধররাওকে কেউ কেউ বলেছেন ক্রোধী এবং উগ্রস্বভাব। সবটা সত্য নয়। স্ত্রীকে কোনদিন বহির্জগতে এসে ঝাঁসীর দায়িত্ব নিতে হবে, তা তিনি ভাবেননি। অতএব অন্তঃপুরের বাইরে তাঁর আসা গঙ্গাধর পছন্দ করতেন না। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈকে একটি ব্যক্তিত্ব অর্জনে সাহায্য করেছিলেন গঙ্গাধররাও। তাঁর স্নেহশীতল প্রশ্রয়ে বড় হতে লাগলেন রাণী।

বিবাহের অব্যবহিত পরেই জরুরী অবস্থার অবসানে ব্রিটিশ গঙ্গাধররাও-এর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে রাজী হলেন। ১৮৪৩ সালে গঙ্গাধররাও এই শর্তে ঝাঁসীর স্বাধীন রাজা হিসেবে স্বীকৃত হলেন যে, ঝাঁসীতে একটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনী রাখতে হবে। বুন্দেলা ও ঠাকুরদের মধ্যে সম্ভাব্য বিদ্রোহ দমনই তার উদ্দেশ্য। এই সেনাবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য তুলিও, তালগঞ্জ এবং আরও তুটি জেলা, যার বার্ষিক আয় ঝাঁসীর মুদ্রামূল্যে ২,৫৫,৮৯১৲ টাকা, গঙ্গাধর ব্রিটিশ সরকারকে দিলেন। শিবরাও ভাও-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত শর্ত অনুযায়ী মোতে ও জালৌন পরগণা বরাবরই ব্রিটিশাধীনে ছিল। গঙ্গাধররাও নিজের তরফ থেকে জানালেন ঝাঁসীতে যে ব্রিটিশ সৈন্য থাকবে, তা সংখ্যায় মাত্র তুই ডিভিশন হবে এবং তোপখানা থাকবে তুইটি।

খোলা দরবারে গঙ্গাধররাওকে ক্ষমতা দেওয়া হল একটি সুষ্ঠু এবং শোভন অনুষ্ঠানের অন্তে।

বিবাহের পরে এই ঘটনাতে ঝাঁসীবাসীর মনে ধারণা হল নববধূ সত্যই ঝাঁসীতে মঙ্গল এনেছেন। রাজাও খুশি হলেন।

এবার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় মন দিলেন গঙ্গাধর-রাও। প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন রাঘোরামচন্দ্র সন্তকে। পরে এঁকে গোয়ালিয়ার পাঠান হয়েছিল। নরসিংহ ক্রোপা, নানাভোপটকার প্রভৃতি বিভিন্ন পদ পেলেন। ঝাঁসী, অরছা ও দতিয়ার আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিদ্বেষের ইতিহাস দ্বিশতাধিক বছরের পুরনো। ঝাঁসীর রাজকোষের অর্থ যখনই অরছা দিয়ে আনা হত, তখনই অরছার রাজারা লোক লাগিয়ে সেই টাকা লুঠ করবার চেষ্টা করেছেন। অরছার রাজার নির্দেশেই ঝাঁসীর রাজপুত সর্দাররা 'ভূমিয়াবৎ' জাহির করেছিলেন রামচন্দ্ররাও-এর সময়ে। অরছার সীমান্তবর্তী জায়গাগুলি, যেখানে রাজপুত বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে, সেখানে গঙ্গাধররাও কিছু কিছু ফৌজ রাখলেন। ভারতীয় রাজ্যের অধীনে ভারতীয় সৈন্য যাতে বেশি না থাকে সেদিকে ইংরেজ সরকারের যথেষ্ট নজর ছিল। ঝাঁসী সরকারের অধীনে ৩,২৪০ জন সৈন্য ছিল। ৩০০০ পদাতিক, ২০০ অশ্বারোহী এবং ৪০ জন গোলন্দাজ।

গঙ্গাধররাও রাজা হবার পূর্বেও শৌখীন আমোদ-প্রমোদ ভালবাসতেন। তাঁর উদ্যোগেই ঝাঁসীতে শৌখীন নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল। নাট্যশালার জন্য গঙ্গাধররাও ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে অভিনেত্রীদের রেখে শিক্ষিত করতেন সঙ্গীতে নৃত্যে ও অভিনয়ে। তাঁর নাট্যশালা আজ বিলুপ্ত। অভিনেত্রীদের নামও জানা যায় না। যে অভিনয় সেদিন সেখানে হত, তার চেয়ে অনেক বড় খেলা সেখানে দেখিয়েছিল সাগরপারের বিদেশী মানুষ। তারাও তল্পি-তল্পা গুটিয়ে চলে গিয়েছে সাতসমুদ্রের পারে। এক শতাব্দী বাদে একটিমাত্র নাম সেখানে আজও শোনা যায়। সে হচ্ছে মোতিবাঈ-এর নাম। ঝাঁসীর উর্বশী ছিল সেই রাজনর্তকী। তাকে গঙ্গাধর বলেছিলেন বুন্দেলখণ্ডের মোতি। আজও শোনা যায় অখ্যাত কবির গান তার রূপের স্তুতিতে—

'মোতি, মাথে মেঁ হীরা
মোতি গলে মেঁ হার—'॥

শতাব্দীর অন্ধকার সমুদ্র মন্থন করে শুভ্র মুক্তার মতো মোতির নাম আজও শোনা যায়।

ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদ গঙ্গাধররাও নির্মাণ করেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডের নিজস্ব ঢঙে নির্মিত এই চারতলা প্রাসাদের সর্বত্র প্রাচীরচিত্র দিয়ে দেয়াল হল সুশোভিত। অলিন্দে ও খিলানে হংসমিথুন, মাছ, ময়ূর ইত্যাদির মূর্তি উৎকীর্ণ করা হল পাথরে।

নাট্যকার ও অভিনেতাদের পৃষ্ঠপোষক বাবাসাহেব গঙ্গাধর-রাও-এর নাম শুনে গোয়ালিয়ার ও অন্যান্য শহরগুলি থেকে শিল্পী ও কলাকুশলীদের দল এসে ভিড় করলেন ঝাঁসীতে।

গঙ্গাধররাওকে কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন, পূর্ব শাসকদের মতোই অপদার্থ। শতাধিক বর্ষ পূর্বের ভারতবর্ষের সামন্তরাজাদের যোগ্যতা বিচার করা উচিত তৎকালীন অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তুলনা করে। সে মাপকাঠি ভিন্ন।

ঝাঁসীর রাজারা অপদার্থ বা অযোগ্য ছিলেন না। কেননা অতি সামান্য অবস্থা থেকে তাঁরা ঝাঁসীকে একটি প্রধান নগরীতে পরিণত করেছিলেন। গঙ্গাধররাও রাজকার্য পরিচালনায় অযোগ্য ছিলেন না। তাঁর রাজত্বকালে স্বল্প সময়ে তিনি ঝাঁসী রাজ্যের পূর্বঋণের পঞ্চাশ লক্ষ টাকা প্রায় শোধ করেছিলেন। বাকি ছিল- ছত্রিশ হাজার টাকা।

গঙ্গাধররাও এবং লক্ষ্মীবাঈ-এর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে সমসাময়িক মহারাষ্ট্রীয় পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভট্ট গোড্‌সে বরসোইকর বলেছেন—'এই বিবাহে লক্ষ্মীবাঈ সুখী হননি। গঙ্গাধররাও সর্বতোভাবে তাঁর স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন।'

এই উক্তির সততা বোঝা যায় না। কেননা বিষ্ণুভট্ট গঙ্গাধরের জীবিতকালে ঝাঁসীতে আসেননি। রাজমহিষীদের বহির্গমনের প্রথা ছিল না বলেই লক্ষ্মীবাঈ অন্তঃপুরে থাকতেন। স্বামী তাঁর ব্যক্তিত্ব খর্ব করবার চেয়ে বিকশিত হতেই সাহায্য করেছিলেন, একথা রাণীর বিমাতা চিমাবাঈ এবং অন্যান্য রাজঅন্তঃপুরিকা, যাঁরা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি বেঁচেছিলেন, তাঁরাই বলে গিয়েছেন।

রাণী হিসাবে লক্ষ্মীবাঈ বিভিন্ন দাসী ও পরিচারিকা পেয়েছিলেন। স্বীয় স্বভাবগুণে তিনি তাঁদের সখীর মর্যাদা

দিয়েছিলেন। তাঁর সহচারিণীদের মধ্যে সুন্দর, মান্দার, কাশী এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। হীরা কোরীণ, ঝলকারী, এঁদের নামও পাওয়া যায়।

রাণীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। তাঁর বিমাতা চিমাবাঈ-এর ১৮৯৭ সালে ৬২ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। তখন চিমাবাঈ-এর পৌত্র এবং রাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ চিন্তামণি তাম্বের বয়স ষোল বছর। ইনি আজও জীবিত। পিতামহীর অঙ্কে বসে শৈশব থেকে ইনি রাণীর সম্বন্ধে বিভিন্ন কথা শুনেছেন। দৈনন্দিন জীবনের আচারে ব্যবহারে নানা কথা ও রুচিতে, একটি চরিত্রকে বিশেষভাবে জানবার পক্ষে সেই কথাগুলির মূল্য আছে।

আহারে রাণীর আসক্তি ছিল না। তিনি সামান্য অধিকপক্ক ঘি পছন্দ করতেন। বিশেষ উৎসবের দিনে তিনি নিজ হাতে স্বামীকে পরিবেশন করে খাওয়াতেন। অন্যথায় তাঁদের আহারের সময় স্থান সবই ছিল বিভিন্ন।

অপরিচ্ছন্ন বেশ, অসংস্কৃত কেশ এবং অমার্জিত ব্যবহার যে কোন রমণীর মধ্যে দেখলে তিনি বিরক্তিতে তীব্র ভ্রূকুটি করতেন।

কপালে তাঁর অর্ধচন্দ্র এবং তারকা চিহ্নিত উল্কি ছিল। চিমাবাঈ পরিণত বয়সে তাঁর পৌত্রীকে প্রায়ই বলতেন—'আয়, তোর কপালে উল্কি দিয়ে দিই, বাঈ সাহেবের যেমন ছিল।'

লক্ষ্মীবাঈ পরিণত যৌবনে কেমন দেখতে ছিলেন?

প্রায় সব মানুষই মনেপ্রাণে, চেতনে বা অবচেতনে, একটু জমি একটু মাটি ভালবাসে। জমি, শস্য আর ক্ষেতের উপর সকলের সেই ভালবাসা থেকে হয়তো এসেছে চরিত্র ও রূপের বিভিন্ন উপমা। মাটির মতো সহাশীলা, পাকাকলার মতো গায়ের রঙ—ইত্যাদি।

রাণীর রূপবর্ণনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন—গোল মুখ, পাকা গেঁহু (গম)-এর মতো গায়ের রঙ, ভুট্টার সুসম্বদ্ধ দানার মতো সুন্দর দাঁত, নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব দেহ, অতীব সুগঠনা, কেশ-সম্পদে সমৃদ্ধা, কণ্ঠস্বর সামান্য ভারী, কৃষ্ণ বিশাল আয়ত নেত্র।

সধবাকালীন অবস্থায় তিনি নাকে নথ, কণ্ঠে চিঞ্চপেটি বা চিক্, কণ্ঠি, সাতলহরী মুক্তাহার, কানে বুগ্ড়ী বা কর্ণিকা, হাতে বালা এবং পায়ে নূপুর পরতেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে সৌভাগ্যবতী সধবাদের জায়গা বড় সম্মানের। তাঁদের বলা হয় 'শুভাসিনী'। রাণীর কাছে 'শুভাসিনী' হবার আমন্ত্রণ এলে তিনি পারতপক্ষে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমায় রাজপ্রাসাদে মহাধুমধামে উৎসব হত। ঝাঁসীর বিভিন্ন পরিবারের মেয়েরা সেখানে আমন্ত্রিত হতেন। রন্ধনশালায় সুবিশাল তামা পিতলের বাসনে বিবিধ সুখাদ্য তৈরি করতে করতে ঘর্মাক্ত কলেবরা ব্রাহ্মণীদের কলহে, ছোট ছেলেদের কান্নায়, বাক্যালাপনিরত রমণীদের কথায়, খেতে অধিক বিলম্ব হচ্ছে বলে অধৈর্য ব্রাহ্মণদের বারবার তাড়া দেওয়াতে, শাস্ত্রী পণ্ডিতদের দ্রুত শিরশ্চালনা সহ উচ্চকণ্ঠে শাস্ত্র আলোচনায়, দাসদাসীদের কথাবার্তায় যে পরিবেশ রচিত হত, তার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে নিশ্চয় প্রাচীনারা সেদিনও মারাঠি ভাষায় বলতেন —'ব্যাপার বাড়িতে এরকম হয়েই থাকে।'

চৈত্র মাসে গৌরীপূজার পর সংক্রান্তিতে ব্রত উদযাপন করবার সময় ঝাঁসীর বিভিন্ন গৃহ থেকে রাণীকে 'শুভাসিনী' হবার নিমন্ত্রণ আসতো। যেখানে নিমন্ত্রণকারিণী সঙ্গতিহীন, সেখানে রাণী পূর্বাহ্ণে নিমন্ত্রণের সমস্ত উপকরণ পাঠাতেন।

হরিদ্রাকুঙ্কুমের উৎসবে বড় আনন্দ করতেন মেয়েরা। সকলে সকলকে ফুল ও কুঙ্কুম দিতেন। রাণীর ব্যবহারে মুগ্ধ অন্তঃপুরিকারা তাঁর প্রশংসা করতেন এবং আনন্দে গঙ্গাধররাও তাঁকে প্রায়শঃই স্নেহ-কৌতুকে বলতেন—'তুমি কি তোমার নামের যোগ্য হবার জন্য এত চেষ্টা করছ?'

একদিন গঙ্গাধররাও রাণীকে একটি উপহার দিয়ে মুগ্ধ করলেন। কাশী থেকে কারিগরকে দিয়ে নিজের আঁকা নক্সা অনুযায়ী একটি রূপোর তাঞ্জাম বা 'মেণা' তৈরি করিয়ে আনলেন। তার ভিতরে লাল ভেলভেটের উপর সোনার জরিতে কারুকার্যখচিত গদি। জরির থোপ্না তার চারিপাশে, দুই দ্বারে কারুকার্যখচিত পর্দা। এই পাল্কি চড়ে বিশেষ উৎসবের দিনে রাণী মহালক্ষ্মী মন্দিরে পুজো দিতে যাবেন। লছমীতাল হ্রদের ভেতরে অবস্থিত মন্দিরের তোরণে তখন সানাই বাজবে। লছমী দরওয়াজার পাশে প্রার্থী

ভিখারী সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। তাদের হাতে মিষ্টান্ন আর পয়সা পড়লে হৃষ্টচিত্তে তারা আশীর্বাদ করবে। এতটুকু পর্দা ফাঁক করে রাণী প্রসন্ন নয়নে তাদের দিকে তাকাবেন। সকলের আশীর্বাদ এবং শুভকামনায় সার্থক হবে তাঁর সে দিনের পূজা।

বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও রাণীর সঙ্গে তাঁর স্বামীর একটি হৃদয়ের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল।

গঙ্গাধররাও পরম শৌখীন লোক ছিলেন। ঘোড়া আর হাতীর বড় কদর বুঝতেন তিনি। তাঁর প্রিয় হাতী সিদ্ধবক্সের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাতীকে প্রত্যহ আখ ও জিলাপী খাওয়ান হত। বিশেষ উৎসবে রাজা চড়তেন তার পিঠে। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে ঝাঁসী নগরী অধিকার করবার পর খোলা রাজপথে, প্রকাশ্যে ঝাঁসীর রাজবাড়ির বিবিধ সম্পত্তি নীলামে বিক্রি করা হয়েছিল। ইন্দোরের বিখ্যাত ধনী সর্দার বুলে এই হাতীটিকে কিনেছিলেন। মালিক বদলে মন ভেঙে গিয়েছিল সিদ্ধবক্সের। অনেক বিপর্যয় যে ঘটে গেল তার ভাগ্যে, তাই বুঝেই হয়তো ঝাঁসী নগর ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে সে আহার ত্যাগ করল। ইন্দোরে পৌঁছবার বহু আগে পথেই তার মৃত্যু হয়।

অপর একটি হাতীর দাঁত ছিল চমৎকার। তাতে শোভাযাত্রার সময় দুটি বিশাল মোমবাতির ঝাড় ঝুলিয়ে দেওয়া হত। জ্বলন্ত বাতি নিয়ে যখন সেই হাতী চলত রাজপথে, তখন মুগ্ধ দর্শকরা চেয়ে থাকত। অশ্বশালাও তাঁর অতি সুন্দর ছিল। নাট্য ও সঙ্গীত কলায় তাঁর অনুরাগ ছিল। আচারে ব্যবহারে তিনি গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

তাঁর রাজত্বকালে নারায়ণ শাস্ত্রী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ একটি সুরূপা ভাঙী রমণীর প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন। অন্যান্য ব্রাহ্মণরা তাতে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ হলেন এবং যথাকালে গঙ্গাধররাও-এর সমীপে এই সংবাদ পৌঁছল। গঙ্গাধররাও অপরাধী দুইজনকে তলব করলেন। নারায়ণরাও শাস্ত্রী শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করলেই নিস্তার পেতেন এবং নিম্নবর্ণা স্ত্রীলোকটির হয়তো গুরুতর শাস্তি হত। নারায়ণরাও কাপুরুষের মতো স্ত্রীলোকটিকে ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। ফলে ঝাঁসীর ছ'শ' ব্রাহ্মণ পরিবারে তুমুল আলোড়ন

উপস্থিত হল। নারায়ণরাও হাসিমুখে সেই রমণীর সঙ্গে নগর ত্যাগ করে গঙ্গাধররাওকে সঙ্কট থেকে নিস্তার দিয়ে গেলেন। তারপর নগরীর রাস্তাগুলি বিবিধভাবে শোধন করা হল।

গঙ্গাধররাও ইংরেজের সঙ্গে ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য এবং আত্মমর্যাদা রেখে চলতেন। তাঁর সমসাময়িক ইংরাজ রেসিডেণ্ট এবং সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে বিবিধ কাহিনী প্রচলিত ছিল। নাট্যশালার অভিনেত্রীদের পোশাক ও অলঙ্কার তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে নির্মিত হত। একদিন ক্যাপ্টেন গর্ডন প্রশ্ন করলেন—

: দুষ্ট লোক বলে, মহারাজ অবসর সময়ে স্ত্রীলোকের বেশভূষা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন?

গঙ্গাধর বললেন—তোমরা দূর সমুদ্রপার থেকে এসে ভারতীয় রাজ্যগুলির স্বামী হয়ে বসেছ। পরনির্ভরশীল এই রাজ্যে আমাদের নিজেদের তো কিছু করবার নেই। কাজেই অলঙ্কার পরলেই বা অপরাধ কি?

অন্যসময়ে, কোন একবার দশহরা উৎসবের দিন রবিবার ছিল। গঙ্গাধর হাতীর পিঠে নগর পরিক্রমায় বেরবেন মনস্থ করলেন। ব্রিটিশ ফৌজের মিলিটারী ব্যাণ্ড তাঁকে অনুসরণ করতে রাজী হল না। তাদের ধর্মে রবিবার পুণ্যদিবস। তারা সেদিন বেরবে না। আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। ক্রোধে অধীর হলেন গঙ্গাধররাও। সামন্তরাজ্যগুলির নৃপতিদের মনে অসন্তোষের কোন কারণ সৃষ্টি হয়, তা সরকারের অভিপ্রেত ছিল না। গঙ্গাধর অসন্তুষ্ট হয়েছেন জেনে শশব্যস্তে মিলিটারী ব্যাণ্ডসহ ব্রিটিশ ফৌজ হাজির হল। তারা নগরের পথে পথে ভ্রমণ করল রাজার পেছনে।

১৮৫০ সালে, মাঘী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে, গঙ্গাধররাও ত্রিস্থলী তীর্থ পরিক্রমার উদ্দেশ্যে সপরিবারে বেরলেন। প্রথমে তাঁরা গেলেন কাশী। কাশীর ইংরেজ কমিশনার-এর কাছে হুকুম গিয়েছিল গঙ্গাধররাও-এর সম্বর্ধনার জন্য যেন যথোচিত আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন কাশীর বিখ্যাত ধনী ও বিশিষ্ট বাঙালী নাগরিক রাজেন্দ্র মিত্র। গঙ্গাধররাও প্রবেশ করবার সময় তিনি উঠে দাঁড়াননি। গঙ্গাধররাও তাঁকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় খাস দপ্তরে রাজেন্দ্র মিত্রের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল।

উত্তর ভারতবর্ষের গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডটি মেরামত করবার সময়ে তিনি কাশীর সন্নিকটে তাঁর আট বিঘা জমি সরকারকে দিয়েছিলেন। কলকাতায় চিঠি লিখে তিনি গঙ্গাধররাও-এর এই ব্যবহারের প্রতিকার প্রার্থনা করলেন। গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারী সবিনয়ে জানালেন গঙ্গাধররাও-এর সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। তিনি রাজা খেতাবধারী। তাঁকে সম্মান দেখাবার বাসনা না থাকলে রাজেন্দ্রবাবুর উক্ত সভায় যাওয়া ঠিক হয়নি।

১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী যুদ্ধে উক্ত রাজেন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্রদ্বয় বরদা ও গুরুচরণ সরকারকে বিশেষ সাহায্য করে রায়বাহাদুর খেতাব পেয়েছিলেন। এঁদের বংশধরগণ আজও কাশীতে বাস করছেন।

কাশীতে বিবিধ দর্শনীয় স্থান দেখে, লক্ষ্মীবাঈ তাঁর জন্মস্থান সেই বাসভবনটিও দেখলেন। বিশাল নগরী কাশী, বিবিধ দেবমন্দির। বিশ্বনাথের গলির অজস্র দোকান, দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ন্যাসী সাধক ও গায়কদের আগমন, এইসব দেখে তাঁর চিত্ত আনন্দিত হল।

গয়াতে পিতৃপুরুষের তর্পণ করে, প্রয়াগ তীর্থে স্নান করে তাঁরা ঝাঁসীতে ফিরলেন। গঙ্গাধরের পুরী যাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু রাণী সন্তানসম্ভাবিতা। সেই দীর্ঘ যাত্রার ফলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন। তাই সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করলেন গঙ্গাধররাও।

সন্তান লাভের আনন্দে প্রফুল্লচিত্ত গঙ্গাধররাও প্রত্যাবর্তনের কালে প্রার্থী ও ভিখারীদের মুক্তহস্তে দান করতে করতে এলেন। ঝাঁসীতে ফিরে এসে রাণীকে আনন্দে রাখবার জন্য বিবিধ আয়োজন করলেন তিনি। রাণীর স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে তার জন্য অন্তঃপুরে কলরব সহযোগে অন্তঃপুরিকারা বিবিধ সুখাদ্য তৈরি করতে লাগলেন।

১৮৫১ সালে মার্গশীর্ষ শুদ্ধ একাদশী তিথিতে রাণীর একটি পুত্র-সন্তান হল। আনন্দে উৎফুল্ল গঙ্গাধররাও দান ধ্যান, মন্দিরে মন্দিরে পূজা প্রেরণ, বাজি পোড়ান ইত্যাদি শুরু করলেন। পুত্র মানেই বংশধর। তার মানে তাঁর নাম ধরে রাখবে পৃথিবীতে এমন একজন রইল। নাম হল নবজাতকের দামোদর গঙ্গাধররাও।

কিন্তু পুত্র তিন মাসের বেশি বাঁচল না। গঙ্গাধর বালিকা

জননীকে সান্ত্বনা দেবেন কি, নিজেই ভেঙে পড়লেন। কাজে কর্মে উৎসাহ চলে গেল, আহার প্রায় পরিত্যাগ করলেন। বিষণ্ণ এবং শোকাতুর গঙ্গাধররাও বললেন, 'আমার জীবনের গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, কোন উৎসাহ পাচ্ছি না।'

একাদিক্রমে জ্বর এবং পেটের পীড়ায় ভুগতে লাগলেন গঙ্গাধর-রাও। ১৮৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শারদীয়া নবরাত্রির উৎসবে প্রয়োজনীয় উপবাস করে গৃহদেবতা মহালক্ষ্মীর মন্দিরে হেঁটে গেলেন গঙ্গাধররাও। স্ত্রী বা শ্বশুর কারো নিষেধই শুনলেন না। সেই পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির পথে যেতে লাগল।

দশহরা অর্থাৎ বিজয়ার দিন একটি প্রাচীন সুন্দর অনুষ্ঠানের অনুকরণ হত ঝাঁসী ও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যে। পুরাকালে বিজয়া দশমীর দিন রাজারা বিজয়যাত্রায় বেরতেন। শরতের সুন্দর আকাশ মধুর বাতাস প্রকৃতির উৎসব-সজ্জা রৌদ্র ও বর্ষণের আবর্তন পরম সুখাবহ। তাই সেই সময়ে তাঁরা দেশজয়ে বেরতেন। ১৮৫৩ সালে ঘোড়ায় চড়ে দেশজয়ের আনন্দ থেকে রাজারা বহুদিন থেকেই বঞ্চিত। তবু প্রাচীন প্রথার অনুসরণে 'সীমা লঙ্ঘন' অনুষ্ঠান করতেন তাঁরা। স্বীয় রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে অপর রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করে বনভোজনাদি উৎসব করে ফিরে আসতেন। গঙ্গাধর এবারও 'সীমা লঙ্ঘন' করে দতিয়া রাজ্যের সীমানায় গেলেন। কিন্তু সেখান থেকেই পাল্কি চড়ে ফিরে এলেন অসুস্থ হয়ে। সেদিন থেকেই রাজপ্রাসাদে বৈদ্যের আনাগোনা চলতে লাগল। গোঁড়া হিন্দু গঙ্গাধররাও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ছাড়া অন্য মতে চিকিৎসায় রাজী ছিলেন না। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাতে কোন উপকারই পাওয়া গেল না। রাণী সর্বদা স্বামীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থেকে সেবা ও যত্নে এতটুকু আরাম দিতে ব্যস্ত থাকলেন। কিন্তু অতিদ্রুত রোগ সমস্ত চিকিৎসার বাইরে চলে গেল। গোয়ালিয়ার রেওয়া ও বুন্দেলখণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিনিধি ডি. এ. ম্যালকম বুন্দেলখণ্ডের রাজনৈতিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এলিসকে জানালেন, তিনি নিজে অনুপস্থিত, অতএব এলিস যেন গঙ্গাধররাওকে নিজে দেখাশুনা করেন।

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মোরোপন্ত তাম্বে প্রমুখ হিতৈষী

শুভানুধ্যায়ীরা গঙ্গাধররাও-এর অবর্তমানে রাজ্যের অবস্থা কি হবে, তাই চিন্তা করতে লাগলেন। সমস্ত রোগযন্ত্রণা ছাপিয়ে সেই চিন্তাই গঙ্গাধররাও-এর মনে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্বামী স্বেচ্ছায় দত্তক গ্রহণে অভিলাষী দেখে রাণীর মনে প্রবল আশঙ্কা উপস্থিত হল। আবার স্বামীর কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না। উনিশে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা গঙ্গাধরের ইচ্ছায় দেওয়ান নরসিংহ ক্রোপা, রাও আপ্পা, লালা লাহোরীমল্, লালা তদ্রিচাঁদ সকলে মোরোপন্ত তাম্বের সঙ্গে পরামর্শ করে লক্ষ্মীবাঈ-এর অনুমতি-ক্রমে নেবালকর বংশীয় একটি ছেলের খোঁজ করার সিদ্ধান্ত করলেন। উপযুক্ত ছেলের সন্ধান করবার জন্য রামচাঁদ বাবাকে নিযুক্ত করা হল।

ঝাঁসীর রাজবংশের মূলপুরুষ রঘুনাথরাও-এর ছোট ছেলে দামোদররাও-এর বংশই বরাবর ঝাঁসীতে রাজত্ব করেছেন। বড় ছেলে খণ্ডেরাও-এর বংশধররা পারোলাতে ছিলেন। পারোলাতে গঙ্গাধর-রাও-এর জায়গীর ছিল এবং অন্যান্য নেবালকরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল। দশহরা উৎসব উপলক্ষে অনেকে পারোলা থেকে ঝাঁসী এসেছিলেন। গঙ্গাধরের অসুস্থতার জন্য তাঁরা আর ফিরে যাননি। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বাসুদেব। পাঁচ বছরের বালক পুত্র আনন্দকে নিয়ে তিনি এসেছিলেন। সময়ের স্বল্পতা এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে এই আনন্দকে দত্তক গ্রহণ করা স্থির হল। বাসুদেবের ব্যক্তিগত কোন আপত্তি ছিল না। ২০শে নভেম্বরই দত্তক গ্রহণের দিন ধার্য হল।

এদিকে গঙ্গাধরের শেষ অবস্থা। রাজপ্রাসাদের সামনে জনতা ভিড় করে আছে। সর্বত্র উৎসুকভাবে খবরের আদান-প্রদান চলেছে। তারই মধ্যে লক্ষ্মীবাঈ দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পর্কে দেখাশোনা করতে লাগলেন। শোকাকুল বিষণ্ণ মনে তিনি কর্তব্য করে যেতে লাগলেন।

রাজা মৃত্যুশয্যায় দত্তক গ্রহণ করছেন, এই সংবাদ ইংরেজ অফিসার মহলে পৌঁছল। এলিস যাতে এই কাজ অনুমোদন করেন ও সরকার তরফ থেকে যাতে কোন আপত্তি না ওঠে, সেটাই ছিল গঙ্গাধরের সবচেয়ে বেশি চিন্তা। কেননা তৎকালীন বড়লাট

ডালহৌসী একটি পুরনো আইন বহাল করে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করছিলেন। সেই আইনের পুঁথিগত নাম Doctrine of Lapse, এবং সাদা কথায় ভুক্তভোগী এই বুঝতেন, তাঁদের সুপ্রাচীন বংশগুলিকে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের বৃত্তিভোগী করে রাখা। আইনজ্ঞ বলবেন, তার পক্ষে আইনের সমর্থন আছে। কিন্তু ভারতীয় নৃপতিরা মনে করতেন, বিদেশী এসে ভারতে বসেছে সেই প্রথম চালটাই তো মস্ত বে-আইনী।—তার আবার আইন কি!

সরকার তা মানতেন না। ভারতের জমিতে ভারতীয়ের অধিকার, তার কোন যুক্তি ছিল না তাঁদের কাছে। থাকলে তাঁদের চলত না।

আইনের বিধানে কোন সান্ত্বনা ছিল না রাজ্যচ্যুত নৃপতিবর্গ এবং তাঁদের আশ্রিতবর্গের।

সাতারা, নাগপুর ইত্যাদি রাজ্যের নজীরে জানা যায়—গঙ্গাধর রাও-এর মৃত্যুশয্যায়ও শান্তি ছিল না। সর্বদা শঙ্কিত ছিলেন তিনি পাছে এই দত্তক গ্রহণ না-মঞ্জুর হয়ে যায়।

ছয়

সুপ্রভাত। সূর্য উত্তরায়ণে আসীন। সপ্তাশ্ববাহিত স্বর্ণরথে যে দিব্যদ্যুতিমান দিবাকর পৃথিবীকে তাপ কিরণ দান করে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেন, আজ প্রভাতে তিনি তেজ-স্তিমিত। পশ্চিম দিগন্ত মেঘে ঢাকা। ঝাঁসীর পুবদিকে লছমীতাল হ্রদের পূর্ব সীমান্তের নহবৎখানায় ভোরাই সুর বাজছে। মহালক্ষ্মী মন্দিরে পূজা এল রাজপুরী থেকে।

রাজপুরীতে যে উৎসবের প্রস্তুতি চলেছে তাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য রাণী উদ্বিগ্ন। গভীর উদ্বেগের মধ্যেও কর্তব্যের বোধ তাঁকে চালনা করছে। আজকের আকাশ আধখানা মেঘে ঢাকা, অন্য আধখানা রোদে ঝলমল করছে। রাণীর চিত্তেও আশা নিরাশার

গঙ্গা যমুনা। এগারো বছর আগে তিনি কণ্ঠে যে মঙ্গলসূত্র ধারণ করেছিলেন, বুঝি তার সময় শেষ হয়ে এল। পিতা যদিও তাঁকে বার বার সান্ত্বনা দিচ্ছেন তবু কোথাও যেন একটি প্রহর বাজবার সঙ্কেত শুনতে পাচ্ছেন রাণী। কোথাও যেন নিয়ত প্রহর বেজে চলেছে—সময় নেই সময় নেই।

'যখনই স্বামীর ঘরে প্রবেশ করছেন তিনি তখনই স্বামীর দৃষ্টি তাঁর কাছে আশ্বাস চেয়ে অনুসরণ করছে। তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন, গঙ্গাধরকে এতটুকু শান্তি দেবার জন্য অধীর হয়ে উঠছেন বারবার।

আর সময় নেই। প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে এল। এখন নতুন মানুষের প্রয়োজন। আনন্দরাওকে নিয়ে নতুন আয়োজনে ঝাঁসীতে নেবালকর বংশের আসনকে অক্ষয় করতে হবে এখনই।

২০শে নভেম্বর সকালে, গঙ্গাধরের অন্তিমশয্যার সামনে দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান হল। বাসুদেব বালক আনন্দের ওপর সব অধিকার ত্যাগ করে গঙ্গাধরের হাতে পুত্রকে সমর্পণ করলেন। বালক আনন্দ এই অনুষ্ঠানের কিছুই বুঝতে পারলেন না। গতরাত্রি থেকে তাকে নিয়ে সকলে অনেক আলোচনা করছে। মাঝরাতেও আলো জ্বলেছে তার ঘরে; কতজন কথা বলেছেন তার বাবার সঙ্গে। একজন এসেছিলেন যাঁর সর্বাঙ্গে গহনা আর সুন্দর শাড়ি পরনে, বড় বড় চোখ ভরে তিনি তাকে দেখেছেন। জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি আমাকে ভালবাসবে তো? আমি তোমাকে খুব ভালবাস্ব। আজ সকাল থেকে যত ব্যাপার চলেছে, তাতে সে-ই যে প্রধান মানুষ তা আনন্দ বেশ বুঝতে পারছে। নইলে তাকে এ-রকম রেশমী জামা পরিয়ে গলায় মালা দিয়েছে কেন? কপালে কেন দিয়েছে চন্দনের তিলক?

দুরু দুরু বক্ষে রাণী সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত করে শুভকাজ যাতে সুনির্বাহ হয় সেই প্রার্থনা করছিলেন। স্বল্প সময়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে পরে গঙ্গাধর শিথিল কম্পিত হাতে আনন্দরাওকে আশীর্বাদ করলেন। রাণী আনন্দরাওকে কোলে নিয়ে স্বামীর পাশে এলেন। আনন্দে গঙ্গাধরের চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল।

দত্তক গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর আনন্দের নাম হল দামোদর গঙ্গাধর-রাও। এই অনুষ্ঠান দেখতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বুন্দেলখণ্ডের

সহকারী রাজনৈতিক প্রতিনিধি মেজর এলিস এবং ক্যাপ্টেন মার্টিন; লাহোরীমল, তন্ত্রিচান্দ্, মোরোপন্ত ও নরসিংহ ছিলেন সাক্ষী।

গঙ্গাধররাও ১৮৫৩ সালের ১৯শে নভেম্বর একখানি চিঠি লিখেছিলেন মেজর এলিস-এর নামে। কার্যতঃ এলিস সেটি ২০-১১-১৮৫৩ তারিখে পান। গঙ্গাধর লিখেছিলেন—

'বুন্দেলখণ্ডের ব্রিটিশ অধিকার স্থাপিত হবার অনেক আগে থেকেই আমার পুর্বপুরুষরা যেভাবে ব্রিটিশকে সাহায্য করেছেন, তা ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিনিধির কাছে সুবিদিত। আমিও তাঁদের পন্থাই অনুসরণ করেছি।

সম্প্রতি আমি অত্যন্ত অসুস্থ। আমার বিশ্বস্ততার প্রতিদানে একটি বিশাল ক্ষমতাশালী সরকারের অনুগ্রহ পেয়েছি। আমার বংশরক্ষার কোন ব্যবস্থা করাই সম্ভব হল না। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার পুর্বপুরুষের নাম লুপ্ত হয়ে যাবে, এই চিন্তায় আমি কাতর।

সমস্ত বিবেচনা করে, ১৭-১১-১৮১৭ তারিখের শর্তের দ্বিতীয় দফা অনুযায়ী আমি আমার পৌত্র সম্পর্কিত আনন্দরাওকে ২০-১১-১৮৫৩ তারিখে দত্তক গ্রহণ করছি।

ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এখনও আরোগ্য হবার আশা রাখি। হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারি। আমার বয়স বেশি নয়। কাজেই আমার সন্তান হবার সম্ভাবনা আছে। যদি সেরকম কোন পরিণতি ঘটে, তাহলে আমি আমার দত্তক-পুত্রের বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করব।

কিন্তু যদি না বাঁচি, তাহলে আমার পূর্ব বিশ্বস্ততার কথা বিবেচনা করে আমার পুত্রের ওপর যেন কৃপা করা হয়। আমার বিধবা পত্নীকে এই ছেলের মা বলে যেন তাঁর জীবদ্দশায় স্বীকার করা হয়। ছেলের নাবালকত্বের সময় যেন আমার পত্নীকে এই রাজ্যের রাণী এবং মালকিন (শাসনকর্ত্রী) বলে সরকার অনুমোদন করেন। তাঁর প্রতি যাতে কোন অবিচার না ঘটে, সেই দিকে যেন দৃষ্টি রাখা হয়।

(মেজর এলিস কর্তৃক অনুদিত এবং স্বাক্ষরিত)'

সাশ্রুনয়নে, ক্ষীণকণ্ঠে এলিসকে গঙ্গাধর বার বার অনুরোধ করলেন, যাতে এই দত্তক গ্রহণ ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন করেন। এলিস অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে গঙ্গাধরকে আশ্বস্ত করলেন। মধ্যাহ্ন

ভোজনের জন্যে এলিস ও মার্টিন ফিরে এলেন। তিনটের সময় তারা প্রাসাদে গেলেন। তখন গঙ্গাধর ম্যালকমের নামে একখানি চিঠি লিখে মেজর এলিসের হাতে দিলেন।

ম্যালকমকে লেখা চিঠিখানির প্রথম তুটি প্রকরণ, এলিসকে লিখিত চিঠিখানির অনুরূপ। তারপরে লেখা হল—

'শর্তের দ্বিতীয় দফাটি হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঝাঁসীরাজের বিশ্বস্ততা ও অনুরক্তিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য, বুন্দেলখণ্ডে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত হবার সমকালীন ঝাঁসীরাজ রামচন্দ্ররাও (শিবরাও ভাও-এর পৌত্র)-এর বংশধরদের ঝাঁসীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করেছেন। অথবা, শিবরাও ভাও-এর বংশধরদের অধিকারই স্বীকৃত হয়েছে, এ কথাও বলা যায়।

আমার অনুরোধে মেজর এলিস ও ক্যাপ্টেন মার্টিন আমার সঙ্গে দেখা করেছেন। এই চিঠিতে যা যা লিখেছি, তার সবই আমি তাঁদের বুঝিয়ে বলেছি। তাঁদের হাতে আমি একটি চিঠি দিয়েছি। তাতেও আমার পৌত্র (নবীরাণ্-ই-খুর্দ) কে আমার জায়গায় বসাবার জন্য অনুরোধ আছে। আমার বিশ্বাস, সেই চিঠিখানিও আপনাকে দেওয়া হবে।'

এলিস পরে এই তু'খানি চিঠিই ম্যালকমকে পাঠান। ম্যালকম ছিলেন গোয়ালিয়ার, রেওয়া এবং বুন্দেলখণ্ডের তদানীন্তন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। সর্বদাই তাঁকে ঘুরতে হত কাজের খাতিরে। মেজর এলিস ছিলেন তাঁর সহকারী। রাজার চিঠিখানির সঙ্গে এলিস নিজেও ম্যালকমকে একখানি চিঠি লিখে দিলেন—

'ঝাঁসী—২০-১১-১৮৫৩

আপনার ২রা তারিখের চিঠি অনুযায়ী মহারাজা গঙ্গাধর-রাও-এর মূল চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি। এতে আনন্দরাও নামক একটি পাঁচ বছরের শিশুকে দত্তক গ্রহণ বিষয়ে বিবৃতি আছে। তা ছাড়া, এই ছেলেকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করা এবং ছেলেটির নাবালকত্বের সময়ে তাঁর স্ত্রীকে রাজ্যশাসনের ভার দেওয়া, এই তুই কাজে সরকারের অনুমোদন যাতে পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ আছে।

আজই সকালে আমি ক্যাম্প থেকে ফিরেছি। রাজার অনুরোধে মার্টিন ও আমি তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। খুব তুঃখের

সঙ্গে বলতে হচ্ছে, রাজাকে আমরা শেষ অবস্থায় দেখলাম। খরীতাটি তাঁকে পড়ে শোনান হল। তাঁর শরীর যন্ত্রণার আক্ষেপে অস্থির হচ্ছে দেখে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

স্বাক্ষরিত—আর. আর. ডবলিউ. এলিস,

ঝাঁসী—২০-১১-১৮৫৩'

২০শে নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা প্রাসাদের বাইরে জনতা ভিড় করে এসেছে। চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছেন রাজা, তাই মহালক্ষ্মীর পূজা হচ্ছে। পুরোহিতরা বিভিন্ন মন্দিরে যাগযজ্ঞ, মাঙ্গলিক হোম ইত্যাদি করে গঙ্গাধররাও-এর জীবনের জন্য প্রার্থনা করছেন।

আজ সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদের সর্বত্র আলো জ্বলছে না। কথাবার্তা বলছেন না কেউ, সবাই পা টিপে টিপে চলাফেরা করছে। সকালে দত্তকবিধানের অনুষ্ঠানের সময়ে রাণী যে উৎসব বেশ ধারণ করেছিলেন, তা খোলবার সময় হয়নি। সকাল থেকে একভাবে তিনি গঙ্গাধরের পাশে বসে আছেন। ঘরের এক কোণে সুবৃহৎ রূপোর বাতিদানে বাতিটি আড়াল করা। মৃদু আলোতে চিক্‌মিক্ করছে রাণীর গলার গহনা, হাতের হীরার বালা, কপালের কুঙ্কুম তিলক। চোখে জল নেই। মুখ ব্যঞ্জনাবিহীন। বৈদ্য বলেছিলেন জানলা বন্ধ রাখতে, রাণী জানলা খুলে দিয়েছেন। ঘরে তাঁর পিতা, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অমাত্যরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন।

একজন সওয়ার এসে খবর দিল, মেজর এলিস ঝাঁসীর ব্রিটিশ সামরিক ছাউনির মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ এ্যালেনকে নিয়ে আসছেন। রাজা তখন সংজ্ঞাহীন। রাণীর মুখের দিকে চেয়ে মোরোপন্ত সওয়ারকে আঙুল তুলে ইশারায় 'না' বললেন। সওয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে তাঁদের খবর দিল, রাজার মুমূর্ষু অবস্থা। এখন চিকিৎসক নিয়ে যাওয়া অর্থহীন। এলিস ও এ্যালেন ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছাউনিতে ফিরে চললেন।

ইতিমধ্যে গঙ্গাধরকে একতলায় গৃহদেবতা মহালক্ষ্মীর মন্দিরের সংলগ্ন ঘরে নামান হল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। এই দারুণ রোগযন্ত্রণা গঙ্গাধরকে যত না পীড়িত করেছিল তার চেয়েও কাতর করেছিল তাঁকে দত্তক গ্রহণ বিষয়ে দুশ্চিন্তা। ব্রিটিশ সরকার

যদি দত্তক গ্রহণ অনুমোদন না করেন? চৈতন্য লোপ না হওয়া পর্যন্ত সেই চিন্তাই তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, চৈতন্য ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই চিন্তার অঙ্কুশ তাড়নার মধ্যেই তিনি ফিরে আসছিলেন।

চেতনা ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা এলিসের খোঁজ করলেন। তুফান গতিতে সওয়ার গিয়ে এলিস ও এ্যালেনকে ডেকে আনল। এলিসের সঙ্গে রাজা ক্ষীণ অথচ স্বাভাবিককণ্ঠে কথা বললেন। ডাক্তারকে তাঁর অসুখের বিশদ বিবরণী দিলেন। এ্যালেন দেখলেন, রাজার রোগটি ক্রমিক রক্তামাশয়। তাঁর ওষুধ খেতে অনুরোধ করলেন। রাজা বললেন, গঙ্গাজল মিশিয়ে তিনি ওষুধ খেতে পারেন, অন্যথায় ইংরাজের দেওয়া ওষুধ তিনি খাবেন কি করে? এলিস আসবার সময়ে রাণী পর্দার আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। স্বামীর কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে তিনি একটু আশ্বস্ত হলেন। ডাক্তার ও এলিস চলে গেলেন। ডাক্তারের সহকারী জনৈক দেশীয় ডাক্তার ওষুধ নিয়ে এলেন। ততক্ষণে গঙ্গাধরের মত পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি ওষুধ খেতে রাজী হলেন না। রাত যত বাড়তে লাগল অবস্থা তত খারাপের দিকে যেতে লাগল। এই ক'দিন রাণী শোকবিহ্বলা হয়ে কখনও কেঁদেছেন, কখনও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, কখনও শোকে উন্মাদের মতো হয়ে বলেছেন— মহালক্ষ্মী যদি আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দেন, তবে আমি আমার প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। কখনও বালিকার মতো আকুল ক্রন্দনে পিতাকে বলেছেন, আমার ভাগ্যে ছিল আমি 'চিরসৌভাগ্যবতী' হব, পতিকুলের মঙ্গল করব, কেন তার একটি কথাও সফল হল না?

তারপরে যেমন রাত বাড়তে লাগল, ধীরে ধীরে ক্লান্ত আত্মীয়-পরিজনেরা বিশ্রাম করতে গেলেন, কলকোলাহল শান্ত হয়ে এল, ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এল গঙ্গাধরের জীবন স্পন্দন। মন্দিরে পুরোহিত তখনও স্বস্ত্যয়ন করছেন। যাজ্ঞিকের কণ্ঠে গীতার শ্লোকগুলি রাত্রির নীরবতায় স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। প্রস্তর প্রতিমার মতো রাণী বসে রইলেন গঙ্গাধরের শয্যাপার্শ্বে। মন্ত্রচালিতের মতো আঙুলে গুণতে লাগলেন মঙ্গলসূত্রের সোনা আর পুঁতির দানাগুলি। শুনতে লাগলেন—

'বাসাংসি জীর্ণানি যথাবিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরানি—'

জীর্ণবাসের মতো দেহ ত্যাগ করে গঙ্গাধররাও কি অন্য দেহের সন্ধানে অনিরীক্ষ্য লোকে ভ্রমণ করে ফিরবেন? 'জাতস্য চ ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদ পরিহার্যে হর্যে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥' যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে, তাই বলে কি এই অপরিহার্য বিষয়ে তিনি শোক করবেন না? গীতার মাধ্যমে কে তাঁকে বলছেন—মামেকং শরণং ব্রজ? কেমন করে তিনি শোক বিস্মৃত হবেন? সমস্ত শুভাশুভ সর্ব কর্ম কাকে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত হবেন তিনি?

কোথাও সান্ত্বনা নেই। রাণীর স্পষ্ট মনে হল যেন আজকের নিদ্রিত রাজপুরীর খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছে মৃত্যু। তাঁর নয়নের অন্তরালে কোথাও অপেক্ষা করছে সে। মুহূর্তমাত্র অসতর্ক থাকা চলবে না। নির্নিমেষ নয়নে কালরাত্রির দিকে চেয়ে রইলেন রাণী।

বিয়ের পরে এই এগারো বছরের সমস্ত ঘটনা মনের পটে ছবির মতো ভাসতে লাগল তাঁর। সেই কবে বালিকা বয়সে বধূ হয়ে এসেছিলেন রাজ-গৃহে। তখন স্বামী কি তা জানতেন না। অজ্ঞানে কত অপরাধ হয়েছে। তারপর মুকুল থেকে ফুলের মতো যেমন জেগে উঠলেন, তখন স্নেহে, প্রেমে, সেবায়, মমতায় কত সুখের দিন, কত মধুর স্মৃতি। কত কথা, কত সাধ, কত কামনা,—সমস্ত ত্যাগ করে কোন অমরার সন্ধানে চলে যাচ্ছেন গঙ্গাধররাও? নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যে, যেখানে পৃথিবী একটি ধূলিকণার মতো তুচ্ছ, সেখানেই কি দেহমুক্ত আত্মা পথের সন্ধানে ফেরে? এই সমস্ত জিজ্ঞাসা, এই সমস্ত প্রশ্ন যেন একটি অতল কালো অন্ধকারের সমুদ্রে ডুবতে আর ভাসতে লাগল। প্রদীপে কতটুকু আলো হয়, কতটুকু দেখা যায় সেখানে? পরিপূর্ণ বিবাহ সজ্জায় রাজার মৃত্যু শয্যার পাশে রাণী বাসর জাগিয়ে রইলেন।

২১শে নভেম্বর সকাল থেকে স্বর্ণ, ভূমি ও গো-দান চলতে লাগল। গীতা ও চণ্ডীপাঠ করতে লাগলেন শাস্ত্রীরা।

বেলা একটার সময় গঙ্গাধররাও-এর মৃত্যু হল। তখন তাঁর

বয়স চল্লিশ। সেইদিন লক্ষ্মীবাঈ-এর বয়স আঠারো পূর্ণ হল।

নগরের সর্বত্র দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ছাউনিতে খবর গেল—রাজা আর নেই।

রাজপ্রাসাদে উপযুক্ত সমারোহে গঙ্গাধরের শেষকৃত্যের আয়োজন চলতে লাগল। শোকাকুল জনসাধারণ শবানুগমন করল। বালক দামোদর মুখাগ্নি করলেন। লছমীতাল হ্রদের পাশে মহালক্ষ্মী মন্দিরের বিপরীত দিকে গঙ্গাধরের সংকার হল।

আজও সেখানে একটি প্রাচীরবেষ্টিত বাগিচা বিদ্যমান। জীর্ণদেহ প্রাচীরের গায়ে ফাটল ধরেছে। কোন উৎসুক দর্শক যদি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছটির পাতায় পাতায় বাতাস মর্মরিত নির্জন মধ্যাহ্নে সেখানে দাঁড়ায়, দরজার ওপরের লেখাটি তার নজরে পড়বে—

'The Chhatri of Maharaja Gangadhar Rao of Jhansi. Born 1813, died 1853.'

'ঝাঁসীর মহারাজা গঙ্গাধররাও-এর ছত্রী। জন্ম ১৮১৩, মৃত্যু ১৮৫৩।'

লছমীতালের জল আজও সেই প্রাচীরগাত্রের পূর্বদিকে নিয়ত ঢেউয়ে ঢেউয়ে আঘাত করে। সেই পল্লবকল্লোলমর্মরিত শান্ত পরিবেশে শায়িত গঙ্গাধররাও কোনদিন জানবেন না, তাঁর নাম ধরে রেখেছেন তাঁর দত্তক পুত্রের বংশ। কিন্তু তাঁরা কেউ রাজপুত্র নন। স্থানীয় মানুষ শুধু খাতির করে তাঁদের বলে 'ঝাঁসীওয়ালে'।

সাত

মহারাজা গঙ্গাধররাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর শবানুগমন করেছিলেন মেজর এলিস। রাজার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বীয় কর্তব্য বিষয়ে সচেতন হলেন। খবর পাঠালেন ম্যালকমকে। লিখলেন—

> 'ঝাঁসী ২১-১১-১৮৫৩ (দুপুর)। অনুশোচনার সঙ্গে মাননীয় গভর্নর জেনারেলের বিজ্ঞপ্তির জন্য জানাচ্ছি, মহারাজা গঙ্গাধররাও আজ বেলা একটার সময় মারা গিয়েছেন।

আমি আপনার ২রা তারিখের চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী চলব। গভর্নর জেনারেলের কাছ থেকে নতুন আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত রাজ্যের ভার গ্রহণ করব। ইতিমধ্যে যখন যা ঘটে আপনাকে জানাব।'

রাজার মৃত্যুর খবর পেয়ে ম্যালকম পুণা ক্যাম্প থেকে (এই পুণা মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত নগরী পুণা নয়), গভর্নরের সেক্রেটারী গ্র্যাণ্টকে লিখলেন—

'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি মহারাজা গঙ্গাধররাও ২১-১১-১৮৫৩ তারিখে ঝাঁসীতে মারা গিয়েছেন।

১। তাঁর মৃত্যুর আগের দিন মহারাজা, আনন্দরাও নামে একটি পাঁচ বছরের ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করেন। তাঁর মতে ছেলেটি নবীরাণ-ই-খুর্দ, অথবা তাঁর পৌত্র। আমাদের মতে, ছেলেটি তাঁর মূলপুরুষ রঘুনাথহরির পঞ্চম পুরুষ এবং গত মহারাজার জ্ঞাতি ভাই।

২। মেজর এলিসের চিঠিপত্র আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমাকে ও এলিসকে লিখিত মহারাজার চিঠিগুলির মূল ও অনুবাদ দুই-ই আপনাকে পাঠাচ্ছি। এই চিঠি দুটিতে তাঁর দত্তক গ্রহণের কারণ উল্লিখিত আছে।

৩। মহারাজের এই দত্তক গ্রহণের আকস্মিকতা নিশ্চয় তাঁর সভার সকলকেও বিস্মিত করেছে। মনে হয়েছিল, তিনি বড়জোর আমাদের অনুরোধ করবেন, যাতে তাঁর বিধবা স্ত্রী যাবজ্জীবন রাজত্ব করতে পারেন। শিবরাও ভাও-এর বংশের আর কেউ বেঁচে নেই। এ তথ্য সর্বজনবিদিত বলে দত্তক গ্রহণের সম্ভাবনা আমরা কল্পনা করিনি।

৪। আমি একটি বংশ তালিকা পাঠাচ্ছি, তাতে দেখা যাবে, আনন্দরাও, শিবরাও ভাও-এর বংশের কেউ নয়।

৫। আমার ২রা তারিখের চিঠির অনুলিপি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম। সেই চিঠি অনুযায়ী মেজর এলিস, এই দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নেতিবাচক নীতি অবলম্বন করবেন। ঝাঁসী রাজ্য বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কি ব্যবস্থা হবে, সেজন্য গভর্নর জেনারেলের চরম আদেশের অপেক্ষা করবেন।

৬। ঝাঁসীর রাজবংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিষয়ে একটি বিশদ ব্যাখ্যা আপনাকে দিচ্ছি। এতে আমাদের পরবর্তী কার্যতালিকার সুবিধা হবে এবং মহারাজের দত্তক বিধান দ্বারা

উত্তরাধিকার রক্ষা করবার অধিকার (আমার মতে যা অত্যন্ত সংশয়জনক) আছে কিনা, সে কথাও মাননীয় গভর্নর জেনারেল বুঝতে পারবেন।

৭। বুন্দেলখণ্ডের সঙ্গে আমাদের প্রথম যোগাযোগ স্থাপনা হওয়ার সময়ে, ১৮০৪ সালে, পেশোয়ার কর্মচারী হিসাবে শিবরাও ভাও-এর সঙ্গে আমাদের একটি শর্ত হয়। ১৮১৭ সালে পেশোয়া যখন বুন্দেলখণ্ডের ওপর সমস্ত অধিকার ব্রিটিশ সরকারকে দিলেন, আমরা শিবরাও ভাও-এর পৌত্র রামচন্দ্ররাওকে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি ও উত্তরাধিকারীদের ঝাঁসীরাজ্যের বংশানুক্রমিক শাসক হিসাবে স্বীকার করে ১৮১৭ সালে একটি শর্ত করি। ১৮৩২ সালে ঝাঁসীর শাসককে রাজা উপাধি দেওয়া হয়। ঝাঁসীর শাসকরা প্রথমে পেশোয়া ও পরে আমাদের অধীনে সুবেদার ছিলেন।

৮। ১৮৩৫ সালে রামচন্দ্ররাও-এর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে ঝাঁসীর সিংহাসন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শিবরাও ভাও-এর দুই পুত্র রঘুনাথ ও গঙ্গাধর তখনও জীবিত। গঙ্গাধরের মৃত্যুর সঙ্গে শিবরাও ভাও-এর বংশলুপ্তি ঘটল।

৯। এখানে আমার জানান উচিত যে ১৮৩৫ সালে রামচন্দ্ররাও-এর মৃত্যু হলে দুইজন দাবীদার এসেছিলেন। একজন মৃত রাজার দত্তক পুত্রকে অনুমোদিত করবার জন্য, অপর একজন ছিলেন রাজার বিধবা স্ত্রী (যিনি সদাশিবরাওকে সিংহাসন দেবার স্বপক্ষে ছিলেন—Sleeman—Rambles and Recollections)। দুটি দাবীই নাকচ করা হয়। তৎকালীন কাগজপত্র আমার কাছে নেই। আপনার কাছে তার অনুলিপি থাকলে দেখবেন, যে শর্তে ঝাঁসীতে শিবরাও ভাও-এর বংশধরদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল, সে শর্তে ব্রিটিশ সরকারের অমতে দত্তক নেওয়া চলবে, এমন কোন কথা নেই।

১০। মহারাজা তাঁর বিধবা স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ-এর ওপর রাজ্যশাসনের ভার দিতে চেয়েছেন। রাণী ঝাঁসীতে এবং তাঁর পরিচিত সকলের কাছেই পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। রাজ্য-শাসনের গুরুভার বহনে (আমার মতে) তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তবে দেখেশুনে মনে হয় না মাননীয় সরকার রাজ্যটি গ্রহণ করাতে বিরত থাকবেন। আমি প্রার্থনা করছি রাণীকে নিম্নলিখিত মর্মে আশ্বাস দিতে অনুমতি দেওয়া হোক ;—রাজার সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি (খাসগী), তিনি রাখতে পারবেন ; ঝাঁসীর

রাজপ্রাসাদ তাঁকে দেওয়া হবে; তাঁর এবং রাজার প্রতিপালিত আশ্রিত পরিজনদের আজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাবার মতো পর্যাপ্ত মাসোহারা দেওয়া হবে।

১১। রাণীকে কি পরিমাণ বৃত্তি দিলে তাঁর পক্ষে পর্যাপ্ত হবে জানি না। তবে এগুলি মনে রাখা সমীচীন ;—ঝাঁসীর রাজারা, বুন্দেলখণ্ডের শেষ মরাঠা বংশগুলির অন্যতম। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও এবং সাগরের বিনায়ক চন্দোবরকার মৃত। সাহায্য লাভে বঞ্চিত তাঁদের বহু আত্মীয় পরিজন, রাণীর কাছে সাহায্যপ্রার্থী। সাতারা, নাগপুর, সাগর, বিঠুর এই রাজ্যগুলির আশ্রিত বিশাল অনুচরবৃন্দের অধিকাংশই বেকার। রাণীর পোষ্যবৃন্দের কথা বিবেচনা করে, মাসিক পাঁচ হাজার টাকার কম বৃত্তি দেওয়া সমীচীন হবে না।

১২। রাজার অনুচর ও পোষ্যবৃন্দের কাকে কি দেওয়া হবে তা আমার পক্ষে ঠিক করা এখনই সম্ভব নয়। তবে তাদের একটি তালিকা তৈরি করে পাঠালে তাদের সম্বন্ধেও ভবিষ্যতে ব্যবস্থা করা যাবে।

১৩। ঝাঁসী দীর্ঘদিন আমাদের শাসনাধীন ছিল। মেজর রসের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ঝাঁসীর অধিবাসীরা পরিচিত। শাসন ব্যবস্থা আমাদের হাতে এলেও খুব একটা রদবদলের প্রয়োজন হবে না। ঝাঁসীর প্রতিবেশী যে পরগণা (সিন্ধিয়ার) গুলি আমরা দেখছি, তাদের পদ্ধতিই ঝাঁসীতে অনুসৃত হবে।

১৪। যদি গভর্নর জেনারেলের আদেশ আসে, তাহলে আমাকে ঝাঁসীর শাসনভার নিতে হবে। কিন্তু মেজর এলিস বা আমার রাজস্ব আদায় সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমাদের রাজনৈতিক কাজের জন্য গোয়ালিয়ার, বুন্দেলখণ্ড ও রেওয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়। কাজেই ঝাঁসী যদি বুন্দেলখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে জব্বলপুরের কমিশনার মেজর আরস্কাইনের অধীনে থাকে তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। স্বাক্ষরিত—ডি. এ. ম্যালকম,

ক্যাম্প পুণা (PUNA), ২৫-১১-১৮৫৩।'

বাইশে নভেম্বর মেজর এলিস ও ক্যাপ্টেন মার্টিন রাজপ্রাসাদে গেলেন। শোকবিহ্বলা রাণীকে তাঁদের শোকবার্তা জানালেন। তারপর কেল্লায় গেলেন। কেল্লাতে সরকারী তহবিল এবং বন্দীরা ছিল। কিল্লাদারকে এবং জ্বালানাথ পণ্ডিতকে ডেকে তাঁদের সাক্ষী রেখে এলিস খাজাঞ্চিখানার তালার উপর সীলমোহর করলেন। সেখানে সোনা ও রূপার মুদ্রায় ২,৪৫,৭৩৮৲ টাকা ছিল। সিন্ধিয়ার

ষষ্ঠ কন্টিনজেন্টের একজনকে কেল্লার ভেতর পাহারা দিতে বললেন। কেল্লাতে ঝাঁসী রাজ্যের পাঁচজন নায়েক, তুইজন বাজনাদার, একশ' সিপাহী, একজন সুবাদার, একজন জমাদার এবং পাঁচজন হাবিলদার ছিল।

রাজার মৃত্যুর চারদিন আগে মেজর এলিস, লাহোরীমল্ল, নরসিংহরাও আপ্পা এবং ফতেচাঁদের সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছিলেন, রাজার রোগ ও সম্ভাব্য মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে যদি কোন তুর্বৃত্ত রাজবন্দীদের ছেড়ে দিয়ে অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করে তাতে ভাল হবে না।

ইতিমধ্যেই ক্যাপ্টেন মার্টিন ঝাঁসী শহর এবং তুর্গের আয়তন আন্দাজে সৈন্যসংখ্যা অপর্যাপ্ত ভাবতে শুরু করেছেন। তিনি এলিসকে জানালেন যে—

> 'রাজকোষ পাহারা দেওয়া, আড়াইশ' বন্দীর ওপর নজর রাখা, বিশাল তুর্গ এবং তার অন্তর্বর্তী প্রাসাদগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, এইজন্য ঝাঁসীরাজ ও সিন্ধিয়ার কন্টিনজেন্ট বাহিনীর যে সৈন্য মোতায়েন আছে, আমার মতে তারা সংখ্যায় অপর্যাপ্ত।
>
> শহরের নিরাপত্তার ও জনসাধারণের অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করে ঝাঁসীতে আরও সৈন্য রাখা উচিত।'

এলিস মার্টিনের চেয়ে দূরদর্শী ছিলেন। এখনি প্রচুর সৈন্য আমদানী করা সম্ভব নয়। তাতে জনসাধারণের মনে সন্দেহ হতে পারে। তাই তিনি উত্তর দিলেন—

> 'আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, ঝাঁসীতুর্গে সৈন্য মোতায়েন করবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে ঝাঁসীবাসীর মনে এই বিশ্বাস অটুট রাখা যে, বিক্ষোভ সৃষ্টি করবার যে কোন চক্রান্তই সমূলে বিনাশ করা হবে।'

এলিস তাঁর ও মার্টিনের চিঠি কয়খানি ম্যালকমকে পাঠালেন। ম্যালকম তখন ক্যাম্প সহাওয়াল-এ। তিনি কলকাতায় লিখলেন—

> 'মাননীয় গভর্নর জেনারেলের জ্ঞাতার্থে, মেজর এলিসের লেখা যে চিঠিগুলো পাঠাচ্ছি, তাতে গঙ্গাধররাও-এর মৃত্যুর পর তিনি রাজ্য শাসন বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেছেন, তার বিবৃতি এবং

আমরা ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করলে, সম্ভাব্য সৈন্য সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁর মতামত আছে।

১। আগে যখন ঝাঁসী আমাদের শাসনাধীন ছিল, তখন কিছু কিছু সামন্ত আমাদের বিরক্ত করেছে। কিন্তু এখন তাদের ক্ষমতা কমে গিয়েছে। কাজে কাজেই আগেকার মতো বেশি সংখ্যায় সৈন্য প্রয়োজন হবে না বলেই মনে হয়।

২। তবু আমার মনে হয়, সরকারের ইচ্ছা, ঝাঁসীতে বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রির একটি wing রাখা। ঝাঁসী ও করেরার দুর্গে ফৌজ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অথচ ঝাঁসীস্থ ব্রিটিশ সেনার সংখ্যা সে আন্দাজে অপর্যাপ্ত। কোম্পানির সেনাবাহিনী এখন যদি না-ই পাওয়া যায়, মুলতান থেকে নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি ঝাঁসীতে এসে না পৌছন পর্যন্ত, অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য সিন্ধিয়ার ষষ্ঠ কন্টিন্‌জেণ্টের যে wingটি ঝাঁসীতে রয়েছে, সেটিকে ব্যবহার করবার অধিকার আমাকে দেওয়া উচিত।

৩। নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি বুন্দেলখণ্ডে কয়েক সপ্তাহ না গেলে পৌছতে পারবে না। অস্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে, মোরার (গোয়ালিয়ারের সামরিক ছাউনি) থেকে ব্রিগেডিয়ার পারসন্‌কে চারটি কম্পানী পাঠাতে অনুরোধ করা যায়। দুটি ঝাঁসী ও দুটি করেরার দুর্গে রাখা যাবে।

৪। ঝাঁসীর সম্পর্কে গভর্নর জেনারেলের যে কোন সিদ্ধান্তই হোক না কেন, আমার মনে হয় না, বিগত গঙ্গাধররাও-এর তরফ থেকে আমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করা হবে। তবু, অন্যান্য জমিদারের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা ভেবে, ঝাঁসীতে বর্তমানে নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রির একটি ও ইররেগুলার ক্যাভল্‌রির একটি করে দুইটি রেজিমেণ্ট রাখা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে।

স্বাক্ষরিত—ডি. এ. ম্যালকম

ক্যাম্প : সহাওয়াল, ১-১২-১৮৫৩'

এলিসের ও মার্টিনের পরস্পরকে লেখা চিঠি ছাড়াও নিম্নলিখিত চিঠিগুলি ম্যালকম পাঠালেন—

'১। ম্যালকমকে—এলিস। ঝাঁসী—২২-১১-১৮৫৩। গতকাল চিঠি লেখবার পর আমি ও মার্টিন প্রাসাদে গিয়ে রাণীকে আমাদের শোক জানালাম, পরে কেল্লায় গেলাম। কেল্লায় সব বন্দীরা ও সরকারী তহবিল আছে। কিল্লাদার আর জ্বালানাথ পণ্ডিতের

সামনে খাজাঞ্চিখানার দরজায় সীলমোহর করেছি। সেখানে সোনা আর রূপোতে ২,৪৫,৭৩৮৲ টাকা পনেরো আনা আছে। সিন্ধিয়ার ষষ্ঠ কন্টিনজেন্টের একজনকে কেল্লার ভেতরে পাহারা দিতে বলেছি। সে সর্বদাই ঝাঁসীরাজের প্রাসাদ রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে।

রাজার মৃত্যুর চারদিন আগেই আমি লাহোরীমল্ল, নরসিংহরাও আপ্পা আর ফতেচাঁদের সঙ্গে বারবার দেখা করেছি আর বলেছি রাজার অসুস্থতাজনিত অব্যবস্থিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি রাজবন্দীদের ছেড়ে দেয় তার ফল ভাল হবে না। আমি দেখে আনন্দিত হলাম যে, আমার সতর্কতায় সুফল হয়েছে।

২। ম্যালকমকে—এলিস। ২৩-১১-১৮৫৩। যে নিয়মে রাজ্য চলে আসছিল, গভর্নর জেনারেলের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেই নিয়মই বহাল রইল।

৩। ম্যালকমকে—এলিস।

'আমি আপনাকে আমার ও মার্টিনের পরস্পরকে লেখা দু'খানি চিঠিই পাঠালাম। ঝাঁসী দুর্গে আমাদের সৈন্যদের অস্থায়ী অবস্থানের বিষয়ে বক্তব্য এই যে, সিন্ধিয়ার ষষ্ঠ কন্টিনজেন্টের একটি পুরো ব্রিগেড সেখানে দরকার। ১৮৩৮-১৮৪৩ সালে আমাদের শাসনের সময়ে কড়েরা, মৌরাণীপুর, মায়াপুর প্রভৃতি যে সব জায়গায় সৈন্য ছিল, সে সব জায়গায় আবার সৈন্য মোতায়েন করা প্রয়োজন।'

এই সমস্ত চিঠি যখন কলকাতায় পৌঁছল ডালহৌসী তখন অযোধ্যাতে। ম্যালকমের চিঠি পেয়ে ডালহৌসীর অনুপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট অফ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে অপর তিনজন সদস্য তাঁদের মতামত জানালেন। তাঁরা হচ্ছেন, ডোরিন, লো এবং হ্যালিডে।

১। '—আমার মনে হয় না এই দত্তক গ্রহণ অনুমোদন করা উচিত। তবে, এই বিষয়টি গভর্নর জেনারেলের প্রত্যাবর্তনের জন্য মুলতুবী থাকল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধি যেন কিছু কবুল না করেন। স্বাক্ষরিত—জে. ডোরিন, ৯-১২-১৮৫৩'

২। 'এই বিষয়টি গভর্নর জেনারেল ফিরে না আসা পর্যন্ত অমীমাংসিত থাকুক। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক প্রতিনিধি যেন তাঁর কর্তৃত্বাধীনে ঝাঁসীর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন। এতাবৎ আচরিত

শাসনব্যবস্থায় যেন বাধা না পড়ে। কেরাউলির মতো ঝাঁসীতেও বর্তমানে মধ্য পন্থা চলতে থাকুক।

স্বাক্ষরিত—এফ. জে. লো. ১০-১২-৫৩'

৩। 'আমার মনে হয় না, গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে পরামর্শ না করে ঝাঁসীর বিষয়ে কোন মীমাংসা করা যায়। রাজনৈতিক প্রতিনিধি প্রয়োজন বোধে ব্রিগেডিয়ার পারসন্সের কাছ থেকে সাহায্য নেবেন।

স্বাক্ষরিত :—জে. ডোরিন, এফ. জে. হ্যালিডে, ১২-১২-১৮৫৩'

এই তিনখানি চিঠি ম্যালকমকে একই সাথে পাঠান হল। ১৬-১২-১৮৫৩ তারিখে গভর্নর জেনারেলের বদলী সেক্রেটারী ড্যালরিম্পল ম্যালকমকে জানালেন,—

'ঝাঁসীর বিষয় সিদ্ধান্ত পরে জানান হবে। ইতিমধ্যে শান্তি রক্ষা করুন। দেশীয় শাসন ব্যবস্থায় বাধা দেবেন না। প্রয়োজন হলে ব্রিঃ পারসন্সের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নেবেন।'

সমস্ত ভারতবর্ষে তখন অসংখ্য ভারতীয় রাজ্য। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মারফৎ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান পরিসরের পথে তারা প্রতিবন্ধক।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হয়ে যতজন গভর্নর ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে লর্ড কার্জন ব্যতীত ডালহৌসীর মতো এত উদ্যোগী এবং কর্মকুশলী আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

১৮৪৮ সালে ভারতে এলেন ডালহৌসী। ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব এল ব্রিটিশ অধিকারে। উত্তরব্রহ্মকে স্বাধীন রেখে পেগু অধিকার করলেন ডালহৌসী।

স্বত্বলোপের ভিত্তিতে রাজ্যাধিকারের যে নীতির সঙ্গে ডালহৌসীর নাম জড়ান, তিনি তার প্রচলন করেননি। কাগজে কলমে সেই নীতি বহুদিন থেকেই বহাল ছিল। সময়ে তা কাজেও লাগান হয়েছে। ডালহৌসী তাকে কার্যকরী করে একটির পর একটি ভারতীয় রাজ্য অধিকার করলেন। নাগপুর সাতারা এবং কেরাউলী ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল।

বিঠুরে নির্বাসিত শেষ পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর

বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলেন তাঁর দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ নানা। কর্ণাটকের নবাব এবং তাঞ্জোরের রাজার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হল।

এইসব নজীর দেখে রাণী মনে মনে শঙ্কিত হলেন। বিবেচনা করে দেখলেন ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয় এবং সাহায্য ব্যতীত তাঁর অবস্থা একান্তই অসহায়। তিনি রাজপরিবারের কন্যা নন। প্রতিপত্তিশালী পিতৃকুলের কাছ থেকে সাহায্য পাবার ভরসা তাঁর নেই। শ্বশুরকুলে জীবিত জ্ঞাতি মাত্রেই রাজসিংহাসনের ভাগীদার এবং তাঁর শত্রু। তাঁর শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে যুক্তপরামর্শ করে তিনি স্থির করলেন, বড়লাটকে একখানি খরীতা পাঠান প্রয়োজন। তখনকার দিনে সরকারী চিঠিপত্র, সুদৃশ্য এবং কারুকার্যখচিত রেশমের আবরণে পাঠান হত। তারই নাম খরীতা। ফার্সী ভাষায় এই খরীতা লিখিয়ে রাণী পাঠালেন। লিখলেন—

মহারাণী লক্ষ্মীবাঈসাহেবা-ঝাঁসী কর্তৃক মাননীয় বড়লাট সাহেবের প্রতি উদ্দিষ্ট।

ঝাঁসী—৩১-১২-১৮৫৩

'যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন।

আমার স্বামী ১৯-১১-১৮৫৩ তারিখ সন্ধ্যাবেলা দেওয়ান, নরসিংহরাও আপ্পা, লালা লাহোরীমল্ল, লালা ভটিচান্দ এবং আমাকে ডাকলেন। নিজের অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতির দিকে চলেছে বলে শাস্ত্র দেখে তাঁর স্বীয় 'গোত' (বংশ, গোত্র) থেকে একটি সুলক্ষণ শিশুকে তাঁর অবর্তমানে ঝাঁসীর সিংহাসনে বসাবার জন্য নির্বাচিত করতে বললেন।

রামচাঁদ বাবার উপদেশে বাসুদেবের পুত্র আনন্দরাওকে দত্তক ধার্য করা হল।

আমার স্বামীর আদেশে ২০-১১-১৮৫৩ তারিখে পণ্ডিত বিনায়করাও শাস্ত্রানুযায়ী সঙ্কল্প করলেন। যথাবিধি অনুষ্ঠানের পর বাসুদেব আমার স্বামীর হাতে জল ঢেলে দিলেন।

২১-১১-১৮৫৩ তারিখে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। আনন্দরাও শেষকৃত্য সমাপন করেছে। আমার বিপন্ন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে আপনি আমার স্বামীর অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করুন, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ।'

রাণী এই চিঠিতে সীলমোহর দিলেন।

এলিস সাহেব ফার্সি ভাষায় লেখা এই চিঠিটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়ে ম্যালকমকে পাঠালেন। ম্যালকম তখন ভীলসিয়া ক্যাম্পে। তিনি সেই চিঠি ডালহৌসীর সেক্রেটারী জে. পি. গ্র্যান্টকে পাঠালেন। লিখলেন

'আমি মাননীয় গভর্নর জেনারেলের কাছে রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর একটি খরীতা এবং ঝাঁসীর রাজবংশের বংশলিপি পাঠাচ্ছি।

ভি. এ. ম্যালকম, ক্যাম্প : ভীলসিয়া, ১৫-১২-১৮৫৩।'

ইতিমধ্যে পুনর্বার দাবী জানিয়ে এলিসের কাছে উপস্থিত হলেন সদাশিবরাও এবং কৃষ্ণরাও। শিবরাও ভাও-এর কাকা সদাশিব পন্থের প্রপৌত্র এবং গঙ্গাধররাও-এর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র হচ্ছেন সদাশিবরাও। গঙ্গাধররাও-এর মৃত্যুর পর তিনিই সিংহাসনের ন্যায্যতম দাবীদার বলা চলে। কৃষ্ণরাও হচ্ছেন রামচন্দ্ররাও-এর ভগ্নীর জ্যেষ্ঠপুত্র। একদা মাতামহী সখুবাঈ, স্বীয় প্রয়োজনে তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন রামচন্দ্ররাও-এর কাছে। রামচন্দ্ররাও তখন মৃত্যুশয্যায়। দত্তক গ্রহণের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না তা-ও অজ্ঞাত। রামচন্দ্ররাও-এর বিধবা স্ত্রী পরে কর্নেল শ্লীম্যানকে বলেছিলেন—যদি রাজ্যে অধিকারের প্রশ্ন তোলেন তবে আমি সর্বতোভাবে সমর্থন করব সদাশিবরাওকে। এই কথা থেকে বোঝা যাবে, তিনি রামচন্দ্ররাও-এর পিতৃব্যদ্বয় রঘুনাথ এবং গঙ্গাধরের কথা যেমন তোলেননি, তেমনি অস্বীকার করেছিলেন দত্তক গ্রহণের ব্যাপারটি। কৃষ্ণচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণের পেছনে ছিল সখুবাঈ-এর প্রত্যক্ষ ভূমিকা। শাশুড়ী যে স্বামীর মৃত্যুর কারণ তাতে এতটুকু সংশয় ছিল না রামচন্দ্ররাও-এর স্ত্রীর। দত্তক গ্রহণে তাঁর সম্মতি ছিল না। কৃষ্ণরাও-এর নিজস্ব ঘরাণা

খুব বড়। সাগরের সুবেদার তাঁর পিতা। মাতামহীর প্ররোচনায় তাঁকে মৃত মাতুলের দত্তক পুত্র হিসাবে ধরাতে কৃষ্ণরাও চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রাপ্য বৃত্তি ১২,৭৫০৲ টাকা থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। সুবেদারের খেতাব ও পদ পেলেন তাঁর ছোটভাই বেঙ্কটারাও। দত্তক গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয়নি, তবু কৃষ্ণরাওকে দিয়ে রামচন্দ্রের শেষকৃত্য করাবার চেষ্টা করেছিলেন সখুবাঈ। নিজের পিতা বিনায়ক চন্দোবারকর জীবিত থাকতেই পিতার কৃত্য ও চৌথা করতে চেয়েছেন বলে কৃষ্ণরাওকে সকলে নিন্দা করত। এই বিড়ম্বিত-ভাগ্য যুবক পুনর্বার ঝাঁসীর সিংহাসনে নিজের দাবী জানালেন।

এলিস তাঁদের দাবীপত্র পেয়ে ম্যালকমকে জানালেন—

'ঝাঁসী ১৪-১২-১৮৫৩

কিষেণরাও এবং সদাশিবরাও, এই দুইজন দাবীদারের চিঠি পাওয়া গিয়েছে। সদাশিবরাও-এর দাবী সম্পূর্ণ নাকচ করা যায়। এর আগে দুইবারই তাই করা হয়েছে। স্বাক্ষরিত—এলিস।'

ম্যালকম চিঠিখানি পড়ে গ্র্যাণ্টকে জানালেন—

'দুইজন দাবীদার উপস্থিত হয়েছে। কিষেণরাও আর দাক্ষিণাত্য থেকে সদাশিব নারায়ণরাও। প্রথম জন ১৮৩৫ সালে মৃত রামচন্দ্র-রাও-এর ভগ্নীর পুত্র। সেই সময়ও সে দাবী জানিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সদাশিবরাও-এর দাবীও ১৮৩৫।৩৮ সালে প্রত্যাখ্যাত হয়। গঙ্গাধররাও-এর জীবিত জ্ঞাতিদের মধ্যে সে নিকটতম এবং তার দাবীও ভিত্তিহীন নয়।

স্বাক্ষরিত—ডি. এ. ম্যালকম, ৩১-১২-১৮৫৩।'

ইতিমধ্যে এলিস বারবার যাওয়া আসা করছেন দরবারে। ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদের বর্তমান অবস্থায় তার পূর্ব সমৃদ্ধির কথা বোঝা অসম্ভব। তবু পরিষ্কার বোঝা যায় বর্তমানে রাণীমহাল নামে যে বাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি একখানি অংশ মাত্র। এইরকমই দুটি মহালের মাঝখানে ছিল প্রাসাদের প্রধান অংশ। সেখানে ছিল দরবার ঘর। দরবার ঘরের একপাশে চিক আড়াল দিয়ে রাণী দামোদররাওকে কোলে নিয়ে বসতেন। রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে কিছু কিছু কাজ করতেন। এলিসের সঙ্গে তাঁর যে কথাবার্তা হত তা হিন্দীতে। রাণী ভাল হিন্দী জানতেন।

কথায়বার্তায় রাণীর ব্যক্তিত্বের যতটুকু পরিচয় পেয়েছিলেন এলিস, তাতে তিনি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উঠলেন। চিকের আড়ালে বিধবার রক্তাম্বর পরিহিতা যে রমণী শোকাচ্ছন্ন মনে, উদ্বিগ্নচিত্তে বড়লাটের আদেশের অপেক্ষা করছেন তাঁর দুর্ভাগ্যে সহানুভূতি জাগল তাঁর। শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি মানবীয় সম্পর্ক গড়ে উঠল। এলিসের মনে হল রাণীর দত্তক গ্রহণকে সর্বতোভাবে বৈধ ঘোষণা করা উচিত। তিনি ম্যালকমকে জানালেন—

'ঝাঁসী ২৪-১২-১৮৫৩

আমি বুঝতে পারছি না অরছার ক্ষেত্রে যখন দত্তক গ্রহণ অনুমোদিত হয়েছিল, ঝাঁসীর ক্ষেত্রে কেন তা হবে না। ভারতীয় রাজ্যগুলির দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা Court of Directors of East India Company'র নয় নম্বর Despatch-এর ১৬ এবং ১৭ নম্বর প্রকরণে খোলাখুলিভাবেই তো স্বীকৃত হয়েছিল। আমার মনে হয় ঝাঁসীর দত্তক গ্রহণের অধিকার নাকচ করা অন্যায়।'

ম্যালকম সহকারীর চিঠির উপর কোনরকম মন্তব্য না করেই ডালহৌসীকে পাঠালেন।

ওদিকে ডালহৌসী তাঁর সহকারীদের সঙ্গে ঝাঁসীর বিষয় আলাপ আলোচনা করলেন।

রাণীর পক্ষে অপেক্ষা আর ছাড়া কিছু করবার ছিল না। এলিস মৃত্যুপথগামী গঙ্গাধরকে কথা দিয়েছিলেন, দত্তক গ্রহণ যাতে অনুমোদিত হয় তাই দেখবেন। রাণী সেজন্য এলিসের উপর অনেকখানি ভরসা রাখতেন। ম্যালকম এলিস নন। তিনি বুঝলেন ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি ঠেকান যাবে না। অতএব, রাণী যাতে সাধ্যমতো স্বাচ্ছন্দ্যে এবং সম্মানে থাকতে পারেন, ম্যালকম সেই ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছিলেন।

বড়লাটের দিক থেকে সাড়াশব্দ না পেয়ে শঙ্কিতচিত্ত রাণী স্থির করলেন আর একখানি খরীতা লেখা প্রয়োজন। ম্যালকম, গোয়ালিয়ার, বুন্দেলখণ্ড ও রেওয়ার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। চিঠি ক্বচিৎ তাঁর কাছে যথাসময়ে পৌঁছত। কলকাতায় চিঠি পাঠাতেন ম্যালকম। ঝাঁসী থেকে কলকাতায় কোন রেলপথ ছিল না। সাধারণ মানুষের কাছে তখন কলের গাড়ি গল্পকথা। ডাক যেত ঘোড়ার ডাকে, রানারের হাতে অথবা ডাকগাড়িতে।

রাণী স্থির করলেন এবার তাঁর দাবী সমর্থন করে কয়খানি চিঠিসহ একখানি বিস্তারিত খরীতা পাঠাবেন। তাঁর সরল যুক্তিতে মনে হল এই রকম একখানি খরীতা পাচ্ছেন না বলেই ডালহৌসী তাঁকে কোন জবাব দিচ্ছেন না। ১৬-২-১৮৫৪ তারিখে তিনি একখানি খরীতা লিখলেন।

ঝাঁসীর পরলোকগত মহারাজা গঙ্গাধররাও-এর বিধবা পত্নী মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কর্তৃক মার্কুইস অফ ডালহৌসী ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল মহাশয়ের প্রতি উদ্দিষ্ট।

'যথাবিহিত সম্মানান্তে :—

আকস্মিক দুর্ভাগ্যের আঘাতে শোকাকুল হওয়াতে আপনাকে ৩-১২-১৮৫৩ তারিখে যে চিঠি লিখেছি, তাতে আমার স্বামীর দত্তক গ্রহণের কারণ বিশদ করে লেখা হয়নি। ক্রটির জন্য আমি মার্জনা চাইছি।

আমার শ্বশুর শিবরাও ভাও-এর পরম সৌভাগ্য যে, বুন্দেলখণ্ডের সামন্তদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম বৃটিশ সরকারের প্রতি স্বীয় আনুগত্য দেখাবার সুযোগ পান এবং ক্রমে ক্রমে অন্য প্রধানদেরও তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করেন। লর্ড লেক তাতে সন্তুষ্ট হয়ে আমার শ্বশুর ও তাঁর বংশধররা যাতে উপকৃত হতে পারেন, সেই মর্মের আর্জি সম্বলিত একটি দরখাস্ত করতে বলেন।

সেই আদেশ অনুযায়ী সাতটি প্রকরণ সম্বলিত একটি খরীতা (wajib-ul-urz), বুন্দেলখণ্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি ক্যাপ্টেন জন বেইলীর হাতে দেওয়া হয়। সেটি তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুমোদিত এবং স্বাক্ষরিত হয়। ইতিমধ্যে শিবরাও ভাও সরকারকে আরও সাহায্য করেন। তখন পূর্বতন খরীতাটি বহাল রেখে আরও দুটি নূতন শর্ত যোগ করে ১৮০৬ সালের অক্টোবর মাসে ক্যাপ্টেন জন বেইলীকে দেওয়া হয়। কোটরার অস্থায়ী শিবিরে গভর্নর জেনারেল স্যার জন বার্লো সেই খরীতাটিতে স্বাক্ষর করেন। এই দ্বিতীয় খরীতার ষষ্ঠ প্রকরণে শিবরাও ভাও ঝাঁসীর প্রতিবেশী রাজ্যগুলি সম্পর্কে লিখেছিলেন অরছা, দতিয়া, চন্দেরী ও অন্যান্য রাজ্যগুলি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আনুগত্য স্বীকারে এবং প্রাপ্য কর দিতে প্রস্তুত আছে, যদি স্বরাজ্যে তাদের অধিকার সর্বরকমে স্বীকৃত হয়।

এই প্রকরণটির উপর ভিত্তি করে সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করেন যে, শিবরাও ভাও-এর অনুসরণে যে যে ভারতীয় রাজ্য বাধ্যতা ও অনুরক্তি দেখাবে, তাদের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হবে।

১৮১৭ সালে শিবরাও ভাও-এর পৌত্র রামচন্দ্ররাও-এর সঙ্গে নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সরকার একটি সন্ধি করেন।

তার দ্বিতীয় প্রকরণে রামচন্দ্ররাও তাঁর সন্তান এবং উত্তরাধিকারীদের ঝাঁসীর রাজসিংহাসনের বংশানুক্রমিক শাসক বলে স্বীকার করা হয়। অন্য শত্রুর আক্রমণ থেকে ঝাঁসীকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

১৮২৪ সালে বর্মার যুদ্ধে ব্রিটিশ ফৌজকে খাদ্য সরবরাহকারী ব্রাজারাদের রামচন্দ্ররাও ৭০,০০০৲ টাকা ধার দেন। বুন্দেলখণ্ডের তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিনিধি এম. আইনস্লী (M Ainslie)র মারফতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেই ধার শোধ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রামচন্দ্ররাও তা প্রত্যাখ্যান করেন। এই মিত্রতাদ্যোতক ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্ট রামচন্দ্ররাওকে একখানি ধন্যবাদ জ্ঞাপক খরীতা ও একটি বহুমূল্য পোষাক পাঠান। এই খরীতাটি দুর্ভাগ্যবশতঃ হারিয়ে গিয়েছে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে তার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দেন, বাধিত হব।

এর পর ভরতপুর এবং কাল্পিতে নানা পণ্ডিতের হানা দেবার সম্ভাবনায়, জালৌনে সিপাহীদের বিদ্রোহের সময়, আইনস্লী, ঝাঁসীর কামদার ভিখাজীনানাকে অরাজকতার হাত থেকে কুঁচ জেলাটি বাঁচাতে বলেন। ভিখাজীনানা ২টি কামান, ৪০০ অশ্বারোহী এবং ১০০০ পদাতিক পাঠিয়ে কুঁচ জেলাতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

নাবালক রাজা রামচন্দ্ররাও এবং ভিখাজীনানাকে ধন্যবাদ দিয়ে মিঃ আইনস্লী চিঠি লেখেন। তিনি লেখেন, ব্রিটিশ সরকারের বিপদে সাহায্যের সময় ঝাঁসীরাজ্য সর্বদাই অগ্রগামী। ১৮৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বয়ং ঝাঁসীতে উপস্থিত থেকে রামচন্দ্ররাওকে উপাধি দেন—মহারাজাধিরাজ ফিদুই বাদশাহ, জামুজা ইংলিস্তান, মহারাজ রামচন্দ্ররাও বাহাদুর।

এই উপাধি রাজার সীলমোহর নাগারা ও চামরের চিহ্নের সঙ্গে খোদাই করে ব্যবহার করতে বলে তিনি বলেন, বুন্দেলখণ্ডের সমগ্র সামন্তমণ্ডলীর মধ্যে শিবরাও ভাও ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ

বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। বেন্টিঙ্কের প্রদত্ত এই সম্মান শিবরাও ভাও-এর আনুগত্যের প্রতিদান মাত্র। সাগরে গিয়ে আর একখানি ধন্যবাদজ্ঞাপক চিঠি, ইংরাজি অক্ষরে সুদৃশ্য সোনালী কাগজে লিখে রামচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন বেন্টিঙ্ক।

রামচন্দ্ররাও-এর ১৮৩৫ সালে মৃত্যু হয়। তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ-রাও রাজা হন। ১৮৩৮ সালে তাঁর মৃত্যু হলে আমার স্বামীর অধিকার স্বীকৃত হয়। তখন রাজ্য ঋণগ্রস্ত ছিল বলে, ক্যাপ্টেন ডি. রস (D. Ross)-এর শাসনাধীনে পাঁচ বছর রাখা হয় এবং তারপর আমার স্বামীকে রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ঝাঁসীতে একটি ব্রিটিশ ফৌজ রাখবার জন্য ঝাঁসীর সিক্কা টাকার ২,৫৫,৮৯১৲ টাকা বার্ষিক আয়ের তুলিও, তালগঞ্জ এবং আরো কয়েকটি জেলা ব্রিটিশ সরকারকে দেওয়া হয়। কর্নেল শ্লীম্যান ১-১-১৮৪৩ সালে পূর্বতন শর্ত ও চুক্তিগুলি স্বীকার করেন।

রামচন্দ্ররাও-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত শর্তের দ্বিতীয় প্রকরণে ব্যবহৃত 'ওয়ারিশান' উত্তরাধিকারী, বংশধর (Heir, Successor etc), এই কথাগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য তা অনস্বীকার্য।

'ওয়ারিশান' কথাটি একমাত্র স্বগোত্রীয় উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য। 'জানিশিনান' কথাটি স্ব-বংশ বা গোত্রের উত্তরাধিকারী অভাবে গৃহীত দত্তকদের সম্পর্কে প্রযোজ্য।

কর্তৃপক্ষ এই বংশের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন বলেই 'ওয়ারিশান' ও 'জানিশিনান' কথা দুটি ব্যবহার করেছিলেন। শর্তে যে কোন কথা ব্যবহার করার আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়। শর্তের মতো মহামূল্য পত্রে যখন 'জানিশিনান' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তখন কর্তৃপক্ষ কি সে সম্বন্ধে চিন্তা করেননি? ঝাঁসীর রাজবংশকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন বলেই দত্তক উত্তরাধিকারীর অধিকার কায়েম করে 'জানিশিনান' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন।

শর্তটির দ্বিতীয় প্রকরণের এই ব্যাখ্যাটি মনে রেখে আমার স্বামী, তাঁর মৃত্যুর পূর্বদিন প্রত্যুষে মেজর এলিস ও ক্যাপ্টেন মার্টিনকে ডেকে পাঠান এবং অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করবার প্রাক্কালে তাঁর দত্তকপুত্র আনন্দরাওকে ব্রিটিশ সরকারের নিরাপদ আশ্রয়ে তুলে দেন। সেই সময় একটি খরীতাও তিনি লিখেছিলেন।

আমি কতকগুলি পূর্ববর্তী ঘটনার তালিকা দিচ্ছি, যাতে বুন্দেলখণ্ডের বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যে অপুত্রক অবস্থায় রাজাদের

মৃত্যু হলে তাঁদের বিধবা রাণীরা দত্তক গ্রহণে অনুমোদন পেয়েছেন। এই অনুমোদন পেয়েছেন বলে, ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের বন্ধন দৃঢ়তর হয়েছে। তাঁরা সর্বতোভাবে সুখ ও শান্তিতে রয়েছেন।

এইসব দৃষ্টান্ত দেখে আমার মনে হয় একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করলে আপনি শিবরাও ভাও-এর বিধবা পুত্রবধূকেও সেই অধিকার দেবেন। তার অসহায় অবস্থার কথা বিবেচনা করবেন।

স্বাক্ষরিত :—সীলমোহর, মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ সাহেবা।

স্বাক্ষরিত এবং ইংরাজীতে অনূদিত আর. আর. এলিস।'

এইসঙ্গে রাণীর বিস্তারিত খরীতাটিকে সমর্থন করে আরো চারখানি চিঠি পাঠান হল। যথা :—

॥ ১ ॥

'আনন্দরাও-এর দত্তক গ্রহণ বিষয়ে উদাহরণ স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আরো চারটি দত্তক বিধান।

ক. দতিয়ার বর্তমান রাজা বিজয়বাহাদুর কুড়োন ছেলে। গত রাজা পরীক্ষিত তাঁকে পথে কুড়িয়ে পেয়ে দত্তক গ্রহণ করেন এবং তা ব্রিটিশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

খ. জালৌনের রাজা বালারাও-এর বিধবা পত্নী তাঁর ভাইকে ভিন্নগোত্র থেকে দত্তক গ্রহণ করেন। সেই ভাই-ই হচ্ছেন জালৌনের ভূতপূর্ব মহারাজা। ভিন্ন গোত্র থেকে গৃহীত এই দত্তকের অধিকার ব্রিটিশ সরকার অনুমোদন করেছিলেন।

গ. অরছার ভূতপূর্ব মহারাজা সুজনসিংহ রাজা তেজসিংহের গৃহীত এবং অনুমোদিত দত্তক।

ঘ. ১৮৩৯ সালে আলগীর ব্রাহ্মণ জাহ্‌গীরদার খণ্ডেরাও মারা যান। আলগী ব্রিটিশ অনুগত রাজ্য ছিল না। খণ্ডেরাও অপুত্রক ছিলেন বলে স্বত্বলোপ নীতি অনুযায়ী মিঃ ফ্রেজার তাঁর রাজ্য নিয়ে নেন। কর্নেল শ্লীম্যান দয়াপরবশ হয়ে গভর্নরের কাছ থেকে দত্তক গ্রহণের অনুমতি এনে দেন। বিধবা রাণী বহুদূর জ্ঞাতি স্থানীয় একজনকে দত্তক নেন এবং রাজ্য বাজেয়াপ্ত করার পর থেকে দত্তকগ্রহণ পর্যন্ত সমস্ত খাজনা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে দত্তক অনুমোদিত করেন।'

॥ ২ ॥

রামচন্দ্ররাওকে লিখিত এম. আইনশ্লীর চিঠি।

'আপনার সাহায্যের কথা গভর্নর জেনারেলকে বলেছি।
স্বাক্ষরিত—এম. আইন্‌স্লী, রাজনৈতিক প্রতিনিধি বুন্দেলখণ্ড,
১৬-১২-১৮২৪।'

॥ ৩ ॥

ঝাঁসীর কামদার ভিখাজীনানার প্রতি এম. আইন্‌স্লী।

'পারাশানের মিস্নাপণ্ডিতের নেতৃত্বে পরিচালিত কুঁচ জেলার বিদ্রোহ দমনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। স্বাক্ষরিত—এম. আইন্‌স্লী, রাজনৈতিক প্রতিনিধি বুন্দেলখণ্ড, ১৬-১-১৮২৫।'

॥ ৪ ॥

রামচন্দ্ররাও-এর প্রতি এম. আইন্‌স্লী।

'ভিখাজীনানাকে প্রেরণের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। স্বাক্ষরিত—এম. আইন্‌স্লী, ২২-১-১৮২৫।

সমস্ত খরীতাটি আর. এলিস এবং হেড্‌ক্লার্ক জে. উইলিয়ামস, কর্তৃক অনূদিত এবং স্বাক্ষরিত।'

এলিস ম্যালকমকে খরীতাটি পাঠালেন। লিখলেন—

'মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর খরীতার অনুবাদ এবং মূল দুই-ই আপনার মারফতে গভর্নর জেনারেলের বিজ্ঞপ্তির জন্য পাঠাচ্ছি।
স্বাক্ষরিত—আর. আর. এলিস,
ঝাঁসী—১৬-২-১৮৫৪'

এই চিঠি ম্যালকম পেলেন রেওয়াতে। সেদিন ২৭-২-১৮৫৪। পরদিন তিনি খরীতাটি জে. পি. গ্র্যান্টকে পাঠালেন—

'ক্যাম্প রেওয়া।
জে. পি. গ্র্যান্টকে—ডি. এ. ম্যালকম।
রাণীর চিঠির মূল ও অনুবাদসহ এলিসের চিঠি পাঠাচ্ছি।
স্বাক্ষরিত—ডি. এ. ম্যালকম,
তারিখ—২৮-২-১৮৫৪'

ম্যালকমের দূত চিঠি নিয়ে কলকাতা চলে গেল। এদিকে ঝাঁসীতে রাণী দিবারাত্রি প্রতীক্ষায় অধীর। প্রতিদিন যেন প্রতীক্ষায় মন্থর। রাত্রির যেন গতি নেই। দামোদরের কথা মনে করে রাণীর চিত্তে শান্তি নেই। একখানি রেশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে বিনিদ্র রজনীতে অলিন্দে পদচারণা করেন রাণী, কখনও নির্নিমেষে দেখেন সুপ্ত দামোদরের নিশ্চিন্ত মুখ। স্বীয় মাতৃক্রোড় থেকে বিচ্যুত করে এনেছেন এই শিশুকে, সে কি পুনর্বার অশ্রুপ্লুত করবার জন্যে?

কতবড় গুরুদায়িত্ব তাঁকে অর্পণ করে চলে গিয়েছেন গঙ্গাধররাও। এই দায়িত্ব বহন করবার যোগ্যতা কি তাঁর আছে? তাঁর চারিপাশে একটি অবিচ্ছিন্ন আঁধার সাগর,—পাড়ি দেবেন কোন ধ্রুবতারার ভরসায়, কে তাঁকে উত্তর দেবে?

নিরুত্তর রজনী। নির্বাক নৈশ প্রকৃতি। দূরে কার গলায় ভীরুগানের কলিগুলি রাতের শেফালীর মতো ঝরে ঝরে পড়ছে—বায়ু বহে পুরবৈঁয়া—নিদ নহিঁ আবত সৈঁয়া। এইরাতে কোন রাজনর্তকী বিরহে রাত জাগছে? আকাশের দিকে তাকালেন রাণী। সাড়া নেই। রূপার শামাদানে বাতিটি বাড়িয়ে দিলেন রাণী। দামোদর অন্ধকারে ভয় পায়।

কিন্তু ২৬শে ফেব্রুয়ারীই ডালহৌসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তাঁর তিনজন সহকারীর সঙ্গে যুক্ত আলোচনার পর ঠিক করলেন, স্বত্বলোপের জন্য ঝাঁসীকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ডোরিন খসড়া তৈরি করলেন এবং ডালহৌসী তাতে স্বাক্ষর করলেন।

॥ ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি ॥

'১। ঝাঁসী, সাতারার চেয়েও সুস্পষ্টভাবে ব্রিটিশ আশ্রিত রাজ্য। অতি অল্পদিন হল ব্রিটিশ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে রামচন্দ্ররাও রাজত্ব করছিলেন। অতএব পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাবে ঝাঁসী স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ফিরে আসবে।

২। ঝাঁসী যে একান্তভাবেই আশ্রিত রাজ্য তা বোঝবার জন্য যুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঝাঁসীর শাসকগোষ্ঠী স্বাধীন নন্। তেহরী অরছা যে অর্থে স্বাধীন রাজ্য, সে অর্থে ঝাঁসী কোনদিনই স্বাধীন রাজ্য ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ঝাঁসী অরছা রাজ্যেরই একটি অংশ। পেশোয়া তাকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা গঠন করে সুবাদারের অধীনে রেখেছিলেন।

৩। দত্তক গ্রহণের আকস্মিকতা সন্দেহজনক। ম্যালকম নিজেও বলেছেন, দত্তক গ্রহণের কথা শুনে সকলেই বিস্মিত হয়েছিলেন।

৪। ঝাঁসীর পূর্ব ইতিহাস রাণীর যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করবে। রামচন্দ্ররাও-এর বিধবা পত্নী একটি দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। সেই দত্তককে সামাজিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য বৈধ এবং

রাজনীতির প্রয়োজনের পক্ষে অবৈধ ঘোষণা করে অন্য রাজা নির্বাচিত করা হয়েছিল।

৫। আমাদের ঝাঁসী পুনর্গ্রহণ করবার একমাত্র কারণ হচ্ছে ন্যায়সঙ্গত পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাব। সে বিষয়ে কোন দ্বি-মত পোষণ করা উচিত নয়।

৬। ঝাঁসী নিয়ে ব্রিটিশ সরকার কোন অংশেই লাভবান হবেন না। কেননা এই রাজ্যের সীমানা অতি ছোট। খাজনাও সামান্য। কিন্তু ঝাঁসীর অবস্থান বড়ই অদ্ভুত। অন্যান্য ব্রিটিশ অধিকৃত জেলার মধ্যে অবস্থিত বলে ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি আমাদের অধিকৃত বুন্দেলখণ্ডের রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করবে।

৭। অন্য রাজ্য সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যাবে যে, ব্রিটিশ সীমান্তগুলির সঙ্গে ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তিতে ঝাঁসীর জনসাধারণ পরম উপকৃত হবে।

৮। রাজনৈতিক প্রতিনিধির প্রস্তাব অনুযায়ী রাণীকে পর্যাপ্ত বৃত্তি দেওয়া হবে এবং ঝাঁসী বুন্দেলখণ্ডের অপরাপর ব্রিটিশ রাজ্যগুলির মতোই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরের শাসনাধীনে থাকবে।

স্বাক্ষর—২৭-২-১৮৫৪—ডালহৌসী
২৮-২-১৮৫৪—জে. এ. ডোরিন
১-৩-১৮৫৪—জে. লো
২-৩-১৮৫৪—এফ. জে. হ্যালিডে।'

ডালহৌসীর এই যুক্তিতে রাজনীতিক কোন গলদ নেই। তবু সেদিনকার জনমতও এর পক্ষে কোন সমর্থন জানায়নি। তার কারণ, একে সমর্থন করা মানে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে সমর্থন করা। ঝাঁসীর জনসাধারণ ইংরেজের হিতাকাঙ্ক্ষার প্রতি কতটা আস্থা রাখত সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কে. ও ম্যালিসন (Kaye and Malleson) যে মন্তব্য করেছিলেন তা স্মরণীয়। তাঁরা বলেছিলেন—

'লর্ড ডালহৌসী লিখলেন, যেহেতু এই জেলাটি বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য ব্রিটিশাধিকৃত রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত, সেহেতু এটির অধিকার দ্বারা বুন্দেলখণ্ডের সাধারণ আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হবে।

ব্রিটিশ সীমানার সঙ্গে ঝাঁসী যুক্ত হবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে

ঝাঁসীবাসীর উপকার করা। অন্য রাজ্যগুলির সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থেকেই তা পরিস্ফুট হবে।

ঝাঁসীর জনসাধারণ এই অন্তর্ভুক্তিকে কতখানি আন্তরিকতার সহিত নিয়েছিল, ১৮৫৭ সালের অভিজ্ঞতা থেকেই তা ভালভাবে বোঝা গিয়েছে।'

কে. ও ম্যালিসনের উক্তির মর্ম হচ্ছে এই : শুধু তাঁরাই নন বিভিন্ন ইংরেজ ঐতিহাসিকও ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করতে পারেননি। টি. রাইস হোমস (T. Rice Holmes) বলেছেন—"এ কথা নিশ্চিত যে, ঝাঁসী ও অযোধ্যা যদি ব্রিটিশ কর্তৃক অধিকৃত না হত, তাহলে ১৮৫৭-৫৮ সালে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার, তার অনেকখানি এড়ান যেত।"

ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের পরিপূর্ণ সমর্থক বিভিন্ন ঐতিহাসিকও ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করতে পারেননি।

ডালহৌসীর এই সিদ্ধান্ত ম্যালকমের কাছে পৌঁছল। ম্যালকম পাঠালেন এলিসকে। তিনি লিখলেন—

'অন্তর্ভুক্তির আদেশ পেলাম। আমার ঘোষণা পত্র ঝাঁসীর সর্বত্র প্রচার করুন।

মহারাজার পুরনো সৈন্যদের দুই মাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করুন।

রাজার পুরনো কর্মচারীদের যতদূর সম্ভব স্ব স্ব কাজে বহাল রাখুন।

ঝাঁসীতে তিনটি ও কড়েরাতে দুইটি কম্পানী (Company) সৈন্য রাখুন।

ঝাঁসীতে আপাতত সিন্ধিয়ার ষষ্ঠ কন্টিন্‌জেণ্ট রাখুন। কড়েরার জন্য সিপরী (শিবপুরী—গোয়ালিয়ার) থেকে ক্যাপ্টেন হেনেসী খবর পেলেই ৫০০ সৈন্য, ২টি কামান ও একদল অশ্বারোহী আনবেন।

দ্বাদশ বেঙ্গল নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রি এসে পৌছলে সিন্ধিয়ার সৈন্যরা মোরারে ফিরে যাবে। তখন ঝাঁসীতে হেনেসীর সৈন্যসহ নেটিভ ইন্‌ফ্যাণ্ট্রির একটি পুরো রেজিমেণ্ট, এক কোর (Corps) অশ্বারোহী ও কামান থাকবে। প্রয়োজন হলে বুন্দেলখণ্ডের যে কোন স্থান থেকেই ঝাঁসীতে সামরিক সাহায্য পাঠান যাবে।

রাণীর প্রাপ্য বৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে আমি গভর্নর জেনারেলের

সঙ্গে পত্রালাপ করেছি। যথাসময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন।'

সাধারণের জন্য ম্যালকমের বিজ্ঞপ্তি :—

'২০শে নভেম্বর ১৮৫৩, আকস্মিকভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে ২১শে নভেম্বর ১৮৫৩, মহারাজা গঙ্গাধররাও-এর মৃত্যু হওয়াতে আমি নিম্নোক্ত মর্মে গভর্নরের আদেশ পেয়েছি :

ঝাঁসীর দত্তক বিধান অনুমোদিত হয়নি। স্বত্ববিলোপের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ঝাঁসীকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করছেন।

বর্তমানের জন্য আমি মেজর এলিসকে ঝাঁসীর শাসক নিযুক্ত করেছি। ঝাঁসীর সর্বসাধারণ ব্রিটিশ সরকারের অধীন এবং রাজস্ব মেজর এলিসের কাছে দেয়।

স্বাক্ষর—ডি. এ. ম্যালকম, ১৫-৩-১৮৫৪'

১৫-৩-১৮৫৪ তারিখেই এলিস পেলেন ম্যালকমের চিঠি। ডালহৌসীর দীর্ঘ নীরবতা দেখেও এলিস সম্ভবত সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য রূপের কথা বুঝতে পারেননি। রাণীকে যে তিনি আশ্বস্ত করেছিলেন এবং রাণী যে আশা পোষণ করছিলেন, তা মনে করবার কারণ আছে। এখানে একটি কথা বলা সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

এলিস রাণীর প্রতি তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে তৎকালীন ইংরাজদের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। রাণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাকে অন্য চোখে দেখে, ঝাঁসীর পটভূমিকায় উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাণীর চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হয়। গঙ্গাধররাও, লক্ষ্মীবাঈ এবং শেক্সপীয়ার (এলিস) এই নাম ব্যবহার করে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে গিলিয়ান (Gillean) ছদ্মনামে জনৈক লেখক। উপন্যাসটির নাম হচ্ছে "The Rane" বা "রাণী"। এই গ্রন্থের শেক্সপীয়ার হচ্ছেন প্রকৃত পক্ষে এলিস। রাণীকে স্বৈরিণী, জিঘাংসু এবং হীন চরিত্রা একটি রমণীর তুল্য করে লেখা হয়েছে। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল একটি নির্দোষ ও নির্ভীক ইংরেজ এবং একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া ভারতীয় রমণীর সহজ ও স্বাভাবিক শ্রদ্ধার সম্বন্ধকে বিকৃত করে দেখান। রাণীর পোষাক বিষয়ে তিনি অত্যন্ত স্বাধীনভাবে ভাষা ব্যবহার করেছেন।

সেদিন অবধি ঝাঁসীর রাণীর নাম নিষিদ্ধ ছিল ইংরেজ রাজত্বে। সুতরাং রাণীর বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থকার বইখানি লেখেননি। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, গিলিয়ানের 'The Rane' এবং Meadows Taylor-এর "Seeta" (রাণীর চরিত্র কেন্দ্র করে আর একটি কাল্পনিক উপন্যাস) ইংলণ্ডেও জনপ্রিয় হয়নি। সেই সুদূর ১৮৫৪ সালে রাণী তাঁর পরিচিত ইংরেজ ও ভারতীয় দুই মহলেই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। বই দু'খানিকে পাঠক সমাজ সমাদর করেনি। এর থেকেই বোঝা যাবে, যুগে যুগে সচেতন জনমতই সাহিত্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে শুভ সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখে। অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো গিলিয়ানের 'রাণী' বইখানির প্রসঙ্গ চিরতরে সমাপ্ত হল কিন্তু বহুদিন বাদে। মাত্র কয়েক বছর আগেও সেই বইখানির উপর ভিত্তি করে একখানি নাটক লেখা হয়েছিল এবং সেই নাটক বোম্বাই-এ অভিনীত হবার কথাও শোনা গিয়েছিল। তারপরে সে সম্বন্ধে আর কিছুই শোনা গেল না। তাতেই বোঝা গেল উদ্যোক্তারা নিরুদ্যম হয়েছেন এবং বইখানির উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। এ প্রসঙ্গে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এলিস স্থির করলেন ১৬-৩-১৮৫৪ তারিখ প্রভাতে দরবারে যাবেন। খবর গেল রাজপ্রাসাদে।

পনেরোই মার্চের রজনীতে রাণীর উদ্বিগ্ন চোখে ঘুম এল না। সম্ভবত কাল প্রভাতেই তাঁর সমস্ত প্রতীক্ষা সার্থক হবে।

একটি দিন, অন্যদিনের চেয়ে কোন অংশে ভিন্ন নয়। ষোল তারিখেরও সকাল হল। মহলকারণীরা প্রভাতেই মার্জনা করে ধুয়ে দিয়েছে দরবার গৃহের অঙ্গন। ধূপের গন্ধ উঠছে মৃদু মৃদু। রূপোর পাত্রে বেলফুলের কুঁড়ি ভিজিয়ে রেখে গিয়েছে দাসী। তার গন্ধে বাতাস মিঠে। বিশাল দরবার গৃহের এক পাশে চিক আড়াল দিয়ে বসেছেন রাণী। স্নানান্তে শ্বেত চন্দেরী শাড়ি ও সাদা চোলী পরেছেন; সিক্তকেশ শুকিয়ে বেঁধেছেন 'আম্বাড়া' ছন্দে। কপালে পূজার চন্দনতিলক, গলায় মুক্তামালা, হাতে হীরার বালা, আঙুলে হীরার আঙটি। এই নিত্যকার বেশে বসেছেন রাণী গদিতে তাকিয়া রেখে। স্বভাবতই গৌরবর্ণা, ঘনকৃষ্ণ আকুঞ্চিত কেশা

উনিশ বছরের তরুণী রাণীকে মূর্তিমতী সরস্বতী সদৃশ বোধ হচ্ছে। পাশে বসে আছেন দামোদররাও।

হঠাৎ সভাস্থ সকলকে চকিত করে মেজর এলিস এলেন। দরবার ঘরের সারি সারি সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। তাই ধরে উঠতে লাগলেন এলিস। অন্তরালবর্তিনী রাণীকে শুষ্ক কণ্ঠে সম্মান জানিয়ে তিনি ডালহৌসীর আদেশ পত্র এবং ম্যালকমের বিজ্ঞপ্তি পড়তে লাগলেন। উপস্থিত সকলে বিস্মিত ও চকিত হলেন। বজ্রাঘাতের মতো নিশ্চিত হয়ে এলিসের কথাগুলি উচ্চারিত হতে লাগল।

এলিসের পড়া শেষ হতে না হতে পর্দার আড়াল থেকে এলিসের পরিচিত কণ্ঠে, সম্পূর্ণ অপরিচিত দৃঢ়তা, অথচ গভীর দুঃখের সঙ্গে সংযত উচ্চারণে লক্ষ্মীবাঈ-এর সুনিশ্চিত চারটি কথা ধ্বনিত হয়ে উঠল :

"মেরী ঝাঁসী দুংগী নহীঁ ॥"

ঐতিহাসিক উক্তি। সেদিন রাণী জানলেন না, তাঁর এই প্রতিবাদ সেই ঘর আর গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো অনেক যুগ, আরো অনেকদিন, আরো অনেক কালের বাধা জয় করে বেঁচে থাকবে।

রাণীর উক্তি ঐতিহাসিক এইজন্য নয় যে, এই উক্তির নাটকীয়তা ভারতীয় মনকে মুগ্ধ করেছিল। ঐতিহাসিক এইজন্য যে, সেদিন সমগ্র ভারতভূমিতে ইংরেজের ক্রমবর্ধমান করালগ্রাসে বিলীয়মান ভারতীয় রাজ্যগুলির মালিকরা যখন কোন প্রতিবাদ করেননি তখন রাণীর এই উক্তিই প্রথম এবং একমাত্র প্রতিবাদ।

সেইদিন একমুহূর্তের জন্য যেন এলিস দাঁড়িয়েছিলেন সরকারের প্রতিভূ হয়ে, আর রাণীর মাধ্যমে যেন ক্ষুব্ধ ভারত প্রতিবাদ জানিয়েছিল ইংরেজকে,—যে প্রতিবাদ তখনই জমে উঠেছে, যে প্রতিবাদ তখনই সময় গুণছে এবং যে প্রতিবাদ অতি শীঘ্র বিদীর্ণ হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রামে।

তারপর থেকে কত দিন চলে গিয়েছে। সে দিন নেই, সে মানুষ নেই, সেই দরবার ঘর নেই, সে এলিস নেই। তারপর থেকে কত মানুষ এল গেল, ঝাঁসীর পাশে বেতোয়ার তীরে কতবড় যুদ্ধ হল, কত মানুষ কাটা পড়ল, তাদের হাড়ের উপর মাটি পড়ে পড়ে নতুন করে ফসল হল। লাঙল চাষ দিতে দিতে কতবার লাঙলের ডগায়

কামানের বড় বড় গোলা উঠল,—ছেলেরা দেখে বড় বড় চোখ করে বলল—বড়ি বড়া গেণ্ডুয়া ছে। বুড়ো দাদু তা দেখে শীর্ণমুখে রেখা টেনে হেসে বলল—গেণ্ডুয়া কঁহা? তাঁতিয়াকে সাথ অংরেজ যো লড়াই চড়ায়া উস্‌কে হি গোলী হ্যায় না?

গোলাগুলী ঝাঁসীর কেল্লার কোথায় কোথায় লেগেছিল, বুড়ো কেল্লাটাও হয়তো সে কথা ভুলতে বসেছে। কেল্লার গায়ে গোলার ফাটলে ফাটলে শ্যাওলা ধরেছে।

ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মীকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লীতে নিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে ভিন্‌দেশীরাও তল্পীতল্পা গুটিয়ে চলে গিয়েছে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে। ভারতে ইংরেজ শাসনও একদিন গল্পকথা হয়ে যাবে। ইংরেজ আমল চোখে দেখেছে, এমন মানুষের মৃত্যুতে তখন হয়তো খবর বেরুবে কাগজে, আর সেদিনের মানুষ দেখতে যাবে সেই আশ্চর্য ব্যক্তিকে।

ইংরেজরাজ ফুরিয়ে গেলেও রাণীর কথাটির আশ্চর্য অনুরণন ভারতবাসীর মনে কিন্তু বারবার ঝঙ্কার দেবে। সেদিনকার মানচিত্রে, ব্রিটিশভারতের পরিসরের তুলনায়, বছরে বিশলাখ টাকা খাজনার ঝাঁসীরাজ কত দুর্বল, কত ছোট, তা দেখলে পরে বারবার মনে হবে, এত কম ক্ষমতা নিয়ে এতখানি নির্ভিক উক্তি যদি রাণী উচ্চারণ করে থাকতে পারেন, তবে সেই উক্তিকে অমর করে রাখতে আমাদের বাধা নেই। বিপদের কথা না ভেবে কখন কখন কোন কোন মানুষ তলোয়ারের মতো ঝলসে ওঠে। রাণীর এই ভাস্বর উক্তি তাই অমর হয়ে থাকবে।

এসব হলো আমার তোমার কথা। ঝাঁসী শহরের উপান্তে যে বুড়ো শীতের দিনে আংরায় মকাই পোড়ায়, সে এত কথা জানে না। মকাই পোড়ায় আর নাতনীকে ছড়া বলতে বলতে তার মাথা একটু একটু কাঁপে—

> 'বঢ়ি বঢ়িয়াঁ থে য়ো রাণী।
> যিননে ঝাঁসী ন ছোড়েঙ্গি বোলি॥
> যিন্‌নে সিপাইয়োঁ কে লিয়ে লড়াই কিয়ে।
> ঔর অপ্‌নে খায়ে গোলী॥
> যব্‌তক অজয় ভারত কা পাণি।
> তব্‌তক অমর ঝাঁসী কি রাণী॥'

রাণীর ১৬-২-১৮৫৪ তারিখের চিঠি পাবার অনেক আগেই ঝাঁসীর ওপর রায় দিয়েছিলেন ডালহৌসী। রাণীর চিঠিতে যুক্তি এবং নজীর যা যা ছিল, তা প্রায়শঃ অকাট্য। কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে একটি সারমর্ম লিখে সরকারী দফ্‌তরে সেই আর্জি রেখে দিলেন ডালহৌসী। সদস্যরা লিখলেন—

'মহারাজা গঙ্গাধরের দত্তক গ্রহণ সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। সদাশিব-রাও-এর দাবী তবু স্বীকার করা যেতে পারে। কিষেণরাও-এর দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১৮০৪ সালের সন্ধি হয়েছিল শিবরাও ভাও-এর সঙ্গে। সে সন্ধি ব্যক্তিগত। ১৮১২ সালে রামচন্দ্ররাও-এর স্বার্থ দেখে শিবরাও ভাও যখন সেই সন্ধিরই পুনরাবৃত্তি করতে চাইলেন, ব্রিটিশ সরকার এই বলে তা প্রত্যাখ্যান করেন যে, ১৮০৪ সালের সন্ধিতে পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর সম্মতি ছিল। সেই সময় পেশবার হয়ে বুন্দেলখণ্ডে রাজত্ব করছিলেন ব্রিটিশ সরকার। শিবরাও ভাও পেশবার কর্মচারী। পেশবার অধিকার ক্ষুন্ন হবে আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার ১৮১২ সালে নতুন সন্ধি করতে চাইলেন না।

১৮১৪ সালে শিবরাও ভাও-এর মৃত্যু হয়। রামচন্দ্ররাও-এর অভিভাবক রামচন্দ্ররাও-এর নামে স্বায়ত্বশাসনের অধিকার চান। পেশবা অপমানিত হবেন আশঙ্কায়, ব্রিটিশ সরকার সে প্রস্তাবে অসম্মত হন। ১৮১৭ সালে বুন্দেলখণ্ড থেকে পেশবার অধিকার চলে যায়। রামচন্দ্ররাও-এর সঙ্গে ১৮১৭ সালেই একটি সন্ধি স্থাপিত হল। দ্বিতীয় শর্ত অনুযায়ী ঝাঁসীতে শিবরাও ভাও-এর বংশধর রামচন্দ্র-রাও-এর অধিকার পুরুষানুক্রমে স্বীকৃত হল। ১৮৩৫ সালে রামচন্দ্ররাও-এর মৃত্যু হয়। তাঁর পরবর্তী শাসক রঘুনাথরাও মারা যান ১৮৩৮ সালে।

চারজন নতুন দাবীদার এলেন;—বাবাসাহেব গঙ্গাধররাও, কৃষ্ণরাও, আলীবাহাদুর (রঘুনাথরাও-এর অবৈধ পুত্র); এবং রঘুনাথরাও-এর বিবাহিতা পত্নী।

এই দাবী সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য লেঃ কর্নেল স্পেয়ার্স (Speirs—গোয়ালিয়ারের তৎকালীন রেসিডেন্ট), সাইমনফ্রেজার এবং ক্যাপ্টেন ডি. রস-কে নিয়ে একটি কমিশন নিয়োগ করা হয়। —যার রায় অনুযায়ী গঙ্গাধররাও নির্বাচিত হলেন।

এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হল পুরুষ উত্তরাধিকারীর অভাবে যে সব রাজ্যের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার লুপ্ত হয় এবং সরকারের যে সব রাজ্য গ্রহণের ক্ষমতা থাকে, ঝাঁসী তারই মধ্যে একটি (বুন্দেলখণ্ডের প্রধানদের দত্তক গ্রহণ বিষয়ে স্যর চার্লস মেট্‌কাফ-এর ২৮।১০।১৮৩৭ তারিখের লেখা দ্রষ্টব্য)।

মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ অরছা, দতিয়া ও জালৌনের উপমা দিয়েছেন।

অরছা ও দতিয়া চিরদিনই স্বাধীনরাজ্য। দাক্ষিণাত্যের একজন মহারাষ্ট্রীয় প্রধান জালৌনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। জালৌন মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য হওয়া সত্ত্বেও কোনদিনই পেশবার অধীন ছিল না। জালৌনে ১৮৩২ সালে দত্তকগ্রহণ অনুমোদিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তার ভয়াবহ পরিণাম দেখে ব্রিটিশ সরকার ১৮৪০ সালে সেই রাজ্য গ্রহণ করেন। দেশীয় শাসকদের স্বায়ত্বশাসন পুনর্বার দেখবার ইচ্ছা সরকারের নেই।'

বিলেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারস্‌কে ভারতবর্ষের বৈদেশিক দপ্তর থেকে জানান হল :

'৪-৩-১৮৫৪ (২১ নং পত্র)

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সৃষ্ট অধীন করদরাজ্য ঝাঁসীর শাসক মৃত্যুর আগের দিন একটি দত্তক গ্রহণ করেন। এই রাজ্যেরই পূর্ব দৃষ্ট উপমা অনুসারে আমরা মীমাংসা করেছি এই দত্তক গ্রহণ অবৈধ। এই দত্তকের রাজ্য পাবার কোন অধিকার নেই। এই মৃত রাজ ঝাঁসীর পূর্বতন রাজাদের কোন জীবিত পুরুষ বংশধর না থাকাতে স্বত্বলোপের নীতির ভিত্তিতে ঝাঁসীরাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

'২৯-৪-১৮৫৪ (৩৯ নম্বর পত্র)

ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে যে যে কাগজপত্র এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে তার অনুলিপি পাঠান হল।

স্বাঃ ডালহৌসী, জে. ডোরিন, লো. হ্যালিডে।'

২৯শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রাপ্ত কাগজপত্রের মধ্যে রাণীর বিস্তৃত খরীতাটি নিশ্চয় ছিল। তাঁর দুইখানি খরীতাই থাকবার কথা। কিন্তু কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারসের তরফ থেকে ঝাঁসীর ওপর লেখা একমাত্র চিঠিতে রাণীর দ্বিতীয় চিঠিখানির উল্লেখ নেই। ভারতবর্ষ থেকে তাঁদের কাছে যা কাগজপত্র যেত, তার ওপর তাঁরা যে কোন ন্যায় নিরপেক্ষ মতামত দেবেন, সে আশা দুরাশা মাত্র।

ব্রিটিশভারতের ক্রমবিস্তৃতির বিরুদ্ধে যে কোন যুক্তিই তাঁদের কাছে অন্যায্য বলে বোধ হত। তাঁদের চিঠিখানি এইরকম :

'লণ্ডন, ২-৮-১৮৫৪

ভারতবর্ষ বিষয়ে ৩৪ নম্বর রাজনৈতিক পত্র।

ঝাঁসীর রাজা মৃত্যুশয্যায় তাঁর একটি সম্পর্কিত ভাইকে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বিধবা রাণী দাবী করেছেন, ঝাঁসীর ভাবী শাসক হিসেবে এই শিশুকে স্বীকার করা হোক। কিন্তু, ঝাঁসীরাজ্যের সঙ্গে আমাদের পুর্বাপর সম্পর্ক বিবেচনা করে আপনারা এই দত্তক পুত্রের রাজ্যাধীকার স্বীকার করতে অসমর্থ হয়েছেন।

১৮০৪ সালে ঝাঁসীর সুবাদার শিবরাও ভাও-এর সঙ্গে একটি সন্ধি হয়। সে সন্ধি একান্তই ব্যক্তিগত। ১৮১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ঝাঁসীর সিংহাসনে শিবরাও ভাও-এর বংশধরদের উত্তরাধিকার স্বীকার করবার মনস্থ করে একটি সন্ধি করেন। সেই শর্তের দ্বিতীয় দফা অনুযায়ী, শিবরাও ভাও-এর বংশধর রামচন্দ্ররাও-এর বংশধরদের অধিকার স্বীকৃত হয়। এমন কি, শুধু রামচন্দ্ররাওই নন, শিবরাও ভাও-এর বংশের যে কেউ জীবিত থাকলেই তাঁর দাবী স্বীকার করবার কথাও ঐ সন্ধিতে বলা হয়। সে রকম কেউ এখন জীবিত নেই। আপনাদের ঝাঁসী অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত আমরা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি। বিধবা রাণীর মাসোহারার বিষয়ে যা যুক্তিযুক্ত করবেন।'

ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সরকারী কাগজপত্রের এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ। যে ভিত্তিতে ঝাঁসী গ্রহণ করেছিলেন ব্রিটিশ সরকার, সেই ভিত্তি যথেষ্ট যুক্তি দ্বারা গঠিত কি না আজ সে প্রসঙ্গ অবান্তর হয়ে গিয়েছে। তবু বলতে হয়, ডালহৌসীর অন্তর্ভুক্তির আদেশপত্রে যথেষ্ট যুক্তির অভাব ছিল। ডালহৌসী, রামচন্দ্ররাও-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীর গৃহীত দত্তক পুত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন সেই দত্তককে আমরা রাজনীতিক স্বার্থের জন্য অবৈধ এবং সামাজিক উদ্দেশ্যে বৈধ ঘোষণা করেছিলাম, অতএব এইবারও তাই-ই করব। কিন্তু দুটি প্রসঙ্গ একেবারে দুই রকমের। রামচন্দ্ররাও-এর মৃত্যু হলে তাঁর আপন পিতৃব্যদ্বয় জীবিত ছিলেন, যাঁরা শিবরাও ভাও-এর পুত্র। তাঁদের অধিকার অস্বীকার করে দত্তক গ্রহণ একান্ত অসঙ্গত কাজ হয়েছিল। ঝাঁসীর বর্তমান প্রশ্ন অন্যরকম।

গঙ্গাধররাও-এর যখন অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হল, তখন তাঁর নিজের লোক কেউ ছিলেন না। কাজে কাজেই দত্তক-এর কথা উঠল। দত্তক যাঁকে গ্রহণ করা হয়েছিল, তিনিও একই বংশের ছেলে। শিবরাও ভাও-এর প্রত্যক্ষ বংশধর তিনি নন, কিন্তু তাঁর ঊর্ধ্বতন পঞ্চমপুরুষ, এবং শিবরাও ভাও-এর পিতামহ দু'জনে সহোদর ভাই। হিন্দুমতে একবংশ বলতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকলকেই বোঝায়। এ কথা সত্য যে, দামোদররাও শিবরাও ভাও-এর বংশধর নন। তবু তিনি শিবরাও ভাও-এর পিতামহের জ্যেষ্ঠভ্রাতার বংশধর। তাঁর অধিকার যদি না থাকে, তাহলে সদাশিবরাও-এর সম্পর্কেও সম্মতি থাকা উচিত ছিল না সরকারের। কেননা সদাশিবরাও শিবরাও ভাও-এর পিতৃব্যের বংশ সঞ্জাত।

আসলে সর্বপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছা করলেই এই দত্তকবিধান স্বীকার করে ঝাঁসীকে অধিকার না করলেও পারতেন। কিন্তু তা তাঁরা করলেন না। কেননা সূচ্যগ্র মেদিনী তাঁরা ত্যাগ করবেন না, এই ছিল ইতিহাসের বিধান। তাহলে রচিত হত না ইতিহাস।

ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তি যে অন্যায় হয়েছিল, একথা বহু ইংরাজ ঐতিহাসিকই স্বীকার করে গিয়েছেন। কে. ও ম্যালিসন বলে গিয়েছেন—

> 'The Rani of Jhansi had, in my opinion suffered great wrongs and she resented them in a manner which was natural to her.'
>
> 'আমার মতে, ঝাঁসীর রাণীর সম্পর্কে গর্হিত অন্যায় করা হয়েছিল। তিনি তাঁর পক্ষে যা স্বাভাবিক সেই উপায়ে তাঁর আপত্তি জানিয়েছিলেন।'

সুধী ইংরাজমহলে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া বোঝা যাবে বিভিন্ন লেখকের উদ্ধৃতি থেকে।

> 'রাজা গঙ্গাধররাও বিশ্বাস করেছিলেন, তিনি ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন, তার ফলে এই দত্তক পুত্রের প্রতি অনুগ্রহ দেখান হবে। ভারতীয়দের বিশ্বস্ততার কথা সরকার মনে রাখবেন, এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে তাঁকে মরতে দেওয়া হল। সাম্রাজ্য তখন এতই শক্তিশালী যে, ফোর্ট উইলিয়ামের

সর্বশক্তিমান প্রভু ভাবছিলেন, বিশ্বস্ততার কথা ভুলে গেলেও কোন ক্ষতি নেই।' (*W. M. Torrens, M. P.*)

'দেখা যাবে যে, ঝাঁসীর জন্য লছমীবাঈ তাঁর মৃত স্বামীর, দত্তক গ্রহণের অধিকারটিকে এই ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চাইছেন—১৮১৭ সালের সন্ধিতে "জো নাশীনান্" (সমস্ত উত্তরাধিকারী) কথাটি ব্যবহার করে। "ওয়ারিসান্" (প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী) কথাটির ওপর জোর দেওয়া হয়নি। ঝাঁসীর প্রধানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিশ্বস্ততার অতীত নিদর্শনগুলিও রাজ্যটির ভাগ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগেই আমাদের বিবেচনা করা উচিত।

"ওয়ারিশান্ যো জো নাশীনান্" কথাটি ব্যবহার করে দত্তক গ্রহণের পথ খোলা রাখা হয়েছে সত্য, কিন্তু 'বিলির' কথাটি ব্যবহার করে রাজার দত্তক গ্রহণের পথকে খর্ব করা হয়েছে কিনা, আইনগত ভাবে তাতে বাধা আছে কি না, তা একমাত্র সরকারই বিবেচনা করতে পারেন।

আমাদের সরকার এতখানি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠবার অনেক আগে, অনেক প্রলোভন জয় করে ঝাঁসীরাজ আমাদের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়ে এসেছেন, তা এতটুকু বাড়িয়ে বলেননি লক্ষ্মীবাঈ।' (*Papers on the Annexation of Jhansi*).

'ক্ষুদ্রায়তন ঝাঁসীরাজ্য, চিরদিন ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছে। স্বত্বলোপের মতো একটি বাজে ওজর দেখিয়ে রাজ্যটি অধিকার করা এমন একটি কাজ হল, যা দেশীয় নৃপতি এবং মন্ত্রীদের কাছে একান্ত ঘৃণ্য। ধর্মবিরোধিতার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যও তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য।'

(*Retrospect and Prospect of Indian Policy—Major Evans.*)

'একটি দেশীয়রাজ্যের আয়ু শেষ হলে, কমিশনারের নামে একজন ইংরেজ রাজার স্থল অধিকার করে। তার তিনচারজন সহকারী, দেশীয় রাজকর্মচারীদের বহুজনের স্থান অধিকার করে। এবং দেশীয় রাজারা যাদের পোষণ করেন, সেই হাজার হাজার সৈন্যের স্থান অধিকার করে আমাদের কয়েকশো সিপাহী। ছোট রাজসরকারটি উঠে যায়—ব্যবসা বাণিজ্যে ভাটা পড়ে—রাজধানীর অবনতি হতে থাকে—জনসাধারণ দরিদ্র হতে থাকে এবং ইংরেজের অবস্থা সমৃদ্ধ হতে থাকে—এবং ইংরেজ শুধু শোষণ

করতে থাকে। গঙ্গার তীর থেকে ঐশ্বর্য তুলে নিয়ে টেম্‌সের তীরে জমা করতে থাকে।’

(*A Plea for the Princes of India.*)

১৬-৩-১৮৫৪ সকালের সম্পর্কে একটি মাত্র বইয়ে উল্লেখ আছে—

‘ঝাঁসী অন্তর্ভুক্তির আদেশ নিয়ে যখন এজেন্ট গেলেন, পর্দার আড়ালে বসে রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানালেন। যখন ব্রিটিশ অফিসারটি তাঁকে ঝাঁসী সম্বন্ধে হৃদয়বিদারক সংবাদটি দিলেন, লক্ষ্মীবাঈ উচ্চ অথচ মধুরকণ্ঠে, কয়েকটি অর্থপূর্ণ কথায় তার জবাব দিলেন—’

“মেরা ঝাঁসী দুংগী নহী।”

(*Dalhousies' Administration of British India.*)

তাই দেখা যাচ্ছে, সেদিন নাগপুর, সাতারা বা অন্য রাজ্যসম্পর্কে ঐতিহাসিকরা যে কথা বলেননি, ঝাঁসী সম্পর্কে সে কথা বলেছিলেন।

ঝাঁসীর জনসাধারণের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, বুঝতে তখন তিনবছর বাকি ছিল।

আট

তবু মেনে নিতে হল। ঝাঁসী অন্তর্ভুক্তির ঘোষণায় বজ্রাহত রাণীকে তাঁর গর্বিত উক্তি সত্ত্বেও মেনে নিতে হল সেই সিদ্ধান্ত। কেল্লা গেল ব্রিটিশের অধিকারে।

একদা এই কেল্লা তৈরি করেছিলেন বুন্দেলা নায়ক বীরসিংহ দেব। পশ্চিমঘাট গিরিপর্বতমেখলা-মাতৃভূমি মহারাষ্ট্র ত্যাগ করে উচ্চাভিলাষী বীর প্রথম বাজীরাও মধ্যভারতে রাজ্য পত্তন করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের জীবনে সেদিন প্রভাত এসেছিল। পেশোয়া মাধবরাও-এর হুকুমে ঝাঁসীতে এসেছিলেন রঘুনাথহরি নেবালকর। সেদিন কেল্লার বুরুজে বুরুজে বসেছিল পিত্তলের কারুকার্য্য খচিত কামান। সেই সব কামান থেকে তোপ দাগা হয়েছিল রাণীর বিয়ের দিনে। সেদিন শহরের পথে পথে

আলো, দেউড়িতে দেউড়িতে বাজনা, আঁধার আকাশের বুকে বাজির আলো, আর ঘরে ঘরে উৎসব।

'খুসী মনাও, ধুম মচাও, ঘর ঘর দীপ জ্বলাও।'

এই কেল্লার ভেতরে যে শিবমন্দির আছে, সেখানে ছোটবেলা কতবার পুজো দিতে গিয়েছেন রাণী। তারপর সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর মাঝরাতে যখন তাঁকে ডেকে আনতে গিয়েছেন আত্মীয়ারা তখন সেই শিব মন্দিরে দীপ জ্বেলে ধূপ দিয়ে পুজো দিয়েছেন রাণী। শিবমন্দিরের একান্তে পলাশ গাছে বছর বছর ফাল্গুন চৈত্র মাসে ফুল ফুটেছে। সেই ফুলে সিন্দুরোৎসব করেছেন ঝাঁসীর মেয়েরা, হরিদ্রা কুঙ্কুমের দিনে আনন্দ করেছেন তাঁরা।

কোথায় এখন সেইসব দিন! তাঁর এগারো বছরের বিবাহিত জীবনের কত দিন এখানে কেটেছে। আজও কেল্লার প্রত্যেকটি ঘর দাসীরা প্রতিদিন মার্জনা করে। কেল্লার দেউড়িতে নহবৎখানায় সানাই বাজে ভোরবেলা ভোরাই সুরে। হোলির দিনে ছত্রসাল রাজার রাসো গেয়ে গেয়ে গরীব ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা চাইতে আসে—

'ধরতিপতি ছত্তারাজা জানকীপতি রাম—'

গ্রীষ্মের তপ্ত দীর্ঘ বেলায় মনে হয় সেই সব দিন যেন নির্বাসনে গেল। সেই যুগ যেন এক সাতমহলা বাড়ি। এবার তার ঘরে ঘরে তালা পড়তে লাগল।

এই সময় তিনটি কামান নিয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পুঁতে রেখেছিলেন রাণী। তার মধ্যে কড়ক-বিজলীও ছিল।

একটি রাজ্য যখন পরাধিকারে যায়, তখন অনেক কিছু বাতিল হয়ে যায়। গঙ্গাধররাও-এর নাট্যশালার সখ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। সেই নাট্যশালার সাজসরঞ্জাম আর পোষাক অলঙ্কার বাদ্যযন্ত্র গুলিকে প্রাসাদের ঘরে রেখে তালা দেওয়া হল।

ঝাঁসীরাজের যে সৈন্যসামন্ত ছিল, তাদের যুদ্ধ করবার দরকার হয়নি অনেকদিন। তবু তাদের ব্যস্ততা ছিল নিয়মিত কুচকাওয়াজ অস্ত্রশস্ত্র উর্দি সব ঠিকঠাক রাখার মধ্যে। দীর্ঘদিন পর এবার তাদের তলব পড়ল। তিনমাসের মাইনে হাতে দিয়ে তাদের ছুটি দেওয়া হল। আর তাদের ডাক পড়বে না।

অস্ত্রশস্ত্র উর্দি সব জমা দিতে বলা হয়েছিল। তারা ক্ষুব্ধ হৃদয়ে কিছু জমা দিয়ে, কিছু প্রাসাদের কুয়োতে আর বেতোয়ার জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে সেলাম জানিয়ে গেল তারা।

তাঁর অধিকার থেকে চলে যাচ্ছে সব, অথচ তিনি ঝাঁসীতেই আছেন। হৃদয় ক্ষুব্ধ, মন আহত, নির্নিমেষ অশ্রুহীন দৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন রাণী কেল্লার দক্ষিণ বুরুজ থেকে নাগারা এবং চামর চিহ্নিত ঝাঁসীরাজের পতাকা নেমে এল। ইউনিয়ান জ্যাক উড়তে লাগল নীল আকাশের গায়ে।

সেই সময় বিঠুরে নির্বাসিত পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর বৃত্তিবঞ্চিত দত্তকপুত্র ধুন্দুপন্থ্ নানা বিলেতে আপীল করবার জন্য কানপুরের সরকারী স্কুলের শিক্ষক আজিম উল্লাকে নিযুক্ত করলেন। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অভিজ্ঞ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, উচ্চাভিলাষী আজিম উল্লা নানা সাহেবের আপীল নিয়ে বিলেতে গেলেন ১৮৫৪ সালে। এই যাত্রায় কোন ফল হল না বটে, কিন্তু ইয়োরোপ ভ্রমণকালে আজিম উল্লা রাশিয়া ও ফ্রান্সের শক্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। কনস্টান্টিনোপ্‌লের যুদ্ধে দেখলেন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পরাজিত।

ভারতে যে ইংরেজ প্রবলতম শক্তি, তাকেও যে পরাজিত করা যেতে পারে, সে ধারণা নিয়ে আজিম উল্লা দেশে ফিরলেন। সুদর্শন, তরুণবয়স্ক আজিম উল্লার ১৮৫৭ সালের ভূমিকা বিষয়ে নানা কাহিনী সত্য মিথ্যায় প্রচলিত। সমগ্র বিদ্রোহ তাঁরই বুদ্ধিতে পরিচালিত হয়েছিল, একথা বিশ্বাস করতে অনেকে ভালবাসেন। শোনা গিয়েছে তিনি বিলেতে সুন্দরীদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। হয়তো সবটা সত্যি নয়। তবু আজিম উল্লার সক্রিয় ভূমিকা কিছু কিছু ছিল। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যে ইংরেজ ভারতে এসে পরাক্রমকেশরী, যার সান্ধ্যভ্রমণের সময়ে কালা নেটিভ্‌রা ঘোড়ার গাড়ির সামনে থেকে সরে যায় রাস্তা ছেড়ে, গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে যার আরামের জন্য ১১৫° ডিগ্রী উত্তাপে বসে পাঙ্‌খা চালিয়ে লু লেগে মরে যায় পাঙ্‌খাকুলী, সেই ইংরেজের সম্পর্কে গল্পকথা ভেঙেছিলেন আজিম উল্লা। এখন হাস্যকর শোনাবে,

কিন্তু আজিম উল্লা যখন বলেছিলেন বিলেতে সাহেব মেমরাই রাস্তায় ঝাড়ুদার, স্টেশনে কুলী আর বাড়িতে চাকরাণী, তখন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভারতীয়দের মনে। সাহেবরা যে মানুষ, তারা যে শুধুই শাসক নয়, সে ধারণায় উপকার হয়েছিল।

ফিরে এসে আজিম উল্লা নানাসাহেবের সঙ্গেই থাকলেন।

নানা সাহেবের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে রাণীকে কেউ কিছু বলেছিলেন কি না কে জানে। রাণী কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরসের কাছে আপীল করবার সিদ্ধান্ত করলেন।

সেই দিনেও সুদূর ঝাঁসীতে কয়েক ঘর বাঙালী পরিবার বসতি স্থাপনা করেছিলেন। সঁইয়ার গেট মহল্লা অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন একটি মুখোপাধ্যায় পরিবার। বাঙালী পরিবারটির মাধ্যমে বাংলাদেশের আইনজীবী বাবু উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে রাণীর। বিলাতে যাবার খরচ ইত্যাদির জন্য উমেশচন্দ্র ব্যানার্জিকে রাণীর তরফ থেকে ৬০,০০০৲ টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু এই আপীলের কোন জবাব রাণী পাননি।

এই উমেশচন্দ্র বাংলার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি নন। রাণীর পৌত্র শ্রীলক্ষ্মণরাও ঝাঁসীওয়ালের ভাষণে জানা যায়, সত্যই জনৈক উমেশ ব্যানার্জি নামে বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টার রাণীর কাছ থেকে ৬০,০০০৲ টাকা নিয়ে চলে যান এবং তারপর তাঁর পক্ষ থেকে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তাঁর পিতা দামোদররাও বিলেতে আপীল করে খাজগী সম্পত্তি উদ্ধার করবার প্রয়াস করেছিলেন। সেই সময় তিনি জানতে পারেন যে, বিলেতে সত্যই রাণীর আর্জি পৌঁছেছিল। অর্থাভাবে দামোদর-রাও-এর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। তবে দামোদররাও লক্ষ্মণরাওকে বার বার বলেছিলেন, "১৮৫৭-র লড়াই বেধে গেল। সেই লড়াইয়ে রাণী যোগ দিলেন, কাজে কাজেই তাঁর আর্জি বা আপীল নাকচ হয়ে গেল। বাঙালী বাবুটি শুধু টাকা নিয়েই থেমে যাননি, কিছু কাজও করেছিলেন। কিন্তু বাঙালীবাবুরা ইংরেজের পক্ষের লোক ছিলেন। ১৮৫৭ সালের লড়াইয়ে রাণী যোগ দিলেন এবং খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশের বিরোধিতা করলেন। তাঁর পক্ষ টেনে আপীলের কথা তুলতে বাঙালীবাবুটির

ভরসা হয়নি। রাণী মারা গেলেন বলে প্রসঙ্গটিও চাপা পড়ে গেল।"

কাজেই মনে হয়, রাণী আপীল করেছিলেন ঠিকই। তাঁর নিযুক্ত বাঙালী বাবু কে, তা সঠিক নিরূপণ করা সম্ভব নয়। প্রবাসী বাঙালী পরিবারগুলির কথা যাঁরাই জানেন তাঁরাই খবর রাখেন যে, ১৮৫৭—৫৮ নয়, তার অনেক আগে থেকেই কৃতবিদ্য বাঙালীরা সুদূর প্রবাসে চাকরি ও ব্যবসার খাতিরে গিয়েছিলেন। বাইরে বাঙালীর তখন প্রচুর সমাদর ছিল। রুড়কী কলেজের দ্বিতীয় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ঝাঁসী আক্রমণের সময় সাহায্য করেছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত বাঙালী ব্যারিস্টার নিজে ঝাঁসীতে এসেছিলেন কি না জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ সেই বাঙালী পরিবারটির মাধ্যমেই যোগাযোগ স্থাপনা হয়েছিল। ব্যারিস্টার ভদ্রলোকের হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর সমস্ত ঘটনাটির রং গেল বদলে। তখন যে কোন বাঙালী ব্যারিস্টারের পক্ষে ১৮৫৭ সালের পর বিদ্রোহের প্রকাশ্য নেত্রী ঝাঁসীর রাণীর আপীল সম্পর্কে কথা না বলে সুবোধজনের মতো নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে থাকাই স্বাভাবিক।

আপীলের কোন জবাব এল না। ম্যালকম ডালহৌসীকে প্রতি চিঠিতে ঝাঁসীরাজের আশ্রিত এবং অনুগত ব্যক্তিদের যথাযথ সাহায্য দানের সুপারিশ করেছিলেন। রাণী যাতে গঙ্গাধররাও-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি 'খাজগী দৌলতী' পান, সে অনুরোধও ছিল। কার্যকালে ডালহৌসী রাণীকে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি দেওয়া ছাড়া অপর কোন আর্থিক সাহায্য বা প্রতিশ্রুতি দিলেন না।

রাণী প্রথমে এই বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর এই আশঙ্কা কখনই হয়নি যে, ডালহৌসী তাঁকে তাঁর স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করতে পারেন।

গঙ্গাধররাও-এর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে পারোলা, পুণা ও কাশীতে বাড়ি, অর্থ এবং অলঙ্কার ছিল। ডালহৌসী এইবার রাজনীতিক কূট পন্থা ধরলেন। তিনি ম্যালকমকে জানালেন, দামোদররাওকে দত্তক গ্রহণের কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই। দামোদররাও কোনদিনই ঝাঁসীর রাজা হতে পারবেন না। কিন্তু

তাই বলে ডালহৌসী হিন্দুধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী এই দত্তক পুত্রের সামাজিক বৈধতা অস্বীকার করতে পারেন না।..."I apprehend that it is beyond the power of the Government so to dispose of the property of the late Rajah, which by-law will belong to the son whom he adopted. The adoption was good for the Conveyance of private rights, though not for the transfer of the Principality." (Minute by Dalhonsie 25. 3. 1854).

দামোদররাও গঙ্গাধররাও-এর পুত্র। তাঁর শ্রাদ্ধ, মৃতাশৌচ, তর্পণ ইত্যাদিতে দামোদরের পূর্ণাধিকার আছে। 'খাজগী দৌলতী'ও অতএব দামোদরেরই প্রাপ্য। রাণীর তাতে কোন অধিকার থাকতে পারে না। দামোদর যতদিন নাবালক থাকবেন, ততদিন সেই খাজগী থাকবে ইংরাজের তত্ত্বাবধানে।

গঙ্গাধররাও-এর গৃহীত দত্তক দামোদররাওকে রাজনীতিকভাবে অবৈধ ঘোষণা করে ইংরাজ ঝাঁসী গ্রহণ করে এবং সামাজিকভাবে বৈধ স্বীকার করে নাবালকত্বের সময়ে সম্পত্তিতে তার অনধিকার এবং রাণীর চির অনধিকার ঘোষণা করে। এই দুই মুখো নীতির সম্পূর্ণ গুরুত্ব রাণী উপলব্ধি করলেন। উপলব্ধি করেই পুত্র এবং বিশাল আশ্রিত আত্মীয়গোষ্ঠীর মুখ চেয়ে তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তি স্বীকার করতে হল। সেই অভিমানী গর্বিত হৃদয় সেইদিন চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে প্রথম উপলব্ধি করলেন, ইংরাজ তাঁর শত্রু। তাঁর পিতা ও বিমাতাকে তিনি সেদিন থেকে বারবার বলেছেন, ইংরাজ আমার শত্রু—আমার পরম শত্রু। রাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ ম্যালকম এই সময়ে এলিসকে জানালেন, ১৫ই মার্চ থেকে ৩০শে এপ্রিল,—এই দেড়মাসের সম্পূর্ণ রাজস্ব যেন ঝাঁসীরাজকোষেই জমা পড়ে। এই টাকা থেকে রাণী তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বগুলি কিছু কিছু মেটাতে সক্ষম হবেন।

ম্যালকম এবং এলিসের হাত থেকে ঝাঁসীর শাসনভার গ্রহণ করলেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরের অধীনে জব্বলপুরের মেজর এরস্কাইন (Major Erskine)। তিনি নর্মদা, সাগর ও জব্বলপুর ডিভিশনের কমিশনার ছিলেন। ঝাঁসীতে একজন জেলা

কমিশনার থাকবার কথা। এলিস এই পদে থাকলে রাণী ও ঝাঁসীবাসী কিছুটা উপকৃত হতে পারতেন। কিন্তু এলিসকে বদলী করা হল পান্না রাজ্যে। কমিশনার হলেন ক্যাপ্টেন স্কীন (Captain Skene)।

চার বছর বাদে পুনর্বার এলিস এবং রাণীর যোগাযোগ ঘটেছিল। সেই পরোক্ষ সাক্ষাৎ কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে নয়। তখন ইংরাজ ও ভারতীয় দুই শিবির বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। সেটা ১৮৫৮ সাল। ইংরাজ এলিস হিউরোজের সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলেছিলেন।

রাণীর পরবর্তী জীবনের ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের যদি কোন মানসিক প্রস্তুতি থেকে থাকে, সেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এই সময় থেকে। ভাগ্যবিপর্যয়ে মানুষের পরীক্ষা হয়। মাতা ও পিতার স্নেহাশ্রয়ে লালিত শিশু, অনাথ হলে একদিনেই আশ্চর্য নিয়মে অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের একেশ্বরী রাণী লক্ষ্মীবাঈ বিধবা হলেন, রাজ্য হারালেন। তাঁর অনেক ছিল, মুহূর্তে জানলেন আজ আর কিছু নেই। স্বামীর আশ্রয়চ্যুত হয়ে জানলেন, শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই নয়, একেবারে চূড়ান্তভাবে অনাথ হয়েছেন তিনি। এই চরম অবস্থার জন্য দায়ী কে? কোন্ ভাগ্যবিধাতাকে দোষ দেবেন তিনি? শঙ্কিত হৃদয়ে আবার কোন্ বিধাতার মার্জনা ভিক্ষা করবেন? তিনি জানলেন, তাঁকে নিরাশ্রয় করল ইংরাজ। যে বালককে রাজসিংহাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চিরতরে মায়ের কোল থেকে এনেছেন, জানলেন, সেই বালক পুনর্বার অনাথ হল। জানলেন, তাঁর স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁর অধিকার নেই। জানলেন, স্বামীর মরণান্তে তীর্থস্থলে গিয়ে কেশ মুণ্ডন করবার যে ইচ্ছা ছিল তাঁর তা সফল হবে না। কেননা, তাঁকে ঝাঁসীর বাইরে যেতে দিতে আপত্তি আছে ইংরাজের। জানলেন, আজ থেকে ঝাঁসীতে তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার নেই। স্বচ্ছন্দ বিহারে ক্ষণে ক্ষণে নতুন মালিকের সম্মুখীন হতে হবে।

গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্নে যখন উজ্জ্বল নীল আকাশে স্থিরপক্ষ চিল ভাসে, যখন নির্জনে প্রান্তরে রৌদ্রতপ্ত বাতাস মরীচিকা-

মায়ায় কাঁপে, তখন যে-প্রকৃতি রুক্ষ, নিঃস্ব ও গৈরিক-বসনা হয়ে নির্নিমেষ জাগে, তাঁর সঙ্গে রাণীর অন্তরের কি কোন মিল আছে! গৃহবধূ, রাজার রাণী, যাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব গৃহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, তাঁর উপর বারবার আঘাত পড়ল,—অজান্তে তাঁর প্রকৃতি পরিবর্তিত হতে লাগল। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে রাণী চেষ্টা করলেন ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করতে।

এই সময়ে প্রত্যহ তিনি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করতেন। স্নানান্তে মাটি দিয়ে শিব গড়ে আটটা অবধি শিবপূজা করতেন। আটটার সময়ে দামোদরের প্রাতরাশ, গৃহশিক্ষকের কাছে পাঠশিক্ষা ইত্যাদির তত্ত্বাবধান করে ঘোড়া চড়ে বেরুতেন। আটটা থেকে এগারটা অবধি অশ্বারোহণ করে ফিরে এসে পুনর্বার স্নান করতেন। তারপরে আহার করে, সামান্য বিশ্রামান্তে, বেলা তিনটে অবধি ছোট ছোট কাগজে রামনাম লিখে, এগারশ' কাগজ আটার মণ্ডে ভরে কুণ্ডের মাছকে খেতে দিতেন। প্রবল উৎসাহে দামোদর মা-কে এই কাজে সাহায্য করতেন। সন্ধ্যাবেলা আটটা অবধি তিনি পুরাণ ও কীর্তন শুনতেন। এই সময় মোরোপন্ত তাম্বে সমভিব্যাহারে বিভিন্ন বিশিষ্ট নাগরিকরা রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। সাড়ে আটটায় স্নান পূজা সমাপন করে, আহারান্তে নিদ্রা যেতেন রাণী।

পণ্ডিত, শাস্ত্রী, গুরু ও আচার্য প্রত্যেকেই রাণীকে বলতেন, ধর্মকর্মে ব্যাপৃত থাকো, ভাবনা চিন্তা ঈশ্বরকে সমর্পণ কর।

কিন্তু এই নির্বেদ সাধনায় তাঁর শান্তি ছিল না। মন যেন সেই মন নয়। মন শুধু যাচাই করে বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। এ-হৃদয় আজ সেই হৃদয় নয়। সে শান্তি চায় না—নির্বিচারে ভাগ্যের বিধান মানতে চায় না। মন শান্ত হোক, হৃদয় নির্লিপ্ত হোক। শান্তি আছে পূজায়, তপে, জপে! অবাধ্য মন বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে শিখুক ভাগ্যের বিধানকে।

কিন্তু পুনর্বার কারণ ঘটল ধ্যান ভঙ্গের।

এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর কোল্‌ভিন (Colvin) হিসেবনিকেশ খতিয়ে বের করলেন, পূর্বতন ঋণের জন্য ৩৬,০০০৲ টাকা আজও ঝাঁসীরাজের কাছে পাবেন তাঁরা। এই

ঋণ একদা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন রামচন্দ্ররাও, যখন বিক্ষুব্ধ রাজপুত সর্দাররা, বামে দতিয়া আর দক্ষিণে অরছা রাজ্যের নির্দেশে 'ভূমিয়াবৎ' জাহির করে পুরো রাজ্য তোলপাড় করে ফেলেছিলেন। সেদিন লুণ্ঠনে চাষীর গোলা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্ন ছিল না তাদের ঘরে। দলে দলে কিষাণ এসে প্রাসাদের বাইরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আরজি জানিয়েছিল—'অন্নদাতা কিরপা হোই—জীউদাতা কিরপা হোই'। সেদিন পরদুঃখকাতর হয়ে তরুণ রাজা রামচন্দ্ররাও প্রথমে গিয়েছিলেন মা সখুবাঈ-এর কাছে। পুত্রের পদলাভে হিংসাকাতর মা সখুবাই নিজের প্রিয় পারিষদ গঙ্গাধর মুলের সাহায্যে রাজকোষ শূন্য করে অর্থ ও ধনরত্ন চালান করে দিয়েছিলেন কন্যার ঘরে। পুত্রের আবেদনে কর্ণপাত করলেন না তিনি। সুন্দরী, গর্বিতা এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী প্রৌঢ়া সখুবাঈ, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি বিস্মৃত হয়ে পুত্রের মৃত্যু কামনা করছিলেন নিরন্তর। সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘরে রামচন্দ্ররাও দেখলেন মায়ের মাথার হীরেখানা যেন সাপের মাথার মণির মতো জ্বলছে। সভয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। অর্থ চাই, কিন্তু অর্থ নেই। রাজ্যভরা মানুষ যদি ক্ষুধায় কেঁদে গেল, তা হলে রাজসিংহাসন হাতে পেয়ে কি ফল হল! কি হবে প্রজাচিত্তরঞ্জন দশরথনন্দনের নামের অবমাননা করে? রামচন্দ্ররাও ঋণ করেছিলেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই ৩৬,০০০৲ টাকা তারই অবশিষ্ট। কোল্‌ভিন রাণীকে জানালেন, এই টাকা মাসিক বৃত্তির থেকে কিস্তিতে কিস্তিতে কাটা যাবে।

বৃথাই রাণী বারবার জানালেন, তাঁর পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তির থেকে কোন টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। জানালেন, যখন ঝাঁসীরাজ্য গ্রহণ করেছেন সরকার তখন রাজ্যের দায় এবং ঋণও তাঁরাই গ্রহণ করেছেন। জানালেন, তাঁর একলার পক্ষে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যাপ্ত। কিন্তু তাঁকে ঘিরে বাঁচছে একটি বৃহৎ আশ্রিত গোষ্ঠী। তাদের প্রতিপালন করে এই টাকার কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না তাঁর। সমগ্র আশ্রিত মণ্ডলীকে প্রতিপালন করবার দায়িত্ব তাঁর-ই। কোল্‌ভিন কোন কথা শুনলেন না।

সেদিন সেই ছত্রিশ হাজার টাকা ছেড়ে দিলে দেউলে হয়ে যেত না রাজকোষ, অসুবিধা হত না সরকারের। ভ্রান্ত নীতির

অনুশাসনে নিজেদের পাওনা আদায় করতে লাগলেন কোল্‌ভিন। কিন্তু অন্যত্র তাঁদের খাতায় লাভের ঘরে ক্ষতি জমতে লাগল।

কোল্‌ভিনের এই আচরণের প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী হয়েছিল। তাই T. Rice Holmes বলেছেন—

'If the Govt. had not called upon her to pay her Late husband's debts from her pension, meagre 6,000 a year, Central India would never rise.

'যদি বছরে সেই তুচ্ছ বৃত্তির ৬০০০ পাউণ্ড থেকে তাঁর পরলোকগত স্বামীর পূর্বঋণ গভর্নমেণ্ট কেটে না নিতেন, তাহলে মধ্যভারতে অভ্যুত্থান ঘটত না।' (T. Rice Holmes—Hist. of IND. Mutiny.)

Kaye and Malleson বলেছেন—

"তাঁরা যা করলেন, তা আরো খারাপ। অপমানের সঙ্গে তাঁরা নীচতাও যোগ করলেন। রাজ্য বাজেয়াপ্ত করবার সময় বিধবা রাণীকে তাঁরা বাৎসরিক ৬,০০০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর করেছিলেন। প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও শেষ পর্যন্ত রাণী সেই বৃত্তি গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন। যে বৃত্তিকে তিনি নেহাত তুচ্ছ মনে করতেন, তা থেকেই যখন তাঁর পরলোকগত স্বামীর ঋণ শোধ করতে বলা হল, তখন তাঁর ক্রোধ সহজেই অনুমেয়। যে ব্যবহারকে তিনি অপমান ও মিথ্যাচরণ মনে করলেন, তার বিরুদ্ধে তাঁর সমস্ত প্রতিবাদই কিন্তু ব্যর্থ হয়ে গেল। বৃথাই তিনি বারবার জানালেন, তাঁকে বঞ্চিত করে রাজ্য গ্রহণ করবার সময়ে ঋণের দায়িত্বও গ্রহণ করেছে ইংরাজ। মিঃ কোল্‌ভিন জোর করে সেই ঋণ বৃত্তি থেকে কেটে নিতে লাগলেন।"

ভারত শাসন করতে যে সব ইংরেজ এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন সুধী। ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্ধারে, জনসাধারণকে জানতে তাঁরা সাহায্য করে গিয়েছেন। শ্লীম্যান এবং টড দু'জনেই ছিলেন রাজকর্মচারী। কিন্তু তুলনা করলে মনে হবে, তাঁরা ছিলেন ব্যতিক্রম। সে সময় ভারতবর্ষে সেইসব ইংরাজদেরই আমদানী করা হয়েছিল, যাঁরা জানতেন আমরা রাজার জাত। বিজিত দেশের রীতিনীতি, আচার নিয়ম এবং ধর্মের প্রতি তাঁদের

এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরাজ মিশনারীরা সর্বত্র ঘুরে ঘুরে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে বেড়াতেন। পথ চলতে চলতে মন্দিরে দেবমূর্তি দেখে উল্লসিত চিত্তে মেমসাহেব নেমে গিয়ে তুলে নিতেন সেই মূর্তি।

সম্ভবতঃ সেই কারণেই ক্যাপ্টেন গর্ডন ও স্কীন, ঝাঁসীর গৃহদেবতা মহালক্ষ্মী মন্দিরের ব্যয় নির্বাহের জন্য উদ্দিষ্ট দেবত্র গ্রাম দুইখানি বাজেয়াপ্ত করলেন। জানালেন, নিরর্থক পুতুল পূজায় অর্থ ব্যয় করা বিলাসিতা। এই স্পর্ধিত আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানালেন রাণী। স্কীন অবিচলিত। তিনি জানালেন, 'Your God is our responsibility.' যে ইংরাজ ঝাঁসী অধিকার করেছে, দেবতাও তাদেরই অধিকারে। পূজা বন্ধ করবার অধিকারও তাদের আছে।

বন্দিনী ভুজঙ্গিনীর মতো রাণী নিষ্ফল আক্রোশে একবার কাঁদলেন। তারপরে চুপ করলেন।

এই দুঃসংবাদে নগরের সর্বত্র মহাদুঃখ সঞ্চারিত হল। শাস্ত্রীরা দুঃখ করতে লাগলেন, পুরনারীরা বলাবলি করতে লাগলেন, ঘোর অমঙ্গলের সূচনা হল। রাণী চুপ করে রইলেন।

সেই দিন থেকে মহালক্ষ্মীর মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ আর জ্বলল না। চৌঘড়া বাজল না। নহবৎখানায় দীন-দুঃখী, গরীব, সন্ন্যাসী, সাধু সকলে বিদায় নিল বিতাড়িত হয়ে। কতজন এসে রাণীকে বললেন, পুনর্বার প্রতিবাদ জানান হোক। রাণী নীরবে অসম্মতি জানালেন।

এই সময় ঝাঁসীতে, সামরিক বে-সামরিক মিলিয়ে প্রায় আশীজন ইংরেজ ছিলেন। ইংরেজরা মাংস খেতেন। প্রয়োজন বুঝে স্কীন শহরের মধ্যে একটি কসাইখানা বসালেন।

নতুন দুঃসংবাদে মর্মাহত হল নগরবাসী। রাণী স্তম্ভিত হলেন। নগরীর বুকে বসেছে কসাইখানা। সেখানে গরু ও শূকর হত্যা করছে কসাই। মাংস যাবে সামরিক ছাউনিতে।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে অনুভব করল, তাদের ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার ও ঐতিহ্যকে অপমান করা হয়েছে। শুধু মাংসের প্রয়োজনে হত্যা-ই করেনি তারা, নিহত পশুর রক্তাক্ত চামড়া ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে বাঁকে করে খোলা রাজপথ দিয়ে। অপমানিতা

রাণী প্রতিবাদ জানালেন এবং দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যাতা হলেন। সর্বত্র এই অপ্রীতিকর বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। রাজনীতিক সচেতনতা যে সব সরল মানুষের মধ্যে ছিল না, তাদেরও সচেতন করল ইংরাজ। তারাও বুঝল, এই জাতির এতটুকু শ্রদ্ধা নেই আমাদের রীতিনীতি বিশ্বাসের ওপর।

এই সব ব্যবহারে সাধারণ মানুষ বুঝেছিল, ইংরাজ তাদের বিরোধী। এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল অভ্যুত্থানকারীরা তিন বছর বাদে। ইংরেজ যে শত্রু, এই কথা বোঝাবার জন্য এই নজীরগুলিই ছিল যথেষ্ট।

এর থেকে সেদিনকার শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক বোঝা যায়। ১৮৫৭ সালের আগেই সমগ্র ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজরাজ।

সুবিশাল জল, জঙ্গল, পর্বত, গ্রাম, জনপদ, মরুভূমি সম্বলিত ভারতভূমির সেদিনও নিজস্ব শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা এবং ঐতিহ্য ছিল। ছিল না শুধু স্বাধীনতা। ইংরেজ শাসনের নাগপাশে সেদিনকার ভারতবর্ষ রুদ্ধশ্বাস। নিজেদের প্রয়োজনে ইংরাজ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতি এনেছিল, যা ছাড়া অবশ্য আজকের দুনিয়া সম্ভব হত না। কিছু কিছু সমাজসেবী ভারত-হিতৈষী ইংরাজের দৃষ্টান্ত বাদ দিলে বোঝা যায়, ইংরেজের প্রচেষ্টার মূলে ছিল ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্রগত স্বার্থ। অবশ্য জ্ঞান সর্বদা কল্যাণ আনে, বিজ্ঞান উন্নত করে সভ্যতাকে। তাই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই হোক বা হিতৈষণার উদ্দেশ্যেই হোক, শিক্ষা তার স্বীয় গরিমায় সার্থক হয়ে উঠেছিল আমাদের দেশে।

ভারতবর্ষে শাসন করতে এসে দেশের মানুষগুলির প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা ছিল না শাসকগোষ্ঠীর। অতিসহজে তাঁরা উপেক্ষা করতেন ভারতবাসীর মতামতকে। তাই বিজ্ঞানের বহু নতুন নতুন দানে সেদিনকার মানুষ কোন কল্যাণ কামনা দেখেনি। তারা শুধু দেখছিল এমনি করে ক্রমেই চেপে বসছে বিলিতী ফাঁস। তাই তাদের মনে জমছিল আক্রোশ। কিন্তু সে সম্বন্ধে এতটুকু অবহিত ছিলেন না সরকার। স্থবির সামন্ততান্ত্রিক ভারতবর্ষ তখন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট গতিশীল ছিল না। কিন্তু তাঁদের

ছিল গতির প্রয়োজন। তাই অর্থনীতিক বনিয়াদ করতলগত রেখে চাপ দিতে লাগলেন তাঁরা। রথের চাকা নড়ল।

চাকাটা একবার চলতে শুরু করলে যে অনেক ভেঙেচুরে শেষ পর্যন্ত না গড়িয়ে থামবে না, তা বুঝতে পারেননি সরকার। বুঝতে পারলে সময়ে সচেতন হতেন। কলমের খোঁচায় চোদ্দ কোটি ভারতবাসীকে সবরকম অধিকারে বঞ্চিত করে, খস্‌খসের পর্দায় খাসা গুলাবপানি ছিটিয়ে খুস্‌বুতে দিল্ মশ্‌গুল করতেন না। খোলা বারান্দায় বিয়ারের বোতল খড়ের মোড়কে ঝুলিয়ে রেখে, জল ছিটিয়ে ঠাণ্ডা করে সন্ধ্যাবেলা এক চুমুকে পান করে বুঁদ হয়ে বসে বসে সময় কাটাতেন না। কি আনন্দেই কেটেছে দিন! মাইনে যদি মেলে একশ' টাকা, দেশে পাঠান যায় পাঁচশ' টাকা। অবিচ্ছিন্ন শান্তি। অফুরন্ত সুখ।

শাসিত জনসাধারণের প্রতি বর্ণ এবং সভ্যতার গরিমাজনিত ঔদাসীন্য ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠেছিল। ঝাঁসীতে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে মহালক্ষ্মী মন্দিরের নির্দিষ্ট দেবত্র সম্পত্তি অধিকার এবং প্রকাশ্যভাবে নগরীতে পশু হত্যা তার একটুখানি নিদর্শন মাত্র। এই সম্বন্ধে কে. ও ম্যালিসনের মন্তব্য স্মরণীয়—

> 'হিন্দু নাগরিকদের মধ্যে গো-হত্যা, মন্দিরের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি ও বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা, এই কারণগুলি, মালিক বদলের জন্য অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মনে উত্তাপ সঞ্চার করেছিল।
>
> কিন্তু ব্যক্তিগত অপমানই হচ্ছে প্রধান কারণ, যা রাণীকে প্রতিশোধ নেবার জন্য একটি অপেক্ষমান ক্ষমাহীন শত্রুতে পরিণত করেছিল'।
>
> (কে. ও ম্যালিসন তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২০-২১)

কিন্তু কোন ব্যক্তিগত অপমানই চূড়ান্ত হয়নি এতদিন। ১৮৫৫ সালে দামোদরের বয়স হল সাত। তাঁর উপনয়ন দেবার জন্য ব্যস্ত হলেন রাণী। দামোদরের জন্য তাঁর মনে দুঃখের অবধি ছিল না। আর দশটা বালকের মতো দামোদরও হেসে খেলে আনন্দে দিন কাটাতেন। রাণীর কাছে তিনি ছিলেন আনন্দ স্বরূপ। রাণী তাঁকে প্রায়ই বলতেন, 'আনন্দ, তুমিই আমার দুঃখের দিনে আনন্দ।' সকালে ও বিকালে মৌলবী এবং শাস্ত্রী এসে দামোদরকে ফারসী ও সংস্কৃত পড়ান। অতি প্রত্যূষে ঘুম থেকে উঠে

চোখ বুজে তাঁকে মন্ত্রোচ্চারণ করতে শেখান রাণী। খাওয়ার সময়ে শুধু মিষ্টি খেতেন বলে কড়াকড়ি ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। দরজা বন্ধ করে তাঁকে বুঝিয়েছেন রাণী, সব রকম জিনিস না খেলে শরীরে শক্তি হবে না,—সিদ্ধবক্সের পিঠে চড়া বা ঘোড়া চালান কিছুই হবে না। লাড্ডু থেকে মেওয়া খুঁটে খুঁটে খেতেন বলে একদিন চটে গিয়েছিলেন রাণী। বলেছিলেন—'খেতে হলে সবটুকু খাবে, না হলে খাবে না। ও-রকম বাড়াবাড়ি কর না।' তাছাড়া অনেক কথা তাঁকে বোঝাতেন রাণী। তাঁকে নাকি মানুষ হতে হবে। ইংরেজের সঙ্গে কাগজে কলমে লড়তে হবে। বিলেতে বড় বড় আর্জি পাঠাতে হবে। এ-সব কাজ সম্ভব হবে কিনা কে জানে! ফৌজী প্যারেডের সময়ে একদিন দামোদর দেখেছেন, ফিরিঙ্গীরা কি চমৎকার দেখতে। ঝক্‌ঝকে বেয়নেট, লাল নীল জামা, টক্‌টকে রঙ। আবার সম্প্রতি তাঁর দাদামশাই মোরোপন্ত তাঁকে বলে গিয়েছেন উপনয়ন হবে। তখন অনেক কিছু পাওয়া যাবে। ধুমধাম হবে।

উৎসবের কথা ভাবতে লাগলেন রাণী। কত আশ্রিত, কত দরিদ্র, কত অনুগৃহীত। এই উপলক্ষে তাদের কিছু কিছু দেওয়া যাবে। রাজা গঙ্গাধরের প্রিয় নাট্যশালা বন্ধ হয়ে রয়েছে। সাজ-পোশাকগুলো আছে মলখানের তত্ত্বাবধানে। নাচনেওয়ালী মোতি না কি আজকাল উদাসচিত্ত হয়ে গিয়েছে। ভজন গায় আর স্নান করতে যায় লছমীতালে। তবলা, মৃদঙ্গ যন্ত্রগুলোয় ধুলো পড়েছে। সেই নাট্যশালার কয়জনকেও সাহায্য করা যায়।

আজ যদি গঙ্গাধররাও থাকতেন তাহলে দামোদরের উপনয়নে কত ধুম হত, কত বাজি পুড়ত, কত মানুষ নিমন্ত্রণ পেত, দীন দুঃখী পেত কাপড়, কম্বল। সে সব দিন তো আর আসবে না। আর কখনও সান্ধ্যপ্রসাধন সেরে চন্দনকাঠের চৌকিতে বসবেন না রাণী, আধো আধো মিঠেমিঠে বোলিতে গুন-গুন গান গেয়ে গেয়ে তাঁর হাতে কুঙ্কুমের সুহাগকমল আঁকবে না কাশী। খোঁপা ঘিরে জুঁইফুলের কুঁড়ির মালা আতপ্ত সন্ধ্যায় একটি একটি করে ফুটবে না। সমস্তদিন উপবাসী থেকে গোধূলিতে সুবর্ণ তাঞ্জামে চড়ে মহালক্ষ্মীর

মন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে ক্ষণিক উদাস হয়ে পশ্চিম দিগন্তের দিকে চেয়ে মন্দিরের নহবৎখানায় সানাই শোনার দিন বিগত। তবে আর কোন কথা বাকী রইল, আর কোন দিনের প্রতীক্ষা করবেন রাণী!

বালক দামোদরের উপনয়নের কথা ভেবে রাণী পিতার সাহায্যে একটি তালিকা প্রস্তুত করলেন। অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় টাকা? ঝাঁসীর রাজকোষে ছয় লক্ষ টাকা আছে দামোদরের নামে। তাছাড়া আছে সোনা এবং জহরৎ। তার থেকে কিছু নিলেই চলে যাবে। স্মরণ থাকতে পারে যে, গঙ্গাধররাও-এর এই ব্যক্তিগত টাকাও খাজগীদৌলতী রাণীকে দেবার জন্য ম্যালকম বারবার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু ডালহৌসী তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সেই টাকা থেকে এক লক্ষ টাকা চেয়ে পাঠালেন রাণী আর সঙ্গে পাঠালেন একখানি বিশদ তালিকা যার থেকে তাঁর আবেদনের যৌক্তিকতা বুঝতে পারেন সরকার।

তিনি জানালেন, এই অর্থ থেকে তাঁকে অনেক প্রার্থী, অনুগৃহীত এবং আশ্রিতকে দিতে হবে। জানালেন, রাজকোষের সাহায্যের ভরসায় দেবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর পিতৃপুরুষরা। সেখানেও আশ্রিতমণ্ডলী আছে। সাধারণভাবেই ব্যয় নির্বাহ করবেন তিনি, তবু প্রয়োজন এক লক্ষ টাকা।

কিন্তু সরকার তা মানলেন না। কোল্‌ভিন জানালেন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা অত্যধিক। এই টাকা বালক দামোদরের প্রাপ্য। তিনি যেদিন সাবালক হবেন, সেদিন যদি এই প্রশ্ন করেন যে, তাঁর প্রাপ্য টাকা তাঁর মাকে কেন দেওয়া হয়েছিল? এ হল গচ্ছিত টাকা বা Trust money। এই টাকা থেকে কিছু দিলে বিশ্বাস ভেঙে যাবে দামোদরের।

এই কথা জেনে রাণী মর্মাহত হলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত ঝাঁসীর ধনীশ্রেষ্ঠ কয়েকজন লোক বারবার টাকা দিতে চাইলেন। তাঁরা জানালেন, দামোদরের উপনয়ন ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারলে তাঁরা আনন্দিত হবেন। এই অর্থকে যেন ঋণ বলে ধরা না হয়। যে রাজের নিমক তাঁরা খেয়েছেন, এ তারই প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। রাণী সম্মত হলেন না। তাঁর নিজের টাকা

রয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি অপরের অর্থ গ্রহণ করবেন কেন? তবে তাঁদের সাহায্য তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাঁরা যদি ঐ টাকার জামিন থাকেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। তিনি সরকারকে জানালেন—'যদি কোনদিন ভবিষ্যতে দামোদররাও এই এক লক্ষ টাকা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন, তাহলে নিম্নে স্বাক্ষরকারী পাঁচজন জামিনদার প্রত্যেকে ঝাঁসীর মুদ্রামূল্যে কুড়ি হাজার সিক্কা টাকা হিসাবে দামোদরকে দেবে।'

এই পত্রে সই করলেন মোরোপন্ত, জয়পুরওয়ালা, লক্ষ্মীচাঁদ এবং আরও দুইজন।

এঁরা জামিন হলে পর টাকা ধার দিলেন সরকার। অন্তরে প্রজ্বলিত অপমানের বহ্নি নিয়ে কর্তব্য সমাপন করলেন রাণী। অভিভাবকশূন্য নিঃসহায় অবস্থা তাঁর। কর্তব্য সুসম্পাদন করবার দায়িত্বও তাঁরই।

উপনয়নের সমস্ত কাজ শেষ হলে, গভীর রাতে জানলা দিয়ে দেখলেন শীতের আকাশে কুয়াশাম্লান জ্যোৎস্না। উত্তুরে বাতাসে উড়ছে ব্রিটিশ পতাকা। দেখে ঘরে এসে তাঁর নিজস্ব শ্রীমদ্ভাগবত গীতাখানির রেশমী প্রচ্ছদের পেছনে সাদাপাতায় ছোট ছোট অক্ষরে লিখলেন 'স্মরণে থাকবে'।

আজন্ম ভাগ্যবাদে বিশ্বাসী লক্ষ্মীবাঈ সেইদিন থেকে ভাগ্যের সঙ্গে বাজি ফেললেন। একদা শৈশবে যে ভাগ্য তাঁকে রাণী করেছিল, প্রথম যৌবনে সেই ভাগ্যই তাঁকে বিদেশী ও পরস্বাপহারী শত্রুর হাতে বারবার লাঞ্ছিত করছে। দেখা যাক একবার, ভাগ্যকে রাশ টেনে মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায় কিনা। সঙ্কল্প নিয়ে তিনি তাকিয়ে থাকলেন সেই দিনের দিকে। কোথাও যেন কি ঘটে যাচ্ছে। কেন যেন আকাশে বাতাসে সর্বত্র অস্থিরতা। দিন যেন শুধু সংখ্যায় গোণা প্রহর সমষ্টি মাত্র নয়। দিন যেন প্রাণবন্ত। সে যেন কথা কয়।

দিন থেমে নেই, দিন এগিয়ে আসছে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদেশী শাসকের ধ্বজা সুদৃঢ় আশ্বাসে প্রোথিত। তার লক্ষ লক্ষ মানুষ অসহ্য অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হয়ে একটি মহান প্রতিবাদের অগ্ন্যুৎপাত আসন্ন করে তুলছে তিলতিল করে। চূড়ান্ত মোকাবিলা হবে রাজায় প্রজায়। সমাসন্ন সেই ভয়ঙ্কর দিন প্রচণ্ড

গর্জনে এগিয়ে আসছে। আগামীদিনের সেই পদধ্বনি এগিয়ে আসতে আসতে একদিন ঘা দেবে ঝাঁসীর কেল্লার লৌহকপাটে। সেইদিন বোঝা যাবে রাণী নিরামিষ-ভোজী, ধর্মকর্মে ব্যাপৃতা, ইংরেজরাজের দয়াতে কৃতজ্ঞত-বিগলিত চিত্তা, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের একটি অযোগ্য প্রতিনিধি মাত্র নয়, তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে।

সেইদিনের প্রতীক্ষায় কর্মময় দিন, নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাতে লাগলেন রাণী। তাঁর সেদিনকার চিন্তাধারার কথা কে বলবে? কে জানে তিনি কি ভাবতেন, কি চিন্তা করতেন! কি অস্থির আবেগে রাতের পর রাত কাটিত তাঁর। কি অনির্বাণ আগুন জ্বলে যেত সেই মনে?

এইমাত্র জানা যায়, তাঁর চোখে ঘুম ছিল না।

আকাশে নক্ষত্রের কোন ভাষা আছে কি? তারা কি কথা কয়? তাই হয়তো বিনিদ্র রাণী সমস্ত রাত নক্ষত্রের অক্ষরে অক্ষরে আগামী দিনের নিশানারই সন্ধান করতেন।

এমনি করে এল ১৮৫৭ সাল। সমগ্র ভারতে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। ভারতের অনেক মানুষের অনেক স্বার্থে ঘা দিয়েছে ইংরাজ। অনেক বিক্ষুব্ধ চিত্তের ইন্ধনে সে এক বিশাল জতুগৃহ।

সাল ১৮৩৯। স্থান আফগানিস্থান। কাবুলে সিপাহীব্যারাকে রাত জেগে আলোচনা করছে সিপাহীরা আগুন ঘিরে বসে। দুরন্ত শীত। ভেড়ার চামড়ার পোস্তিনে ঠাণ্ডা মানে না। হিন্দু মুসলমান সিপাহীরা ক্ষুব্ধ। দেশ থেকে এত দূরে মিছামিছি কেন লড়তে এসেছে তারা? কেন এই যুদ্ধ? মুসলমান সিপাহীরা বলছে, কোরানে নিষেধ ছিল, তবু আমাদের লড়তে হচ্ছে স্বধর্মীর বিরুদ্ধে। কেন লড়ব আমরা?

তাঁবু থেকে এই খবর চলে গেল অফিসার মহলে। সকালে জানতে চাইলেন অফিসার। নির্ভয়ে প্রতিবাদ জানাল 27th Native Infantry-র সুবেদার। বিচার হল। অফিসার হুকুম দিলেন, লট্‌কাও। ফাঁসী হয়ে গেল সুবেদারের। সেই দৃষ্টান্ত দেখে মুখ বন্ধ করল সিপাহীরা। তাদের বাড়িতে মা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে আছে। মানুষটা আর ফিরল না—শুধু একখানা সরকারী খাম দিয়ে গেল ডাকপিয়ন,—তাই যদি হয়? কিন্তু এই কথা তারা বয়ে নিয়ে গেল

দেশে—তাদের ছেলে, নাতি নাতনীকে শুনিয়ে গল্প বলতে লাগল।

সিন্ধুতে যাবার সময় বিদ্রোহ করেছে 64th N. I. (Native Infantry) দেশ থেকে দূরে তারা বার বার যাবে না। লড়বে না মিছামিছি। বরখাস্ত হয়ে গেল চল্লিশজন। পঁচিশজনকে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিল লাহোরের বড় রাস্তায়—যদি কেউ বিদ্রোহ করতে চায় তো দেখুক পরিণাম।

মধ্যভারতের সুন্দর নগর গোয়ালিয়ার। তরুণ সিন্ধিয়া জয়াজীরাও ইংরেজদের পরম মিত্র।

মাসে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে শিকার যাত্রা করেন ইংরাজ অফিসাররা। পার্টি হয়, নাচ গান হয়, তখন বাজি পোড়ে পঁচিশ হাজার টাকার। ১৮৫৩ সাল। গোয়ালিয়ার কন্টিনজেণ্টের সিপাহীরা আট মাসের মাইনে পায়নি। জয়াজীরাও এলেন। ফৌজ নিয়ে গুলী চালালেন। নিহত হল ষোল জন। তাদের গ্রামের ঘরবাড়ি ক্ষেতি বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। প্রাণের মায়া যার আছে সে আর মাইনে চাইবে না গুলী চালিয়ে মোরার চলে গেলেন জয়াজীরাও। ক্যাণ্টনমেণ্টের মাঠে রূপোবাঁধান গলফ্‌স্টিকে গলফ্‌ খেলবেন এখন তিনি। পা।॥ -ম হয়েছে তাঁর, চিত্ত বিনোদন দরকার।

অযোধ্যার গ্রাম দিয়ে চলেছে ফৌজ। হাঁস মুরগী তাদের যোগান দিতে হবে— দুধও সবটুকু তাদের। তীব্র আর্তনাদে কেঁদে উঠে সহসা নীরব হয়ে গেল কে? কোন অবুদ্ধি বালক পথের দিশা করতে পারেনি, তার উপর দিয়ে ঘোড়া চলে গেল!

গ্রামে গ্রামে মিশনারীরা বলছে, তোমাদের ধর্ম মিথ্যা, শিক্ষা মিথ্যা, সমাজ মিথ্যা, সব মিথ্যা। কথা বলছে না কেউ, গ্রামবাসীরা যখন শুনছে তাদের চোখে চোখে শুধু বিদ্যুৎ ঝলকে যাচ্ছে।

চৈতীফসল তুলবার সময় চাষীদের জোর করে ধরে এনে রাস্তা তৈরি করাচ্ছে। মিলিটারী ব্যারাক বসবে। ফসল পচে নষ্ট হয়ে গেল—তার খেসারত কে দেবে?

মাকে ছেলে বোঝাচ্ছে, চাষীজীবনে শুধু অনাহার আর দারিদ্র্য। দিনে ভুখা, রাতে বোখার, পেটে নেই রুটি আর মহাজনের খাতায়

সাতপুরুষের নামে লেখা ঋণ। তাই ফৌজে যাব মা, সিপাহী হব। —নগদ টাকা পাব।—উর্দি পাব, ছুটি মিলবে,—মা তুমি অনুমতি দাও।

শহর মীরাট। সাল ১৮৫৬। ব্যারাকের সামনে অবাধ্যতার জন্য চাবুক খেয়ে মরে গেল সেই কিশোর সিপাহী। ক্ষতিপূরণ নেই।

কানপুরের বাজারে ঘোড়ার গাড়ির সামনে এসে পড়েছিল যে তিন বছরের ছেলে, সে পিষে গেল। মায়ের হাতে পড়ল চাবুক।

পেশোয়ারে ব্যারাকের ধারে বসে নিজেদের মধ্যে মদ খাবার অপরাধে তিনজনকে ধরে আনা হল। মাথা নিচে আর পা ওপরে করে টাঙিয়ে রাখা হল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল নাকে মুখে রক্ত বেরিয়ে একজন মারা গিয়েছে।

ইংরেজ প্রভুর দিকে দুঃসাহসী দৃষ্টিতে যদি তাকিয়ে থাকে কোন ভারতীয়, তারও কারাদণ্ড হতে পারে। বুড়ো বাবার ওপর ঘোড়া চালিয়ে দিচ্ছিল বলে অফিসারের জামা মুঠো করে ধরেছিল কোন ছেলে। তার ফাঁসী হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ইংরাজ ভারতীয় কুলীকে নীলগিরিতে লাথি মেরে মেরে ফেলুক, যথেচ্ছ চাবুক চালাক, তাদের বিচার করতে হলে তাকে যেতে হবে সুদূর শহরের আদালতে। সেখানে গাঁয়ের মানুষ পৌঁছবে কেমন করে?

লক্ষ লক্ষ ছোট ছোট ঘটনা। আরো অনেক কথা, আরো অনেক দুঃখ, আরো অনেক প্রশ্ন। হাজার হাজার সাঁওতালের রক্তে ছোটনাগপুর আর রাজমহলের মাটি লাল—তারা দুঃসাহসী বাজি রেখেছিল বন্দুক বনাম ধনুকে। তাদের রক্তে ভেজা মাটিতে কি ফসল ফলবে?

কোল আর আদিবাসী, ফেরাজীরা আর মোপলারা—সকলে বারবার বিদ্রোহ করছে। অভিজ্ঞতা কিনছে বহু কোটি সন্তানের জননী অত্যাচারিতা নিপীড়িতা ভারতভূমি তার সন্তানদের রক্তের দামে। মা হয়ে ছেলেকে বাঁচাতে পারে না সে কেমন মা? তবে আর্তনাদ কর। ডাক দাও চারদিকে।

দিল্লীর লালকেল্লার দেওয়ালে বারবার ইস্তাহার পড়ছে—ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, তৈরি হও হিন্দুস্থানের মানুষ।

ছিঁড়ে ফেলে ইস্তাহার। আবার ইস্তাহার পড়ছে কলকাতা, মীরাট, কানপুরে। বারবার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে আর বারবার পড়ছে ইস্তাহার।

ফৌজীব্যারাক থেকে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে হাতে গড়া চাপাটি। কখন কখন সেই সঙ্গে লাল পদ্মের পাঁপড়ি।

সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির আর দরবেশ গাঁয়ে গাঁয়ে হাটবারে জমায়েৎ করছেন গ্রামবাসীদের। বলছেন—'সতেরোশও সত্তাবন কে বাদ অট্‌ঠারোশও সত্তাবন্ আগিয়া। অব তো অংরেজ রাজ খতম্ হোনে চলা।'

এমনি করে এল ১৮৫৭ সাল। দুই বছর ব্যাপী মহাপ্রলয়। ইংরেজ ঐতিহাসিক যাকে বলে গিয়েছেন সিপাহী বিদ্রোহ মাত্র। তাই যদি হয়, তবে কেন তার নথিপত্র দলিল দস্তাবেজ পুরো রেখে যায়নি তারা এ-দেশে? চারশ' বছর আগেকার ইতিহাস মেলে আর মাত্র ছিয়ানব্বুই বছর আগেকার সেই ঘটনার সমস্ত সাক্ষী প্রমাণ কেন মেলে না? অনেক জিজ্ঞাসা ভারতীয় মনে জাগে। তাই আমরা তাকে বলব ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম সচেতন অভ্যুত্থান, বলব ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারতীয় স্মৃতিতে পুণ্য সাল সত্তাবন।

নয়

উনবিংশ শতকের নবজাগরণ সমস্ত বাঙালীর জীবনে আশীর্বাদ আনেনি। তার ফলে উপকৃত হয়েছিল একমাত্র শিক্ষিত বাঙালী, নতুন মধ্যবিত্ত। সেদিনকার রাজধানী কলকাতা। বাংলার বুকে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটেছে শতবর্ষ পূর্বে। ইংরাজী শিক্ষায় লাভবান বাঙালী সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষের অন্য লোকের থেকে এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। তাঁদের যে জাতীয়তাবোধ ছিল, তা নিশ্চয় ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেনি। এই ইংরাজী-জানা বাঙালীরা প্রায়শঃই কমিসারিয়েটের কেরানী হয়ে সুদূর কানপুর,

লাহোর, মীরাট যেতেন। আজকের কেরানীকুলের তাঁরাই হচ্ছেন প্রথম পুরুষ। অ-বাঙালীরা তাঁদের 'বাবু' বলে সম্বোধন করতেন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় সামরিক দফ্তরে কাজ করতেন এবং তাঁর সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য এই যে ঝাঁসী আক্রমণের সময় তিনি হিউরোজের দলে ছিলেন। ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে শিক্ষিত বাঙালীর কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। অথচ এই বাংলাদেশেই তার আগে এবং পরে বারবার কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছে। শিক্ষিত বাঙালী যে ব্রিটিশের পক্ষে ছিলেন না, তারও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তার পরে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে। পাছে বাঙালীরা এই আন্দোলনে যোগ দেন, সেই ভয় কিন্তু ইংরাজের ছিল। সম্ভবতঃ সেইজন্যই তাঁরা এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে খবরাখবর যতদূর সম্ভব কলকাতায় কম প্রকাশ করতেন।

১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে যত কথা ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলে গিয়েছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে হয়ে গিয়েছে চর্বিমাখা কার্তুজের কথা। তা সত্ত্বেও চর্বিমাখা কার্তুজ কিন্তু সত্যিই একটি প্রত্যক্ষ কারণ!

আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ সম্পর্কে ভারতবাসী ইংরেজরা উদাসীন ছিলেন।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থান একটি পারম্পর্যবিহীন একক ঘটনা নয়।

১৭৫৭ এবং ১৮৫৭ সালের মধ্যে পূর্ব ভারতে বারবার খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ হয়েছে কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ১৮১৬ সালে বেরিলীর বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ সালের কোল বিদ্রোহ এবং ছোটনাগপুর এবং পালামৌ অঞ্চলে বিভিন্ন আদিবাসী অভ্যুত্থান। পালামৌ-এর লাতেহার ও কৈতুর আশেপাশে এখনও টুকরো টুকরো ছড়া ও গানের মধ্যে সেই অভ্যুত্থানের স্মৃতি বেঁচে আছে। ১৮৩১ সালে বারাসতে সৈয়দ আহ্মদ এবং তিতুমীরের নেতৃত্বে ফেরাজী বিদ্রোহ, ১৮৪৭ সালে ফরিদপুরে দিতুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৪৯, ১৮৫১-৫২, ১৮৫৫ সালের মোপলা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ স্মরণীয়। বাঙলার বুকে সেই বিদ্রোহের ঢেউ এসে লেগেছিল। বীরভূমের পালারপুরে একদিনে দেড়হাজার

সাঁওতাল নিহত হয়েছিল। সেই বিদ্রোহের স্মৃতি আজও বেঁচে আছে গানে গানে—

'কিবা ধান রে, কিবা পানি
পানি নয় রে পানি নয়
পাঁচ-গ্রাম চাষীর খুনে
জমিতে বুনলাম ধান-ও রে—
কিবা ধান রে—কিবা পানি।'

বাঙলার কৃষক বারবার অভ্যুত্থান করে তাদের বিক্ষোভ জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পাবনার গ্রামে ১৯৩৭-৩৮ সালে অতিবৃদ্ধ মুসলমান চাষীদের কথা। পাবনার কৃষক বিদ্রোহের বাল্যস্মৃতির কথা তাদের কাছে তখনও শোনা যেত। এই সংগ্রামী কৃষক এবং শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ সংক্রামিত হলে ব্রিটিশের অবস্থা সঙ্গীন হত। তাই সযত্নে বাঙলাকে তখন ভারত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

তারপরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৫৭ সালের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য নাম ভারতীয় সিপাহীদের কথা। ১৮৫৮ সালের পর ইংরেজদের কাছে বিভিন্ন ভারতীয় সিপাহী জবানবন্দী দিয়েছেন। এমনই বর্বর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করা হয়েছিল ১৮৫৭-৫৮ সালের অভ্যুত্থান, এমন মহাশ্মশান রচনা করেছিল ইংরেজ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে যে, তার বর্ণনামাত্রেই অতিরঞ্জিত বোধ হবে। সেই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে সত্য-ভাষণের সাহস যদি বীর সিপাহীদের না থেকে থাকে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তবু সত্য বলেছিলেন অনেকে। ইংরেজের প্রতি বিশ্বস্ত একজন ভারতীয় সিপাহীর বিবৃতিতে সিপাহীদের বিক্ষোভের বহু কারণ স্পষ্ট হবে। বেঙ্গল আর্মির (Bengal Army) বিদ্রোহ সম্পর্কে বেঙ্গল শিখ পুলিশ স্টেশনের সুবেদার ও সর্দার বাহাদুর সেখ হিদায়েৎ আলির বিবৃতি। বিবৃতিটি উর্দুতে লিখিত, ক্যাপ্টেন টি. র‍্যাট্রে (T. Rattray) কর্তৃক অনূদিত।

'যতদূর মনে পড়ে সিপাহীরা ব্রিটিশদের প্রতি প্রথম অসন্তোষ দেখিয়েছিল কাবুলে যাবার সময়। সে ১৮৩৮।৩৯ সাল। সিন্ধুনদ পার হয়ে আটক-এ পৌঁছে সিপাহীরা নিজেদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে লাগল। সুরজনারায়ণ দোবে বলতে লাগল : রাজা

মানসিংহ যখন সিন্ধু অতিক্রম করেছিলেন, বিষ্ণু মন্দিরে 'জনাও' রেখে গিয়েছিলেন। আজ 'মান নহী' তো মান কৌন রাখেগা?

আফগানিস্থানে সব মুসলমান। তাদের ছোঁয়া খাবার কিনে খেতে হত বলে হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। সেখানে প্রবল শীতে ভেড়ার চামড়ার জামা 'পোস্তিন' পরতে হত। পশুর চামড়ায় কি হিন্দু, কি সলমান, সকলেরই ছিল ঘৃণা। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানায়নি তারা, কেননা, তাদের আশঙ্কা ছিল, এই অসন্তোষের কথা জানতে পারলে তাদের আফগানিস্থানে রেখে দিয়ে যাবে ইংরেজরা।

কাবুল থেকে যারা ফিরে এল, তাদের মধ্যে হিন্দুরা হল জাতিচ্যুত। মুসলমানরা আফগান স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে লড়ে কোরানের নির্দেশ অমান্য করেছে বলে নিন্দিত হল।

ইংরেজ আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে, এই কথা বলবার জন্য 27th Native Infantry-র মুসলমান সুবেদার মকবুল হায়দারকে গুলী করে মারা হল।

64th Native Infantry-র কিছু লোক সিন্ধু দেশে যাবার সময় বিদ্রোহ করে। ফলে ৩০ জনকে বরখাস্ত করা হয় এবং ১১ জনকে ফাঁসী দেওয়া হয়।

পাঞ্জাব গ্রহণের পর ডবল বাট্টার লোভ দেখিয়ে কিছু সৈন্য সেখানে রাখা হয়েছিল। উপরি বেতনের লোভে সেখানকার স্থায়ী সৈন্যদলে যারা নাম লেখাল তাদের আর ডবল বাট্টা দেওয়া হল না। ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়।

১৮৫০ সালে সাহারাণপুরে একটি সরকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, সেখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলকে চিকিৎসা করা হবে। ফলে জোর গুজব রটে গেল, হাসপাতালে গেলেই জাত যাবে, সরকার তাদের ক্রীতদাস বানাবে। এই গুজবের ফলে মানুষ এত ক্ষেপে গেল যে, সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করতে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়।

সামান্য অপরাধে সিপাহীদের জেলে পাঠান হত। জেলে খাওয়া-দাওয়ার কোন বিচার থাকত না বলে জেল-ফেরত সিপাহীরা প্রায়ই জাতিচ্যুত হত।

মিশনারী সাহেব-মেমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমাদের ধর্মকে নিন্দা করতেন। পুতুল পূজা কর না, পৈতে ফেলে দাও, মেয়েদের পর্দা তুলে দাও, এই সব কথা শুনে আমাদের দুশ্চিন্তা হয়েছিল।

অযোধ্যার অন্তর্ভুক্তির পর, আমি র‍্যাট্রে সাহেবের সঙ্গে কানপুরে ছিলাম। বাজারে শুনলাম সবাই জটলা করে বলছে, এর ফলে সরকারকে গোলমালে পড়তে হবে।

১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফতোয়া বেরোল যে, কোম্পানির কাজে যেখানেই পাঠান হোক যেতে হবে এবং এই চুক্তিতে সই করতে হবে সিপাহীদের। আফগানিস্থান ফেরত সিপাহীরা বিশ বছর বাদেও জাতে ওঠেনি। কাজেই এই ফতোয়া পেয়ে সিপাহীরা বলতে লাগল, কোনদিন হুকুম আসবে লণ্ডন চল, তাই যেতে হবে!

নতুন কার্তুজের কথাও বলি। এনফিল্ড রাইফেল পাল্লা দিত ৯০০ গজ। কিন্তু তার কাগজ দাঁতে কেটে ভরতে হত।

প্রোমোশনের অব্যবস্থা, অল্প মাইনে, ভাতার গোলমাল, এসব তো বরাবরই আছে।

এই সব কারণেই সিপাহীরা ক্ষেপে গিয়েছিল।'

এই জবানবন্দীর কারণগুলিও নিশ্চয়ই সব নয়। সিপাহীরা এসেছিল কৃষকশ্রেণী থেকে। জমিহীন কৃষকশ্রেণী, ঋণ এবং কর-ভারে জর্জরিত হয়ে নগদ টাকার লোভে সিপাহী দলে নাম লেখায়। সেখানে তারা বিন্দুমাত্র সুবিচার পায়নি। ১৮১৬ সাল থেকে বারবার সিপাহীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটেছে। সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন নয় বলে সহজেই দমন করা গিয়েছে সেই সব বিক্ষোভ।

রাজ্যবিচ্যুত, বৃত্তিবঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গের অসন্তোষ ছিল। গদীচ্যুত রাজা ও জমিদারদের বেকার কর্মচারী, আমলা, সিপাহীদের অসন্তোষ ছিল আর কৃষকদের ছিল অভিযোগ। মূলতঃ কৃষিজীবী শ্রেণীর সিপাহীরা আঘাত পেয়েছিল দু'দিক থেকেই। কি চাষী, কি সিপাহী, তারা কোন অবস্থায়ই কোথাও সুবিচার পায়নি।

সবগুলি কারণ জড়িয়ে একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতির পথে নিয়ে চলেছিল ইংরেজের অদূরদর্শী নীতি।

ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শতবর্ষের রাজত্বের ফলাফল সম্পর্কে বিলেতে সুধী ইংরেজরাও ভাবছিলেন। ১৮৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেণ্টে ক্ল্যারিন কেয়ার্ড (Marquis of Clarin Carde) ভারত শাসনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শোচনীয় ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা তোলেন। তিনি বলেছিলেন, গত একশ' বছর ধরে অযোগ্য শাসন-ব্যবস্থার ফলে ভারত শাসন একটি

শোচনীয় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কোর্ট অব ডিরেক্টার্সের নির্বাচন একটি গুরুতর প্রহসন। কোম্পানির স্টক যাঁদের আছে, তাঁরাই হচ্ছেন ভোটাধিকারী। তাঁরা ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের স্থায়ী বাসিন্দা। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের সামান্যতম অভিজ্ঞতা বা সহানুভূতি নেই। একান্ত অযোগ্য এই সব নির্বাচনকারীরা এমন সব লোককে নির্বাচন করেছেন, যাঁদের স্বার্থ শুধু কোম্পানির মুনাফার সঙ্গে জড়িত। এর ফলে ভারতের অবস্থার এতটুকু উন্নতি হয়নি। তিনি জোর দিয়ে বলেন—'উন্নতি হয়নি, inspite of the much publicised Railway, Post-offices, schools and hospitals.'

স্বদেশে ভারতবাসীদের সব রকম শাসনাধিকার থেকে এমন লজ্জাকরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে, যার তুলনা অন্য দেশে বিরল। ভারতবর্ষকে শোষণ করে বিলেতে আপিস রাখা হয়েছে বার্ষিক এক লক্ষ আশী হাজার পাউণ্ড খরচ করে। যার কোন প্রয়োজন নেই। ভারতবর্ষে যে ইংরেজ কর্মচারী বছরে ১০০০ পাউণ্ড মাইনে পেয়েছেন, তিনি ২০,০০০ পাউণ্ড করে রোজগার করেছেন, অথচ এই জন্য কখনও কোন জবাবদিহি করতে হয়নি তাঁকে।

যে মহারাণীর রাজত্বে সূর্য অস্ত যায় না, তাঁরই রাজত্বে ভারতবর্ষের ১৪,০০,০০,০০০ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি একান্ত বিপন্ন। সুপ্রীম কোর্ট ছাড়া ইংরেজের বিচার হয় না বলে কলকাতা থেকে ১৫০০ মাইল দূরে পাঞ্জাবে যদি কোন ভারতীয়কে হত্যা করে ইংরেজ, তার বিচার কোনদিনই সম্ভব হয় না। দরিদ্র ভারতীয়রা সুবিচার পাবে না বলে নিশ্চিত জেনেছে। ইংরেজরা যত অপরাধই করুক না কেন, আইন তাদের আশ্রয় দেবেই।

চাকরিতে সিভিল সার্ভিসে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পাশ করে যে কোন ব্যক্তি ঢুকতে পারেন বলে কুড়ি-একুশ বছরের অনভিজ্ঞ ইংরেজ যুবকদের হাতে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে দায়িত্বহীনের কাজ করা হয়েছে। ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে সাধারণ ইংরেজদের অসীম অশ্রদ্ধা। এ-ও আশ্চর্য এবং শোচনীয় যে, ভারতের চৌদ্দ কোটি মানুষের মধ্যে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করবার যোগ্য একজনকেও পাওয়া যায়নি। ইংরেজরা আসলে বিশ্বাস

করেন না ভারতীয়দের। মুসলমান শাসকরা হিন্দুদের সহায়তায় রাজ্যশাসন করে গিয়েছেন কিন্তু ইংরেজদের ঘোর বৈষম্যনীতি তীব্র বিক্ষোভ জাগ্রত করেছে ভারতীয়দের মনে। সেনাবিভাগে অবিচার আরও প্রকট। যোগ্যতম ভারতীয় অফিসারও সুবেদার পদের উপর উঠতে পারেন না। বলা হয় বটে সুবেদার পদটি ইংরেজ ক্যাপ্টেনের সমান, কিন্তু ইংরেজ ক্যাপ্টেন ভারতীয় সুবেদারের দ্বিগুণ বেতন এবং অন্য সুবিধা পান। উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীরাই যখন এই অবিচারের ভুক্তভোগী, তখন সাধারণ সিপাহীদের কথা বলাই বাহুল্য।

ওয়েলিংটন, এলফিনস্টোন, মেটকাফ এবং বেন্টিঙ্ক প্রমুখ ইংরেজরা ভারতীয়দের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করার কথা বারবার বলে গিয়েছেন ; কিন্তু সেরকম কোন ঘটনা ঘটলে সমস্ত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রেস এবং ইংরেজ কর্মচারীরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করতেন। একবার কোন প্রদেশের গভর্নর কোন ভারতীয়কে সেক্রেটারী করতে চেয়েছিলেন বলে সিভিল সার্ভিসের সমস্ত কর্মচারীরা একসঙ্গে পদত্যাগ-পত্র দিয়েছিলেন। ফলে প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয়।

সেদিন প্রবল প্রতিপক্ষ জোর প্রতিবাদে ক্লারিন কেয়ার্ডের এই বিবৃতিকে খণ্ডন করেন। তাঁরা বলেন যে, ভারত সম্বন্ধে ভাববার কিছু নেই, ভারত সম্পর্কে তাঁদের আচরণ ঠিক।

ইংরেজ কর্তৃক ভারতীয়দের ধর্মবিশ্বাসের আঘাতকেই বিদ্রোহের কারণ বলে বারবার অভিহিত করা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের ভারতবর্ষে, হিন্দুধর্মের অনুদার গোঁড়া সঙ্কীর্ণতার ফলে একটি চোরাবালি সৃষ্টি হয়েছিল। যা ধারণ করে তাই তো ধর্ম। কিন্তু সে সময়ে ধর্ম সমাজকে ধারণ করবার ক্ষমতা রাখত না। তার মুষ্টি শ্লথ, হীনবল, জরাজীর্ণ।

ধর্মের নামে কুপ্রথাগুলিকে ধরে রেখেছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার ও পুরোহিত গোষ্ঠী। অশিক্ষা, দারিদ্র এবং কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে জনসাধারণকে তাঁরা নিজেদের সুবিধামতো ভাঙিয়ে আসছিলেন। ঐ সকল কুসংস্কার দূরীকরণে ইংরেজেরা প্রভূত সাহায্য করেছিলেন। তার মধ্যে সতীদাহ এবং অন্যান্য কুপ্রথা বন্ধ করা উল্লেখযোগ্য। সতী-দাহ বন্ধ হলে টনক নড়েছিল রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ধনী জমিদারদের,

জনসাধারণের নয়। এই সামান্য নজীর থেকে বোঝা যায়, ১৮৫৭ সালে ধর্মনাশ ও জাতিনাশের জিগির তুলেছিলেন সামন্ত নৃপতি ও পুরোহিত গোষ্ঠী। ইংরাজ শাসকরা পরোক্ষভাবে সেই মনোভাব জাগ্রত করতে সাহায্য করেছিলেন মাত্র। তার ফলেই জনসাধারণকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা সহজ হয়েছিল।

ভারতের সর্বত্র সেনা সমাবেশে ইংরাজ চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিল। ভারতীয় রাজ্যগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্য সংখ্যা যা বেড়ে গিয়েছিল, শিক্ষিত ইংরাজ অফিসারের সংখ্যা সেই অনুপাতে যথেষ্ট কম ছিল। সামরিক অফিসারদের নিযুক্ত করা হয়েছিল শাসনের কাজে। ২,৩৩,০০০ ভারতীয় সিপাহীর ওপর মাত্র ৪৫,৩২২ জন ছিল ইংরাজ। তাদেরও ১১,৩০০ জন ছিল অফিসার। ইংরাজ তখন ক্রিমিয়া, পারস্য এবং চীনে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত। রুটি আর কমলের সঙ্কেতের কথা আজ সর্বজনবিদিত। বিশ্বাস করবার কারণ আছে, এই রুটি ও কমল ছিল ফৌজীদলের সঙ্কেত চিহ্ন।

সঙ্কেত। কিন্তু কার সেই সঙ্কেত? কাদের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার সঙ্কেত? কার বার্তা কার কাছে নিয়ে চলবার সঙ্কেত? তবে কি আসন্ন যুদ্ধের কোন পরিকল্পনা ছিল?

এই যুদ্ধের নেতা হিসাবে অযোধ্যার গদীচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্-এর পরামর্শদাতা আহ্মদ-উল্লাহ্, নানাসাহেব, আজিম উল্লা, তাঁতিয়াটোপী, ঝাঁসীর রাণী, কুঁয়ার সিংহ, ফিরোজশাহ্, —এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য।

একটি জনপ্রিয় ধারণা আছে, ঝাঁসীর রাণী, নানাসাহেব সবাই একযোগে একটি চক্রান্ত করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ম্যালিসন সাহেব এমন কথাও বলেছেন যে, রুটি এবং পদ্মফুলের নিশানা চালু করে ঝাঁসীর রাণী উত্তরভারতে বিদ্রোহ প্রচার করেছিলেন। অভ্যুত্থানের একটি তারিখও ঠিক করেছিলেন তিনিই।

এই অভ্যুত্থানের যদি কোন পরিকল্পনা নেতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে থাকে নিশ্চয় তাঁরা সে চক্রান্তের প্রচার কামনা করেননি। ঝাঁসীর রাণী শৈশবে বিঠূরে ছিলেন, তখন নানাসাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকা স্বাভাবিক। নানাসাহেব রাণীর চেয়ে আঠারো বছরের বড় ছিলেন। অতএব সেই পরিচয়ে হৃদ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব বলে

মনে হয় না। এমন কি পরবর্তী কালেও রাণী নানাকে 'ভাওবীজ' বা ভাই-ফোঁটা উপলক্ষ্য করে পরামর্শ চেয়েছেন এমন ঘটনাও বাস্তবে ঘটেনি। চক্রান্ত গঠনে রাণীর সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে এরূপ কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। তাঁতিয়ার সঙ্গে তাঁর পূর্বাপর বোঝাপড়া থাকলে তাঁদের যুক্ত সংগ্রামের পরিণাম অতখানি শোচনীয় হত না। তাঁর ও তাঁতিয়ার মধ্যে যোগাযোগ সম্পর্কে একমাত্র প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁতিয়ার অন্তিম জবানবন্দীতে। তখন ১৮৫৯ সাল। একশ' বছরের সঞ্চিত ক্ষোভ দুই বছরে উদ্গীরণ করে, পরাজিত ভারতভূমির ঘরে ঘরে চরম আশাভঙ্গ ও হতাশা বিরাজ করছে। গোয়ালিয়ারের নিকটে সিপ্‌রী বা শিবপুরীতে বিচারান্তে তাঁতিয়ার ফাঁসীর হুকুম হল। নির্বিকার দৃঢ়তায় তাঁতিয়া আদেশ শিরোধার্য করলেন। শেষ কথায় বললেন—

'যখন আমি চিরখারী জয় করি, হিউরোজ যখন ঝাঁসী অবরোধে ব্যস্ত, তখন বাণপুরের রাজা, শাহ্‌গড়ের রাজা, দেওয়ান দেশপৎ, দৌলতসিং, কুচওয়া খারওয়ালা এবং আরো অনেকে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। চিরখারীতে থাকাকালীন আমি বাঈসাহেব রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর চিঠি পেলাম যে, তিনি ইংরেজের সঙ্গে লড়তে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়েছেন। আমি যেন তাঁর সঙ্গে ঝাঁসীতে যোগ দিই।

নানাসাহেব পেশোয়ার ভাইপো রাওসাহেব তখন কাল্পিতে। তাঁকে আমি খবর দিলাম। তিনি জয়পুরে এলেন এবং আমাকে রাণীর সাহায্যে যেতে অনুমতি দিলেন।

ঝাঁসীর পথে আমি বড়োয়া সাগরে এলাম। সেখানে রাজা মানসিংহ এসে যোগ দিলেন। ঝাঁসী থেকে এক মাইল দূরে বেতোয়ার তীরে আমার ও হিউরোজের মধ্যে যুদ্ধ হয়। আমার সঙ্গে ২২,০০০ সৈন্য এবং ২৮টি কামান ছিল। আমি হেরে গেলাম। একদল সৈন্য চার-পাঁচটি কামান নিয়ে কাল্পি চলে যায়। আমি ভাণ্ডীর ও কুঁচ হয়ে ২০০ সিপাহী নিয়ে কাল্পি যাই। রাণী সেদিনই মাঝরাতে পৌঁছলেন। রাওসাহেবকে তিনি অনুরোধ করবার পর রাওসাহেব তাঁকেই সেনাপতি করলেন। রাওসাহেবের অনুমতিক্রমে ঝাঁসীর রাণীর নেতৃত্বে আমি কুঁচ-এ যুদ্ধ করি। কুঁচ-এ নেতৃত্ব ছিল ঝাঁসীর রাণীর।'

তাঁতিয়া একবারও রাণীর সঙ্গে পূর্ব যোগাযোগের কোন কথা বলেননি। পূর্বাপর বোঝাপড়া থাকলে যুদ্ধের ফল যে অন্যরকম হত, তা-ই মনে হয়। তাঁতিয়া যখন এই জবানবন্দী দিয়েছেন, তখন বিদ্রোহের আগুন একেবারে নিবে গিয়েছে। ওদিকে ঝাঁসীর রাণীও নিহত। সুতরাং তাঁর বক্তব্যে কারো লাভক্ষতি হবার কোনও আশা বা আশঙ্কাই ছিল না। কাজেই রাণীর বিষয়ে তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন বলে মনে হয়।

একটি অসম্ভব কথা মনে হয়, সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়া যে বিষয়ে কিছু বলা কঠিন। মনে হয়, শেষের দিকে হয়তো কোন সমঝোতা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তখন দেরী হয়ে গিয়েছে। কোনরকম চিঠিপত্র যাতে ইংরাজের হাতে না পড়ে, সেজন্য বিদ্রোহীরা তৎপর ছিলেন। ঝাঁসীর রাণীর বিষয়ে মাত্র এই ছোট্ট খবরটি পাওয়া যায় :

কাল্পির যুদ্ধের পর হিউরোজ যে সরকারী বিবরণ দিয়েছিলেন, তাতে লিখেছিলেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়ে ভারতীয়রা পালিয়ে যাবার পর একটি মূল্যবান চামড়ার পেটিকায় রাণীর ব্যক্তিগত কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছে। এই চিঠিপত্র থেকে বিদ্রোহের চক্রান্তকারীদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।'

কিন্তু এই কাগজপত্রের কোন হদিশ তারপরে আর মেলেনি। সরকারী দফ্‌তর থেকে প্রকাশিত সামরিক কাগজপত্রে তার কোন নিশানাও নেই। India Office Library-তে হয়তো কোথাও তার নিশানা মিলতে পারে। এই কাগজপত্র পাওয়া গেলে ১৮৫৭ সাল সম্পর্কে মূল্যবান খবরাখবর মেলা অসম্ভব নয়।

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, বিদ্রোহের কোন প্ল্যান ছিল না। মনে হয়, পরিকল্পনা ছিল সিপাহীদের মধ্যে। পূর্বে বহু অভ্যুত্থান তাদের বিফল হয়েছে, এইবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভাগ্য জড়িয়ে একটি বিশাল অভ্যুত্থান তারা গড়েছিল—রুটি আর কমল তারই সঙ্কেত। হয়তো স্ব স্ব স্থানে নেতারা সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা সত্যিকারের নেতৃত্ব দিতে পারেননি। যুদ্ধের সময়ে দেখা গিয়েছে, সিপাহীরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই নেতাদের মধ্যে দুর্বলতা ছিল। দুর্বল নেতৃত্ব এবং পারস্পরিক

গোয়ালিয়ারে তানসেন ও মহম্মদ ঘৌসের স্মৃতিসৌধ।

স্মৃতি থেকে অঙ্কিত রাণীর এই ছবি দামোদররাও নিত্য পূজা করতেন।

গোয়ালিয়ার দুর্গের একাংশ।

বামে—গোয়ালিয়ারে গোরক্ষী প্রাসাদের গঙ্গাজলী।

দক্ষিণে—গোয়ালিয়ার শহরে লস্করের এই নিমগাছটিতে আমীরচাঁদকে ফাঁসি দেওয়া হয়।
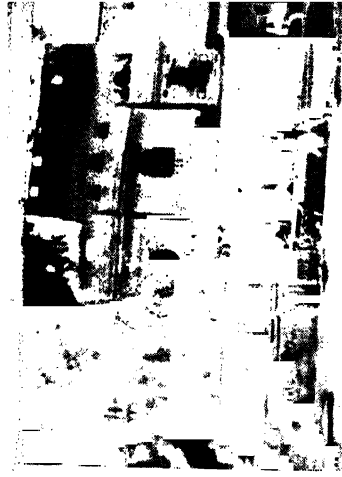
বামে—ঝাঁসীর কেল্লার বাইরে পশ্চিমদিকে সারেংগী ঘোড়ীর পিঠে পলাতক রাণী ও পুত্র দামোদরের প্রতিমূর্তি।

দক্ষিণে—ঝাঁসীতে জুন ১৮৫৭ সালে নিহত ইংরেজ নরনারীর স্মৃতিসৌধ।
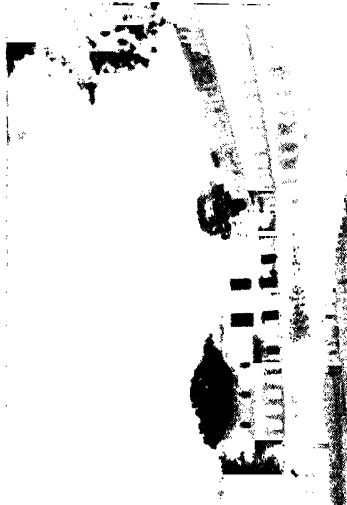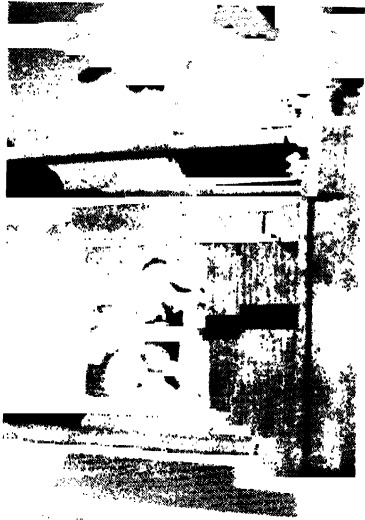
সমঝোতার অভাবই বিদ্রোহের বিফলতার জন্য দায়ী। এখানে নেতৃবর্গ বলতে রাণীকে ধরা হয়নি।

ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যে কতটা উদাসীন ছিলেন, সে সম্বন্ধে ঝাঁসীর আশপাশের স্থানসমূহের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে জব্বলপুরের কমিশনার মেজর আরস্কাইনের একটি বিবৃতির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নরের সেক্রেটারী অর্নহিলকে তিনি ৫-৩-১৮৫৭ তারিখে লিখছেন—

১। '২৭শে ফেব্রুয়ারী Muffussils কাগজে দেখলাম উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন কোন জেলাতে চৌকিদারের হাতে ছোট ছোট আটার চাপাটি বিলি হয়েছে।

আমি আপনাকে জানাচ্ছি, আমার ডিভিশনের সাগর, ডুমোহ্, জব্বলপুর ও নরসিংহপুর জেলাতেও সেই সঙ্কেত দেখা গিয়েছে।

২। প্রথমে এই রুটির কথা শুনলাম আমি নরসিংহপুরে। সরকারী তদন্ত করে জানলাম, অন্যান্য জেলাতেও এই খবর ছড়িয়েছে। অনেক খোঁজ করেও ডেপুটি কমিশনাররা শুধু এই রুটির ব্যাপক প্রচারের কথাই জেনেছেন। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, এইভাবে রুটি প্রচার করলে শিলাবৃষ্টি বন্ধ হবে, গাঁয়ে অসুখ হবে না।

৩। আমি আরো জানলাম যে, রং-রেজীরা কাপড়ে রং না ধরলে এইভাবে ভাগ্য প্রসন্ন করে। সবাই বলেছে, সিন্ধিয়া ও ভুপালের রাজ্য থেকে এই খবর ছড়িয়েছে।

৪। এই সঙ্কেত লুকোবার কোন চেষ্টা নেই কোথাও। কোটেওয়ার আর চৌকিদাররা খোলাখুলি ভাবেই রুটিগুলো দিয়ে আসছে।

৫। এখনও খোঁজ চালাচ্ছি। খবর পেলেই আপনাকে জানাব।

৬। কোন কুমৎলব আছে বলে মনে হয় না। একখানা রুটি পাঠালাম।'

সবচেয়ে শেষে আসছে এনফিল্ড প্রিচেট্ রাইফেল (Enfield Pritchett Rifle)-এর কথা। এই রাইফেলের টোটা এক ইঞ্চি লম্বা, আর গোড়ার দিকে ½ ইঞ্চি চওড়া। সত্যিই চর্বি মাখান থাকত তার একদিক এবং দাঁতে কেটে ভরতে হত এই টোটা।

১৮৫৭ সালে চালু হয় এই নতুন রাইফেল। এর পাল্লা ছিল ৯০০ গজ।

এই টোটা ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। জানুয়ারী ১৮৫৭ সালে দমদমের ব্যারাকে, জনৈক ব্রাহ্মণ সিপাহীর কাছে তারই ঘটিতে পানীয় জল চাইল একটি শূদ্র। আশ্চর্য হয়ে ব্রাহ্মণ সিপাহীটি জানাল—নীচজাতিকে নিজের লোটা থেকে জল দিলে তার জাতি কেমন করে থাকবে? শূদ্রটি জানাল, অতি শীঘ্র যাদের শূকর আর গরুর চর্বি দিয়ে তৈরি টোটা দাঁতে কাটতে হবে, তাদের আবার জাত যাবার ভয় কি?

এই সংবাদে ব্যারাকে জোর আলোচনার সূত্রপাত হল। জেনারেল হিয়ার্সকে তারা জানাল যে, এই টোটা তারা ব্যবহার করতে পারবে না। হিয়ার্স এ সংবাদ গভর্নর জেনারেলকে জানালেন।

ক্যানিং খবর পাঠালেন বিলেতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরসের কাছে এবং জানালেন যে, সিপাহীদের মনে তীব্র অসন্তোষ। তাদের বলা হয়েছে প্রয়োজন বোধ করলে চর্বির পরিবর্তে অন্য কোন তৈলাক্ত পদার্থ তারা টোটায় ব্যবহার করতে পারে। তিনি অনুরোধ জানালেন বিলেত থেকে এই ধরনের টোটা যেন আর না আসে। কোম্পানি ক্যানিং-এর কথা মেনে নিলেন।

কিন্তু তখন ঘটনা ঘটে চলেছে দুর্বার গতিতে। এক একটি ঘটনা ঘটছে আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বহরমপুরে ঊনবিংশ রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ করল সত্য, কিন্তু ব্যারাকপুরের ২৯শে মার্চের ঘটনা হল দাবানলে প্রথম স্ফুলিঙ্গ। মঙ্গল পাণ্ডে সার্জেণ্ট মেজর হিউসনকে গুলী করলেন এবং বললেন—'ভাই সব, ধর্ম রক্ষার জন্য, জাতি রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়াও।'

আতঙ্কিত হিউসন জমাদার ঈশ্বর পাণ্ডেকে বার বার অনুরোধ করলেন সাহায্য করতে। জমাদার একপা-ও অগ্রসর হলেন না। উপরন্তু বললেন—

'যে মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরবে, গুলী করে তার মাথা উড়িয়ে দেব।'

সমস্ত রেজিমেণ্ট দাঁড়িয়ে রইল চিত্রার্পিত মানুষের মতই সেই আদেশ মাথা পেতে নিয়ে।

শুরু হয়ে গেল ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। দুই বছর ধরে কেঁপে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বনিয়াদ।

দশ

রাজা গঙ্গাধররাও-এর মৃত্যুর পর ঝাঁসীতে যে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়, তারা এসেছিল মুলতান থেকে। পাঞ্জাবে প্রথম যে সিপাহীদের পাঠান হয়েছিল, তারা ডবল বাট্টা পেয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী দল তা পায়নি। পাঞ্জাবে মোতায়েন সৈন্যদের বাট্টা নিয়ে বিরোধ, সিপাহীদের অসন্তোষের আর একটি প্রধান কারণ ছিল। ভারতে ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ এলাকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইংরেজ সৈন্য এবং অফিসার রাখা সম্ভব হয়নি। কাজেই ভারতীয় রাজ্য-গুলিতে সর্বদাই ভারতীয় সেনাবাহিনী রাখা হয়েছিল। ঝাঁসীস্থ সেনাবাহিনীর প্রায় সকলেরই দেশ ছিল অযোধ্যা। জাতে ছিল তারা মুসলমান। ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের প্রধান রঙ্গমঞ্চ ছিল উত্তর ও মধ্যভারত। উত্তরভারতের কৃষক-কুলজাত এই সব সিপাহীরা স্বদেশ থেকে এত দূরে মোতায়েন হওয়াতে স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, এবং ঝাঁসীস্থ সেনাছাউনিতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল।

ঝাঁসীতে ছিল 12th Regiment Native Infantry (Left wing)-এর চারশ' বেয়নেটধারী পদাতিক, এবং 14th Irregular Cavalry'র (Right wing)-এর ২১৯ জন অশ্বারোহী। 12th Regiment-এর ক্যাপ্টেন ডানলপ ছিলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার স্কীন ছিলেন ঝাঁসী, জালৌন ও চন্দেরীর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। নওগাঁ-এ ছিল উপরোক্ত বেয়নেটধারী পদাতিক ও অশ্বারোহী দল দুটির পৃথক সৈন্যবাহিনী।

ঝাঁসী শহর ঘিরে ছিল (আজও রয়েছে) সুবিশাল দুর্গপ্রাকার। ঝাঁসীর কেল্লার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ছাড়া অন্য সবদিকেই শহর। কেল্লার উত্তর-পূর্বে রাজপ্রাসাদ বা রাণীমহাল। পূর্বে

সুবিশাল লছমীতাল হ্রদ ও মহালক্ষ্মী মন্দির। দক্ষিণে, শহর চৌহদ্দীর বাইরে ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে ছিল সামরিক কর্মচারীর বাড়ি, সেনাছাউনি, জেল এবং স্টারফোর্ট। এই ছোট্ট, তারকা আকৃতিবিশিষ্ট দুর্গটিকে গোলাবারুদ, রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হত। ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে কেল্লার দূরত্ব আন্দাজ দুই মাইল শহরটির বিস্তৃতি ছিল সাড়ে চার মাইল। দক্ষিণে, কেল্লা যেদিকে দুর্ভেদ্য বললেও চলে, সেদিকে কেল্লার ছ'শ' চল্লিশ গজ দূরে ছোট্ট দুটি অনতিউচ্চ টিলা। একটির নাম কাপু টিকরী। কেল্লাতে থাকতেন বেসামরিক কিছু ইংরেজ কর্মচারী, তাঁদের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আমলা এবং সকলের পরিবার বর্গ।

সমগ্র উত্তর ভারতের ধূমায়িত বিদ্রোহের আগুন তখন মধ্য-ভারতের দিকে ধাবমান। দিল্লীতে বাহাদুরশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তার পতাকার তলে সমবেত হচ্ছে উত্তর ভারতীয় সিপাহীরা। সামরিক কর্মচারীরা, তাই ঝাঁসীর সিপাহীদের উপর সর্বদাই নজর রাখছিলেন।

ক্যাপ্টেন ডানলপ তাঁর গুপ্তচরের কাছে খবর পেলেন, তাঁর বাহিনীর কাছে বিদ্রোহী নেতারা (নাম অপ্রকাশিত) ঘন ঘন উত্তেজক চিঠিপত্র পাঠাচ্ছেন। এইসব চিঠিতে সর্বদাই ছদ্মনাম ব্যবহার করা হত। কোন কোন চিঠিতে লছমণরাও নামের স্বাক্ষর দেখে ডানলপ এমন কথাও মনে করলেন যে রাণীর দেওয়ান লছমণরাওই রয়েছেন এর গোড়ায়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভরসায় ক্যান্টনমেন্টে থাকতে ডানলপের সুবুদ্ধি সায় দিচ্ছিল না। অথচ ক্যান্টনমেন্ট এলাকা ত্যাগ করে সদলবলে কেল্লায় চলে এসে সিপাহীদের ক্ষেপিয়ে তোলাও অসমীচীন। অগত্যা মহিলা ও শিশুরা চলে এলেন কেল্লায়। পুরুষরা রাতে কেল্লাতে থাকতে লাগলেন। সারাদিন তাঁরা ক্যান্টনমেন্টেই থাকতেন।

৪ঠা জুন 12th Regiment-এর 7th Company তাদের হাবিলদার জোনা গুরুবক্স-এর নেতৃত্বে স্টারফোর্ট অধিকার করে পুরো রসদ ও তোষাখানার মালিক হয়ে বসল। নওগাঁও-এ ছিলেন কর্নেল কার্ক। তাঁকে ক্যাপ্টেন ডানলপ জানালেন—

ঝাঁসী, ৪-৬-১৮৫৭, বিকেল চারটে।
'মহাশয়—

ঝাঁসীর গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্টারফোর্ট অধিকার করেছে। দলত্যাগী (straggler) দের খোঁজে থাকবেন। স্বাক্ষরিত—জে. ডানলপ'

বিপদকালে কঠোর হতে হবে, এই ছিল ভারত প্রবাসী ইংরেজদের শিক্ষা। ক্যাণ্টনমেণ্ট ময়দানে অবশিষ্ট অশ্বারোহী এবং পদাতিকদের সমবেত করে ডানলপ এবং টেইলার কঠোর ভাষায় আনুগত্য দাবী করলেন। মহারাণীর প্রতি বিশ্বস্ততার কথা বলে কর্তব্য স্মরণ রাখতে আদেশ করলেন। গোয়ালিয়ারে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন এবং সাগরেও এই খবর জানালেন।

৪ঠা জুন সন্ধ্যার মধ্যে ঝাঁসীর সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ কর্মচারীরা সপরিবারে কেল্লায় এসে আশ্রয় নিলেন। সামান্য রসদ ও গোলাগুলী যা আগেই আনা হয়েছিল, তার বেশি সামরিক সরঞ্জাম তাঁরা যোগাড় করতে পারলেন না। সমস্তই ছিল স্টারফোর্টে।

রাণীমহালেও খবর পৌঁছেছিল। উৎকণ্ঠিত চিত্তে রাণী বারবার খবরাখবর নিচ্ছিলেন। ৪ঠা জুন কেল্লাতে তিনি স্বীয় দেওয়ান লছ্মণরাও বান্দেকে পাঠিয়ে, তাঁর মারফৎ স্কীনকে জানালেন— যথাসম্ভব শীঘ্র স্কীন যেন ইংরেজ নরনারীদের নিয়ে দতিয়া অথবা সাগর চলে যান। প্রয়োজন বোধ হলে নারী ও শিশুদের যেন রাণীমহালে পাঠান।

স্কীন কর্ণপাত করলেন না।

ভারতীয় সিপাহীদের মনোভাব, পরিকল্পনা ও অভ্যুত্থান সম্পর্কে ঝাঁসীর নাগরিকরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। ছাউনি থেকে সে সব কথাবার্তা মুখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাণীও সে সব গুজব শুনেছিলেন। সেইজন্য তিনি ইংরেজদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত হয়েছিলেন।—আরো শঙ্কিত হয়েছিলেন ঝাঁসীর একান্ত অরক্ষিত অবস্থায় কোনো সামরিক অভ্যুত্থানের পরিণতি কি হতে পারে, তাই ভেবে। ইংরেজরা পঁয়ষট্টিজন, তাও নারী এবং শিশু মিলিয়ে, তদুপরি তাঁরা নিরস্ত্র। সিপাহীরা সংখ্যায় ছ'শ' এবং তারা সশস্ত্র। সর্বত্র ইংরেজ বিরোধী মনোভাব পরিস্ফুট। এমতাবস্থায়

ইংরেজরা যদি রাণীর কথা মানতেন, তাতে তাঁদের প্রাণরক্ষা হতে পারত, কিন্তু তাঁরা তা শুনলেন না। রাণীমহালের চল্লিশজন প্রাসাদরক্ষী ছাড়া রাণীর কোন সৈন্য ছিল না। রাণী সেই চল্লিশজনকে কেল্লাতে ইংরেজদের পাহারা দেবার জন্য পাঠালেন। তাঁর নিজের সৈন্যবল ছিল না, এ-অবস্থায় ইংরেজদের তিনি সাহায্য করেছেন জানলে সিপাহীরা তাঁকে বিপদাপন্ন করতে পারে জেনেও তিনি কর্তব্যপালনে পশ্চাৎপদ হলেন না।

৪ঠা জুন ও ৫ই জুন ইংরেজদের দেশীয় বাবুর্চি, খিদ্‌মৎগার, বেয়ারা যারা বাইরে ছিল, তারা খাবার, দুধ ইত্যাদি এনে ইংরেজদের দিতে লাগল। কিন্তু ৬ই জুন অবস্থার পরিবর্তন ঘটল। ঐদিন সকালে ক্যাপ্টেন ডানলপ ও এন্সাইন টেইলার ডাকঘর থেকে ফিরছিলেন। সেই সময় 12th Regiment-এর কয়েকজন সিপাহী এগিয়ে এসে তাঁদের গুলী করল। তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন তাঁরা। লেফ্‌টেনাণ্ট ক্যাম্পবেল পেছনে ছিলেন। দ্রুতবেগে ঘোড়া চালিয়ে তিনি কেল্লায় পালিয়ে গেলেন, যদিও তাঁর শরীরে তিনবার গুলী লেগেছিল। কেল্লা থেকে ইংরেজরা ডানলপদের হত্যা দেখে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে দরজার মুখে পাথর চাপা দিলেন। এ্যাসিস্টাণ্ট সার্ভেয়ার অফ রেভিনিউ, তরুণ সুদর্শন যুবক টানবুল আসছিলেন হেঁটে। তিনি যথাসম্ভব জোরে দৌড়ে কেল্লার দিকে আসতে চেষ্টা করলেন। পথে একটা গাছে উঠে পড়লেন। কিন্তু উঁচু ডালে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছবার আগেই তাঁর দেহ গুলীতে বিদ্ধ হয়ে ভূপতিত হল।

এবার ইংরেজরা সত্যি সত্যি অবরুদ্ধ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে অবরুদ্ধ হল বেশ কিছু ভারতীয় চাকর, বেয়ারা ইত্যাদি। বাইরে থেকে ইংরেজদের শুভানুধ্যায়ী এবং অনুগত কিছু লোক খাদ্য, পানীয় এনে প্রাচীরের গায়ে ধরতে লাগল এবং ওপর থেকে ইংরেজরা দড়ির সাহায্যে সেই সব তুলে নিতে লাগলেন। কিন্তু এইভাবে সাহায্য করাও বেশিদিন সম্ভব হল না, কেননা সিপাহীরা সাহায্যকারীদের দেখতে পেলেই ধরতে লাগল। শহরে ও সর্বত্র একটা সন্ত্রস্ত উত্তেজনার আবহাওয়া সৃষ্টি হল।

ব্রিটিশ সামরিক আপিসের অন্যান্য জায়গার মতো ঝাঁসীতেও

শতাধিক বছর আগে থেকে বহু বাঙালী বাস করছিলেন। সঁইয়ার গেট মহল্লায় কয়েকঘর মুখার্জী ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁরা সেখানে ছিলেন ব্যবসার খাতিরে। পোস্টাপিসের কেরানীও ছিলেন বাঙালী। তা ছাড়া মুর্শিদাবাদের রেশম, ঢাকার শঙ্খ ও ঢাকাই কাপড়ের ব্যবসা করতে কয়েকঘর বাঙালীও গিয়েছিলেন। ঝাঁসীর নাগরিকরা তাঁদের বলত 'বাবু'। পোস্টাপিসের এক কেরানীবাবু, মিঃ ফ্লেমিং নামক জনৈক ইংরেজকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। ক্রুদ্ধ সিপাহীরা ফ্লেমিংকে হত্যা করল এবং বাঙালী বাবুদের প্রতি তীব্র ঘৃণাবশত তাদের বাড়ি লুঠ করতে লাগল। ইংরেজদের বাড়িও তারা লুঠ করেছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ঝাঁসীকে হিউরোজ বলেছেন মধ্যভারতের সর্বাপেক্ষ ধনী হিন্দু নগরী, যেখানে বহু অর্থবান সম্পন্ন ব্যক্তির বাস ছিল। কিন্তু সিপাহীরা সেই নগরী লুঠ করতে চেষ্টা করেনি।

কেল্লার ভেতরে ইংরেজরা সাধ্যমতো গোলাগুলীর রসদ নিয়ে লড়বার জন্য তৈরি হলেন। বিপন্ন স্কীন, পার্সেল, স্কট এবং এ্যানড্রুজকে পাঠিয়ে দিলেন রাণীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ইতিমধ্যে সিপাহীদের মনোভাব সংক্রামিত হয়েছে জনসাধারণের মধ্যে। রাণীর পূর্বপ্রেরিত চল্লিশজন প্রাসাদরক্ষী যোগ দিয়েছে সিপাহীদের সঙ্গে। ভাব গতিক দেখে এ্যানড্রুজ প্রমুখ তিনজন ইংরেজ ভারতীয় পোষাকে রাণীমহালের দিকে গেলেন।

বিদেশে শাসন কায়েম করতে এসেছিলেন যে ইংরেজরা, এতদিন তাঁরাই পরিচালনা করেছেন পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে। আজকে তাঁরা অবস্থার হাতে ক্রীড়নক মাত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তখন দুর্মদ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং নিয়ন্ত্রিত করছে প্রত্যেকটি ঘটনাকে। রাণীমহালে পৌঁছবার আগেই পথে নিহত হলেন পার্সেল ও স্কট। স্বল্প কয়দিন আগে, ঝড়ুকুমার নামক একব্যক্তিকে অহেতুক অপমান করেছিলেন এ্যানড্রুজ। এ্যানড্রুজের ঘোড়া আর একটু হলেই বুঝি রাণীমহালের ফটক পার হয়। সেই সময় ঝড়ু-কুমারের ছেলে নিয়তির মতো লাফিয়ে পড়ল সামনে। ভড়কে গিয়ে ঘোড়া দুই পা তুলে ফেলে দিল এ্যানড্রুজকে। ঝড়ুকুমারের ছেলে হত্যা করল তাঁকে।

রাণীমহালের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। আশ্রিত স্বজন দাসদাসী সবাই ভিড় করল রাণীর কাছে। উৎকণ্ঠিত শঙ্কাতুর চিত্তে রাণী সকলকে ভরসা দিলেন। অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন কি খবর আসে।

কেল্লা ঘিরে তখন ছ'শ' সিপাহী উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। দিল্লীতে ইংরেজরাজ খতম হয়ে গিয়েছে, মীরাটে পুড়ে গিয়েছে ইংরেজ ছাউনি। দিল্লীর তখ্‌তে বাহাদুরশাহ এবং সর্বত্র সিপাহীদের রাজত্ব। অবরুদ্ধ ইংরেজদের সঙ্গে তাই তারা বিজয় গর্বে লড়তে লাগল। অরছা গেটের সামনে সর্বদাই কেউ না কেউ বক্তৃতা দিতে লাগল।

দুর্গের ভেতরে অবরুদ্ধ ভারতীয়রা কেউ কেউ বেরিয়ে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন বার্জেসের খিদ্‌মৎগার একটি দরজার মুখের পাথর সরিয়ে ফেলতে লাগল। লেফ্‌টেনাণ্ট পাওইস তাকে গুলী করে হত্যা করলেন। পাওইসকে তাঁরই একজন ভৃত্য তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেললো। বার্জেস এই ভৃত্যটিকে হত্যা করলেন। ভারতীয় ভৃত্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে, এই কথা ছড়িয়ে পড়া মাত্র কেল্লার ভেতরে পঁচিশজন ভারতীয়কে হত্যা করা হল।

৭ই জুন। ক্যাপ্টেন স্কীন বুঝলেন এখন আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ক্যাপ্টেন গর্ডন নিহত হয়েছেন অলিন্দ দিয়ে খাবার টেনে তোলবার সময়ে। তাঁদের গোলাবারুদ নেই, আহার নেই। অতএব আত্মসমর্পণ করবেন জানিয়ে ক্যাপ্টেন স্কীন ৮ই জুন সকালে সাদাজামা উড়িয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলেন। সন্ধির শর্ত সম্বন্ধে কথা বলবার জন্য ভেতরে এলেন ঝাঁসীর বিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধ নাগরিক হাকিম সালেহ্‌ মাহ্‌মুদ। স্কীন বললেন—

> 'আমাদের আত্মসমর্পণ করবার একমাত্র শর্ত হচ্ছে তোমরা আমাদের বিনা বাধায় সাগর চলে যেতে দেবে।
> 'আম্‌চা কেশাস্‌ ধক্কা ন লাবতাঁ, আম্মাস্‌ সাগরাস্‌ জাউ ধাঁ। আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।'

সালেহ্‌ মাহ্‌মুদ কথা দিলেন। স্কীনের নেতৃত্বে পঁয়ষট্টিজন ইংরেজ নরনারী শিশু বালকবালিকা একে একে বেরিয়ে এলেন। ঝাঁসী শহরের নরনারী এসে ভিড় করে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগল। ইংরেজদের নিয়ে যাওয়া হল জোকানবাগ উদ্যানে।

14th Irregular Cavalry-র কয়েকজন অশ্বারোহী এসে জানাল—রিসালদার কালে খাঁ হুকুম দিয়েছেন সমস্ত ইংরেজদের হত্যা করতে হবে। জেলদারোগা বখ্‌শীশ আলি নেতৃত্ব গ্রহণ করল। জোকানবাগ উদ্যানে নিহত হলেন ক্যাপ্টেন স্কীনসমেত ছেষট্টিজন ইংরেজ নরনারী শিশু।

এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ঝাঁসীর জনসাধারণের মনে বিষণ্ণতা সৃষ্টি করল। দিল্লী ও মীরাটের সাফল্যের খবরে বেপরোয়া সিপাহীরা ঝাঁসীতে থাকতে চাইল না। তারা বলল, দিল্লী চল।

রাণীমহালের সামনে গিয়ে তারা রাণীকে জানাল তাদের অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকা প্রয়োজন। অন্যথায় তারা ঝাঁসী শহর লুঠ করবে। রাণী প্রথমে জানালেন তিনি অসহায়, অর্থহীন এবং সম্পদহীন। তাঁকে উত্যক্ত করলে সিপাহীরা নিরাশ হবে। কিন্তু সিপাহীরাও নাছোড়বান্দা। তখন রাণী বাধ্য হয়ে তাঁর খাজগী দৌলতী অথবা ব্যক্তিগত অলঙ্কার থেকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের গহনা দিয়ে আশু বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেলেন।

সিপাহীরা তখন ঝাঁসী ছেড়ে দিল্লীর দিকে চলল। ১৮৫৭-র গোড়ার দিকে অভ্যুত্থানের গতি ছিল বাহাদুরশাহী কায়েম করবার দিকে। অতএব তারা দিল্লী চলে গেল। যাবার আগে বলে গেল—

'মুলুক খুদাতাল্লাহ্ কা—
মুলুক বাহাদুরশাহ্ কা—
অম্মল লক্ষ্মীবাঈ কা—
ঝাঁসী লক্ষ্মীবাঈ কা।'

তারা দলে দলে দিল্লী চলে গেল। তখন রাণী সর্বপ্রথমে ৯ই জুন ইংরেজদের মৃতদেহগুলি কবর দেবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ঝাঁসী রাজ্যের সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থার কথা জানিয়ে জব্বলপুরের কমিশনার মেজর আরস্কাইনকে চিঠি লিখলেন।

ঝাঁসীর হত্যাকাণ্ড, ১৮৫৭-৫৮ সালের ইতিহাসে একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই অভ্যুত্থানের মূলে ছিল একটি কথা,—ইংরেজ আমাদের শত্রু। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কোন পরিকল্পনা ছিল না বলেই সাময়িক উত্তেজনা সমস্ত বিচার বিবেচনা ছাপিয়ে গিয়েছিল এবং সম্ভব করেছিল এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।

রাণীর জীবনে এই হত্যাকাণ্ড আরো গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করল। যদিও প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তিনি এই হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

সমগ্র ভারতে তখন ইংরেজ প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি। মার্চ মাসে ব্যারাকপুরে মঙ্গলপাণ্ডের অভ্যুত্থান হয়েছে এবং এটা সবে জুন মাস। ঝাঁসী চতুর্দিকে রাজপুত রাজ্য দিয়ে ঘেরা। দতিয়া এবং অরছা যে এই রকম কোন অরক্ষিত অবস্থার সুযোগ খুঁজছে, তা রাণী ভাল করেই জানেন। তাঁর নিজের অবস্থা সম্পূর্ণ অরক্ষিত। যে সিপাহীরা এতদিন ঝাঁসীতে ছিল, তারা যুক্তপ্রদেশের লোক। ঝাঁসীরাজ্য, রাণী বা বুন্দেলখণ্ডের প্রতি তাদের কোন আনুগত্য নেই এবং তারা এই হত্যাকাণ্ডের পরিণাম ভোগ করবার দায়িত্ব ঝাঁসীবাসীর ওপর ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই ঘটনায় আসল ভূমিকা যাদের, তারা চলল দিল্লীতে আর রাণী তাদের কৃতকর্মের দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে জড়িয়ে পড়বেন এমন অদূরদর্শী তিনি ছিলেন না। তৎকালীন অবস্থায় তাঁকে একমাত্র সাহায্য করতে পারত ইংরেজ। কাজেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে তিনি সর্বদাই খবরাখবর দিতে লাগলেন।

তাছাড়া সহজাত হৃদয়গুণের জন্য রাণী স্বেচ্ছায় ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন, ইংরেজতোষণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। যে ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোন সংশ্রব ছিল না বরং যাতে তাঁর ভূমিকা একান্তই মানবীয়, তার দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে যে ফাঁসীর পরোয়ানা তৈরি হবে এবং ঝাঁসীরাজ্যের নাম কালোখাতায় উঠবে, তা রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

ঝাঁসীস্থ ইংরেজদের মধ্যে লেফ্‌টেনান্ট রাইভ্‌স পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৪ই জুন তিনি গোয়ালিয়ারে পৌঁছান। তা ছাড়া সার্জেন্ট জন নিউটন, স্ত্রী ও চারজন ছেলেমেয়েকে নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন। মিস্টার স্টুয়ার্টও পালিয়েছিলেন। লেফ্‌টেনান্ট রাইভ্‌স ছাড়া বাকী কয়জন ছিলেন ভারতীয় খ্রীস্টান। তাঁদের গায়ের রং, কথাবার্তা সবই পালাবার পক্ষে অনুকূল ছিল। কর্নেল মার্টিন আগ্রায় চলে যান এবং পরে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস

করতে আরম্ভ করেন। আগ্রাস্থিত কর্নেল ফ্রেজারের নামে রাণী এই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে বিশদ জানিয়ে একখানি চিঠি তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। মার্টিন নিজে জানতেন রাণী হত্যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাই তিনি সরলবিশ্বাসে ফ্রেজারকে সেই চিঠি দিলেন। ফ্রেজার সেই চিঠি পড়ে পর্যন্ত দেখেননি। ১৮৮৯ সালে কর্নেল মার্টিন রাণীর দত্তকপুত্র দামোদররাওকে একখানি পত্র লেখেন। তিনি লেখেন—

'২০-৮-১৮৮৯

....

আপনার হতভাগিনী মাতার সঙ্গে আমরা অত্যন্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি। তাঁর বিষয়ে সত্যাসত্য আমি যতটা জানি, এমন আর কেউ জানে না। সেই নিরপরাধিণী মহৎ-চরিত্রা মহিলা, ঝাঁসীতে অনুষ্ঠিত ৪ঠা জুন ১৮৫৭ সালের হত্যাকাণ্ডে মোটেই জড়িত ছিলেন না। উপরন্তু, তিনি উপর্যুপরি দুইদিন ধরে দুর্গে অবরুদ্ধ ইংরেজদের খাদ্যসরবরাহ করেন। কড়েরার দুর্গ থেকে একশ' বন্দুকধারী সৈন্য আনিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করতে পাঠান। কিন্তু ক্যাপ্টেন স্কীনের অনুরোধে তাদের ফেরত পাঠান হয়। ক্যাপ্টেন স্কীন এবং গর্ডনকে তিনি বারবার দতিয়ার রাজার কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে অনুরোধ জানান। তাঁর সেই হিতৈষণা পূর্ণ উপরোধ স্কীন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ সকলেই নিহত হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে একজন জীবিত থাকলেও সত্য নিরূপিত হতে পারত, তাঁদের সকলেই নিহত।

বিদ্রোহী সৈন্যরা যখন ঝাঁসী ছেড়ে চলে গেল, তখন তিনি তাঁর দেশের শাসন ভার গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন তিনি ছাড়া সেখানে ইংরেজের প্রকৃত বন্ধু কেউ ছিল না। দতিয়া ও তেহ্‌রী অরছা স্বচ্ছন্দেই আমাদের সাহায্য করতে পারত। কেননা, অরছার সীমানা ঝাঁসীর কুচকাওয়াজের ময়দান থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে এবং দতিয়ার সীমানা ঝাঁসী থেকে ছয় মাইল দূরে। উপরন্তু তাদের সুসজ্জিত এবং সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর অভাব ছিল না। তবুও উপরোক্ত দুইটি রাজ্যের শাসকরা বিপদগ্রস্ত ইংরেজদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করেননি। উপরন্তু রাণীকে অরক্ষিত এবং হীনবল মনে করে বারবার ঝাঁসী আক্রমণ করতে তাঁদের বাধেনি। তাঁদের তৎকালীন আচার ব্যবহার দেখে মনে

হয়, কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রভুত্বের কথা তাঁরা যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। সুখের বিষয় রাণীর অনমনীয় সাহসের কাছে তাঁরা বারবারই পরাজিত হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ঝাঁসী-অরছা, ঝাঁসী-দতিয়া রাজ্যের অন্তর্বিরোধের জন্যও রাণীকেই দায়ী করা হয়েছে এবং অন্য দুটি রাজপুত রাজ্যকে বলা হয়েছে ইংরেজের মিত্র।

তিনি জব্বলপুরে মেজর আরস্কাইনকে ও আগ্রায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের চীফ কমিশনার কর্নেল ফ্রেজারকে সমস্ত অবস্থা জানিয়ে যে খরীতা লিখেছিলেন, আমি নিজ হাতে তাঁদের তা দিয়েছিলাম। কিন্তু ফ্রেজার সেই চিঠি পড়েও দেখেননি। ঝাঁসীর নাম অপরাধীর খাতায় লেখা হয়ে গেল এবং বিনাবিচারেই ঝাঁসীর ভাগ্যে শাস্তি বিধান হল।'

বলাবাহুল্য এই ঘটনা সম্পর্কে ইংরেজ তরফ থেকে সত্যাসত্য নিরূপণের ব্যবস্থা হল। ভারপ্রাপ্ত হয়ে ক্যাপ্টেন পিঙ্কনী একটি রিপোর্ট দিলেন এবং পি. জি. স্কট সরকারী বিবরণী তৈরি করলেন। পি. জি. স্কট জানালেন, তিনি নিম্নলিখিত কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী থেকে তাঁর রিপোর্ট তৈরি করেছেন।

১। জনৈক উপস্থিত ব্যক্তির বিবৃতি।
২। জনৈক বাঙালীর বিবৃতি (নাম অপ্রকাশিত)।
৩। মেজর স্কীনের খানসামা সহীবুদ্দীনের বিবৃতি।
৪। মিসেস্ মাটলোর বিবৃতি।

এই বিবৃতিগুলিতে রাণীর সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে দেখা যাক।

প্রথম বিবরণী অত্যন্ত যথাযথ এবং সংক্ষিপ্ত। তাতে রাণীর নাম উল্লেখ পর্যন্ত নেই। দ্বিতীয় বিবরণীটি ঝাঁসীর কাস্টম কালেক্টরী আপিসের জনৈক কেরানী বাঙালীবাবুর দেওয়া। তিনি বলেছেন—

'..................... ৬ই জুন লেফ্‌টেনাণ্ট ডানলপ ও টেইলর নিহত হলেন। সিপাহীরা ইংরেজদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে লাগল এবং জেল থেকে বন্দী কয়েদীদের ছেড়ে দিল। কাস্টম ও পুলিশের চাপরাসীদের সঙ্গে নিয়ে দুইটি বন্দুকসহ পঞ্চাশজন সওয়ার এবং তিনশ' জন সিপাহী শহরের দিকে আসতে লাগল। তাদের পুরোভাগে আসছিল জেলদারোগা বখ্‌শীশ আলি। অরছা দরওয়াজা খুলে দেওয়া হল। সমস্ত বাহিনী

শহরে ঢুকল। এবং 'দীন কা জয়' বলে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল। রাণী তাঁর প্রাসাদের দরজায় প্রহরী সন্নিবেশিত করলেন এবং নিজে ভেতরে দরজা বন্ধ করে রইলেন। ক্যাপ্টেন গর্ডন রাণীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা জানাল যে, ইংরেজদের সাহায্য করবার উপক্রম করলে রাণীকে তারা হত্যা করবে এবং প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দেবে। অগত্যা রাণী তাদের কথা মানতে বাধ্য হলেন। রাণীর রক্ষীদল তখন বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল।

* * *

৭ই জুন সকালে এ্যান্‌ড্রুজ, পার্সেল ও স্কট, মুসলমানের ছদ্মবেশে কেল্লা থেকে বেরিয়ে রাণীমহালে চললেন সাহায্য প্রার্থনা করতে। রাণী তাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না। জানালেন— 'ইংরেজ শূকরদের সঙ্গে আমার কোন সংশ্রব নেই। তাদের রেসালদার কালে খাঁ'র কাছে নিয়ে যাওয়া হোক।' রেসালদার সাহেবের কাছে ইংরেজদের পাঠান তাদের হত্যার আদেশের নামান্তর মাত্র। তাঁরা তিনজনই নিহত হলেন। এ্যান্‌ড্রুজ রাণীমহালের সামনে ঝড়ুকুমারের ছেলের হাতে মারা গেলেন।

* * * *

ইতিমধ্যে জনৈক বাঙালী পোস্টাপিসের কেরানী মিঃ ফ্লেমিংকে আশ্রয় দিয়ে সিপাহীদের বিরাগভাজন হয়েছিল। সিপাহীরা সেইজন্য বাঙালীদের ধরে (আমাকেও) রেসালদার কালে খাঁ'র কাছে নিয়ে গেল। কালে খাঁ হুকুম দিলেন, অবরুদ্ধ ইংরেজরা আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত বাঙালীদের কয়েদ থাকতে হবে।

এই সময় হত্যার ভয় দেখিয়ে বিদ্রোহীরা তাদের পক্ষে রাণীকে টেনে আনল। রাণী তাদের এক হাজার সিপাহী এবং দুটি কামান দিয়ে সাহায্য করলেন।'

তৃতীয় বিবরণীটিতে স্কীনের চাপরাসী বলছে—

'৮ই জুন আমি সকালে ঝাঁসী শহরে গিয়ে দেখলাম রাণীর হুকুমে কড়কবিজলী কামান নিয়ে সিপাহীরা কেল্লাতে গোলা ছুঁড়ছে।

……… নরনারী শিশুদের জোকানবাগে হত্যা করবার পর রাণী এবং জেলদারোগা শোভাযাত্রা করে ক্যাণ্টনমেণ্টে গিয়ে রেসালদারের সঙ্গে দেখা করলেন।

……… হত্যাকাণ্ডের আগের দিন সমগ্র শহরে ঢাক পিটিয়ে

সিপাহীরা ঘোষণা করছিল, অম্মল খুদাতাল্লাহ কা—ঝাঁসী লক্ষ্মীবাঈ কা—ফিরিঙ্গীয়োঁকো মার ডালো।'

চতুর্থ বিবৃতিটিতে মিসেস্ মাটলো বলছেন—

'৪ঠা জুন ক্যাপ্টেন গর্ডন ও স্কীন নিজেরা রাণীর কাছে যান এবং অনুনয় বিনয় করে পঞ্চাশটি বন্দুক, বারুদ, গোলাগুলী ও পঞ্চাশটি রক্ষী যোগাড় করেন। পরদিন ডানলপ ও টেইলরের হত্যার পর রাণী তাঁর রক্ষীদের ফিরিয়ে নিলেন। তারপর রাণী ও তাঁর রক্ষীদল বিদ্রোহীদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন।

৮ই জুন বিদ্রোহী সিপাহীরা সন্ধির প্রস্তাব করবার পর, ক্যাপ্টেন স্কীন রাণীকে জানালেন, রাণী যদি সেই চিঠিতে নাম সই করেন তবে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করবেন, অন্যথা নয়। রাণী তাঁর নাম সই করে দিলেন। সন্ধিপত্রে জানান হল, ইংরেজদের গায় হাত দেওয়া মাত্র হিন্দুদের গো-বধ এবং মুসলমানদের শুকর-বধ সমতুল্য পাপ হবে। রাণীর সইযুক্ত চিঠি দেখে স্কীন আত্মসমর্পণ করতে রাজী হলেন।

আমরা সকলে যখন গেট থেকে বেরিয়ে কেল্লার বাইরে এলাম তখন কেমন করে জানি না, আমাকে সিপাহীরা লক্ষ্য করল না। আমি আমার আয়ার সাহায্যে জোকানবাগ উদ্যানে একটি হিন্দু স্মৃতি সৌধের মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম। সেই অবস্থায় আমি একমাস ছিলাম।

.........আমি আমার শুভানুধ্যায়ী সাগর নিবাসী দৌলতরামের হাত দিয়ে যে চিঠিপত্র পাঠিয়েছিলাম, রাণীর দূতরা সেগুলি ধরে এনে রাণীর হাতে দিয়েছিল। আমি খবর পেলাম, রাণী বলে রেখেছেন, আমাকে যে ধরে দিতে পারবে সে একশ'টাকা পুরস্কার পাবে। রাণীর লিখিত ছাড়পত্র ছাড়া ঝাঁসীর বাইরে কারো যাওয়ার হুকুম ছিল না। এবং আমাকে সেই লিখিত ছাড়পত্র যোগাড় করে দেবার সাহস কারো দেখলাম না।

এই ঝাঁসীতে আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। আমার স্বামী ও দেবর নিহত হয়েছেন। ঈশ্বরের দয়াতে অনাথা হলেও যদি আমার সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি, তাহলেই আমার সমস্ত কামনা সার্থক হবে।'

এই বিবরণীগুলি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি পরস্পর বিরোধী। রাণীর সম্বন্ধে তিনজন তিনরকম বিবৃতি দিয়েছেন, যদিও তিনটি বিবৃতিই প্রত্যক্ষদর্শীর। মিসেস্ মাট্‌লোর

বিবৃতি সর্বাধিক সন্দেহজনক এই জন্য যে, জোকানবাগে কোন হিন্দু স্মৃতি সৌধ ছিল না। তিনি বলেছেন কেল্লা থেকে পালিয়ে জোকানবাগে গেলাম। অথচ উক্ত বাগানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তিনি একেবারেই নীরব।

. ক্যাপ্টেন স্কট আগ্রাপ্রবাসী কর্নেল মার্টিনের বিবৃতি গ্রহণ করেননি এবং সে বিষয়ে কোন উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক রাইভ্‌স, নিউটন, মিসেস্ মাট্‌লো প্রমুখ যে কয়জন সেই সময় ঝাঁসী থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের নামও নিহতদের তালিকায় ব্যবহার করেছেন, যথা চার্লস বল। বাঙালী সাক্ষী বলেছেন, রাণী আশ্রয়প্রার্থী এ্যানড্রুজ পার্সেল ও স্কটের সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'I have no concern with English Swine.' নিশ্চয়ই রাণী তাঁর সমক্ষে কথাটি বলেননি এবং তাঁর (বাঙালীর) এই কথা জানবার সুযোগ সুবিধা কেমন করে হয়েছিল তা তিনি জানাননি। রাণী যে ইংরেজকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন তা অপর একজনও বলেছে। সে হল ক্যাপ্টেন স্কীনের অপর একটি চাপরাসী গোলাম মহম্মদ। ফতেপুরে ১৯-১১-১৮৫৭-তে ম্যাজিস্ট্রেট উইলিয়াম জি. প্রোবিনের সামনে একটি বিবৃতি দেবার সময় সে বলেছিল—

> 'ঝাঁসীর বিদ্রোহের সময় রাণী সর্বদাই তাঁর প্রাসাদে ছিলেন। ইংরেজদের জন্য ব্যস্ত হয়ে তাঁর ভকীলকে আমার প্রভুর কাছে পাঠিয়ে নারী ও শিশুদের রাজপ্রাসাদে চলে আসতে বললেন। তখনও আমরা বাংলোতে আছি। ক্যান্টনমেণ্ট বাংলো ছেড়ে আমরা কেল্লায় চলে আসবার পর আমাদের খোঁজখবর নেবার জন্য তিনি তাঁর ভকীলকে আবার পাঠান। সঙ্গে চল্লিশজন প্রহরীকেও পাঠিয়েছিলেন ইংরেজদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য। এই চল্লিশ-জনও পরে রাণীর সঙ্গে একত্র হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
>
> প্রোবিন: তুমি কেমন করে জানলে রাণীও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন?
>
> গোলাম মহম্মদ: কেল্লাতে অবরুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনিব স্কীন বলেছিলেন, এই কাজ নিশ্চয়ই রাণীর। তিনি যখন সাহায্য পাঠিয়েছিলেন তখনই তাঁর এই দুরভিসন্ধি ছিল। অবশ্য এ স্কীনের কথা, আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন কথা কিছু জানি না।'

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাই এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে রাণীর নামে যথেচ্ছ কলঙ্ক লেপন করে গিয়েছেন। এমনকি কে. ও ম্যালিসন যাঁদের ইতিহাস অনেকাংশে নিরপেক্ষ, অনুসন্ধিৎসা প্রণোদিত এবং গবেষণা-সমৃদ্ধ বলে সুনাম দাবী করতে পারে—তাঁরাও সেই কথাই বলে গিয়েছেন :

> 'ঝাঁসীর হত্যাকাণ্ডে রাণী লিপ্ত ছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ক্যাপ্টেন স্কীনের প্রেরিত তিনজন অসহায় ইংরাজকে রাণীই হত্যা করিয়েছিলেন এবং ঝাঁসীতে ব্রিটিশরা হত হওয়াতে সব চেয়ে বেশি লাভও হয়ে ছিল তাঁরই। তিনি মনে করতেন, ঝাঁসীরাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার তাঁরই এবং তারপথে অন্তরায় হচ্ছে ব্রিটিশ। সেই বাধাকে অপসারিত করবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করতেই তাঁর সঙ্কোচ ছিল না। হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী আচরণেই তাঁর মানসিক উত্তেজনার গভীরতা ধরা পড়ল। ক্ষণকের জন্য সন্দেহ হয়েছিল, বুঝি বা সিপাহীদের সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ ঘটল। সিপাহীরা তাঁর কাছ থেকে টাকা পেল এবং তিনি কিনলেন তাঁর খেতাব, ঝাঁসীর রাণী।'

কিন্তু কে. ও ম্যালিসনই পূর্বে বলেছেন—

> 'আমাদের ব্যক্তিগত ধারণা, ঝাঁসীর রাণীর প্রতি বৃটিশ সরকার অত্যন্ত অন্যায় করেছিলেন এবং তিনি তাঁর নিজস্ব সহজাত এবং স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।'

'নিজস্ব ভাব' বলতে কে. ও ম্যালিসন যুদ্ধের কথাই বলেছেন। রাণীর সম্বন্ধে তাঁরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছেন, তবু এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে রাণীকে দায়ী করতে ছাড়েননি। রাণীর দিক থেকে এই হত্যাকাণ্ডে সহযোগিতা করবার যৌক্তিকতাও তাঁরা দেখিয়েছেন।

ঝাঁসী শহরের অবস্থা তখন একান্ত অরক্ষিত। ঝাঁসী সিংহাসনের ভাগীদার সদাশিবরাও এবং অরছা ও দতিয়ার রাজপুত রাজারা সুযোগ পেলেই রাজ্য আক্রমণ করবেন।

ঝাঁসীর তৎকালীন অবস্থায় প্রয়োজন ছিল দূরদর্শী এমন একটি মানুষের যে সমস্ত ঘটনাবলীকে বুদ্ধিদ্বারা আয়ত্ত করে বজ্রমুষ্টিতে শাসনের হাল ধরবার ক্ষমতা রাখে।

নিঃসন্দেহে রাণী লক্ষ্মীবাঈ যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

এগারো

৮ই জুনের হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই ঘরে বাইরে শত্রু তৎপর হয়ে উঠল ঝাঁসীরাজ্যে। ৯ই জুন রাণী হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবিশেষ বিবৃতি দিয়ে দূত পাঠিয়েছিলেন জব্বলপুরের কমিশনার মেজর আরস্কাইনের কাছে। এই দু'জন দূত দু'খানি ফাঁপা লাঠির ভেতরে চিঠি পুরে শুধু একখানি কাপড় পরে অনাবৃত দেহে, দীন দরিদ্রবেশে আরস্কাইনের কাছে যায়। এই হরকরারা আরস্কাইনের কাছে পৌঁছবার পর আরস্কাইন তাদের দেখে অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, শুধু লাঠি নিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছ। রাণীর হরকরারা অতঃপর চিঠি বের করে আরস্কাইনের হাতে দিল। আরস্কাইন সেই চিঠি পেয়ে রাণীর কথাতে বিশ্বাস করেছিলেন মনে করবার কারণ আছে।

তৎকালীন অনিশ্চিত অবস্থায় মেজর আরস্কাইনের পক্ষে ঝাঁসীতে সাহায্য পাঠান অথবা ঝাঁসীর ভার নেওয়া সম্ভব ছিল না। অতএব তিনি রাণীকে একটি চিঠি লিখে ব্রিটিশ সরকারের হয়ে ঝাঁসীর ভার নিতে অনুরোধ করলেন। একটি ঘোষণাপত্রে ঝাঁসীস্থ ব্রিটিশ সরকারের আমলা কর্মচারীদের রাণীকে প্রভু বলে মেনে নিতে এবং তাঁকে খাজনা দিতে প্রজাবর্গকে আদেশ করলেন।

এই চিঠি এবং ঘোষণাপত্র আজও Delhi Archive-এ সুরক্ষিত রয়েছে।

আরস্কাইনের ঘোষণাপত্র :—

'ঝাঁসীর বিষয়ে ঘোষণা।'

'Proclamation on Jhansi.'

'সরকারী জেলা ঝাঁসীর বাসিন্দা এবং প্রজাবর্গকে জানান হচ্ছে যে, যদিও সিপাহীদের অন্যায় আচরণের ফলে কয়েকটি মূল্যবান জীবন ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে, তবুও শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেকটি বিদ্রোহী এলাকায় সহস্র সহস্র ইউরোপীয়

সৈন্য পাঠাচ্ছেন এবং ঝাঁসীতে আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁরা করবেন।

যতদিন না অফিসাররা সেনাবাহিনী নিয়ে ঝাঁসী পৌঁছচ্ছেন, ততদিন ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের হয়ে ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসী শাসন করবেন।

ধনীদরিদ্র, বড়ছোট নির্বিচারে আমি প্রত্যেককে রাণীকে মান্য করতে আদেশ করছি। সরকারী খাজনাও যেন রাণীকে দেওয়া হয়।

ব্রিটিশ ফৌজ দিল্লী পুনরাধিকার করেছে, সহস্রাধিক বিদ্রোহীদের হত্যা করেছে এবং যেখানেই বিদ্রোহীদের পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের হয় ফাঁসী দেওয়া হবে, নয় তো হত্যা করা হবে।

স্বাক্ষরিত :— ডবলিউ. সি. আরস্কাইন,
কমিশনার এবং লেফ্‌টেনান্ট গভর্নরের এজেন্ট।'

[Foreign 1857 Department, Secret. In a Letter from Commissioner Saugor Division of 2-7-1857 No. A consultation 31-7-No. 354.]

আরস্কাইনের এই চিঠি অবশ্য রাণীকে এতটুকু সাহায্য করেনি। কেননা রাণী রাজ্যের ভার হাতে নেওয়ার পরই আরস্কাইন তাঁকে 'বিদ্রোহী রাণী' বলে অভিহিত করেন এবং একবারের জন্যও এই চিঠির তিনি উল্লেখ পর্যন্ত করেননি।

ঝাঁসীর ভার হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গে রাণী নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করলেন স্বীয় আচরণে। কে. ও ম্যালিসনের ভাষায় :

'নিজেকে তিনি অতীব সুযোগ্য শাসক হিসেবে প্রমাণ করলেন। একটি টাঁকশাল স্থাপন করলেন। কেল্লা ও শহরের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে সামরিক সরঞ্জাম দ্বারা অভেদ্য করলেন। কামান ঢালাই শুরু করলেন এবং নতুন সৈন্যবাহিনী গঠন করতে লাগলেন।

সুদর্শনা তেজস্বিনী তরুণী রাণী জনসাধারণের সামনে খোলাখুলিভাবে বেরুতে এতটুকু কুণ্ঠিত বোধ করতেন না বলে তাঁর প্রজাবর্গের ওপর অতি শীঘ্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হলেন।

এই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার ক্ষমতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল তাঁর অনন্যসাধারণ সাহস।

এরূপ বিভিন্ন গুণাবলীর সমাবেশের ফলেই রাণী হিউরোজের সৈন্যদের অদ্ভুত শক্তিশালী প্রতিরোধ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। হিউরোজের চেয়ে অযোগ্য কোন প্রতিপক্ষ যদি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে থাকতেন, তাহলে রাণীর পক্ষে সফল হওয়া অসম্ভব হত না।'

রাণী সর্বপ্রথমে দরিদ্র বুন্দেলখণ্ডী কৃষকদের গত বৎসরের খাজনা মকুব করে বিশ্বাস ও প্রীতি অর্জন করলেন। ১৮৫৪ সাল থেকে ঝাঁসী সরকারের যে ৩,২৪০ জন সৈন্য বরখাস্ত হয়ে বসেছিল তাদের আবার ডেকে পাঠালেন।

রাজার মহিষী হিসেবে রাণী সর্বদাই উচ্চবর্ণ ও উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু কর্মচারী এবং আত্মীয় বন্ধুবান্ধব দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। বিপদের দিনে মুষ্টিমেয়কে নিয়ে যে কাজ চলে না, তা বোঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তুর্দিনে প্রয়োজন বহুজনের। যারা প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়েও রক্ষা করবে তাঁর ঝাঁসীকে। ঝাঁসীর প্রতি এরূপ আনুগত্য এবং ভালবাসা থাকা সম্ভব একান্তভাবে ঝাঁসীর বুন্দেলখণ্ডী মানুষের। অতএব তিনি তাদের ডাক দিলেন। বুন্দেলা, ঠাকুর এইসব উচ্চবর্ণ থেকে কাচ্ছি, কোরি, তেলি, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এসে জুটল তাঁর সেনাদলে। সেই প্রবল স্বধর্মানু-গত্যের দিনে রাণী আহ্বান করলেন আফঘান, পাঠান এবং মকরাণী মুসলমানদের। তাঁর বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত করলেন তাদের। এভাবে তৈরি হতে লাগল তাঁর সৈন্যবাহিনী।

যুদ্ধ কিংবা শান্তি, সবসময়েই মানুষকে খেয়ে পরে বাঁচতে হবে। কিন্তু বিক্ষোভ অধ্যুষিত এলাকার সর্বত্রই তখন সাধারণ মানুষের রুজীরোজগারের নিরাপত্তার আশ্বাস বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। সেই জন্য রাণী ঝাঁসী শহরে চারটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপনা করলেন এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা চালিয়ে কৃষি অব্যাহত রাখলেন।

যখন তিনি এমনি করে ঝাঁসীকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করে তুলছেন, তখন তৎপর হয়ে উঠল গৃহের শত্রু।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নেবালকরদের আদি জায়গীর ছিল খান্দেশে অবস্থিত পারোলাতে। খান্দেশ বর্তমান বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

একটি জেলা মাত্র। পারোলা জলগাঁও ও ভুসাওয়ালের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। নেবালকর বংশের মূলপুরুষ রঘুনাথরাও পারোলায় ছিলেন। তাঁর প্রথম পুত্র খণ্ডেরাও-এর বংশধরদের মধ্যে ১৮৫৭ সালে কাশীনাথ ও বাসুদেব জীবিত ছিলেন। কাশীনাথ ঝাঁসী শহরের তহশীলদার ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান। কাশীনাথের খুল্লতাতের পুত্র বাসুদেব নেবালকরের একমাত্র পুত্র আনন্দরাওকে গঙ্গাধররাও দত্তক গ্রহণ করেন। অতএব, পারোলাতে খণ্ডেরাও-এর বংশের কেউ ছিল না। বাসুদেব সেখানে থাকতেন মাত্র।

রঘুনাথের দ্বিতীয় পুত্র দামোদররাও-এর দুটি পুত্র ছিলেন, হরিপন্থ্ ও সদাশিবপন্থ্। হরিপন্থের তিনপুত্রের মধ্যে প্রথম পুত্র ঝাঁসীর প্রথম সুবেদার দ্বিতীয় রঘুনাথরাও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। দ্বিতীয় পুত্র শিবরাও ভাও থেকে ঝাঁসীর রাজবংশ সূচিত হয়। তৃতীয় পুত্রের একমাত্র সন্তান লালাভাও নিঃসন্তান ছিলেন এবং ঝাঁসী রাজবংশের পরমহিতৈষী হিসাবে ঝাঁসীতে বসবাস করতেন।

দামোদররাও-এর দ্বিতীয় পুত্র সদাশিবপন্থের বংশধররা পারোলাতে তাঁদের নিজস্ব জায়গীর ভোগ করছিলেন। সদাশিব-পন্থের প্রপৌত্র সদাশিব নারায়ণ পারোলাতে জায়গীরদার ছিলেন।

ঝাঁসীরাজ্য গ্রহণ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার এবং রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর মধ্যে যে চিঠিপত্র আদানপ্রদান হয়েছিল, তাতেই দেখা গিয়েছে, এই সদাশিব নারায়ণ, খুল্লতাত গঙ্গাধররাও-এর পর নিজের দাবী ন্যায্যতম মনে করে বারবার আর্জি পেশ করেছেন, অথচ ব্রিটিশ সরকার কোন সময়েই সেই আবেদন গ্রাহ্য করেননি।

ঝাঁসীরাজ্য সম্পর্কে সদাশিবরাও চিরদিনই সতর্কতার সঙ্গে সব খবরাখবর রাখতেন। ৮ই জুন ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডের পর তিনি রাণীর অরক্ষিত অবস্থা এবং ঝাঁসীরাজ্যের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হয়ে পারোলা থেকে তিনহাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীর অধীনস্থ কড়েরা দুর্গ অধিকার করলেন। সেখানকার তহশীলদারকে তাড়িয়ে দিয়ে ১৬ই জুন ১৮৫৭-তে নিজের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন করলেন। খেতাব নিলেন 'ঝাঁসীগৌরব মহারাজ সদাশিবরাও নারায়ণ'। নিজের নামে জায়গীরনামা লিখিয়ে ঝাঁসীরাজ্যের বিভিন্ন তহশীলের তহশীলদারদের

পাঠালেন। রাজাপুর-দিহালার তহশীলদার গোলাম হোসেনকে লিখলেন—

'আমি তোমার চাকরি বহাল রাখলাম। আমাকে উপযুক্ত নজরানা পাঠাবে। কেননা আমিই এখন ঝাঁসীর স্বাধীন শাসক।— আষাঢ়, বৈছ্য অষ্টমী, সংবৎ ১৯১৪।'

গোলাম হোসেনের তরফ থেকে রাজ-আদেশ পালনে যথেষ্ট তৎপরতার অভাবে দু'দিন বাদেই তিনি আবার লিখলেন—

'তোমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, অতএব তোমার চাকরি গেল।'

সদাশিবরাও রাণীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে মোটেই ধরেননি, কাজেই তাঁর সম্বন্ধে তৎপর হবার প্রয়োজন অনুভব করেননি। রাণী এই নতুন রাজাটিকে বন্দী করবার জন্য এক হাজার সৈন্য পাঠালেন। সদাশিবরাও প্রমাদ দেখে গোয়ালিয়ারের অন্তর্গত নরোয়ারে পালালেন, কিন্তু সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করল রাণীর সৈন্য এবং তাঁকে বন্দী করে এনে ঝাঁসীর দুর্গে রাখল। রাণী সদাশিবরাওকে কোনরকম অসম্মান করেননি এবং ১৮৫৮ সালে ইংরেজরা ঝাঁসীদুর্গ অধিকার করবার পর সদাশিবরাওকে সেখানে বন্দী অবস্থাতে পান। ইংরেজের বিচারে সদাশিবরাও দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছিল আঠারো বছরের জন্য। সৎব্যবহার এবং নিরীহ স্বভাবের জন্য বারো বছর পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁর জনৈকা আত্মীয়ার সৌজন্যে তাঁর বিবাহ হয়।

স্বীয় আচরণের জন্য সদাশিব নারায়ণ পারোলার জায়গীর থেকে অধিকারচ্যুত হয়েছিলেন। পারোলাতে গঙ্গাধররাও-এর যে অংশ ছিল তা দেখাশোনা করবার জন্য কেশবভাস্কর তাম্বে এবং তাঁর পুত্র কৃষ্ণকেশব তাম্বে পারোলাতে গিয়েছিলেন। কেশবভাস্কর তাম্বে পুণা থেকে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর আদেশে চিম্‌নাজী আপ্পার সঙ্গে কাশী গিয়েছিলেন। মোরোপন্ত তাম্বে এবং কেশবভাস্কর তাম্বে জ্ঞাতি ছিলেন। কাশী থাকাকালীন তাঁদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয়। কাশী থেকে বিঠুরে এসে তাঁরা বিঠুরঘাটের কাছে দুটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন পাশাপাশি। কেশবভাস্কর তাম্বে ঝাঁসীতে ১৮৫৮

সালে উপস্থিত ছিলেন। ইংরেজরা ঝাঁসীতুর্গ অধিকার করবার পর তিনি পারোলাতে আসেন। পারোলা নেবালকরদের জায়গীর হিসেবে তখন ইংরেজদের অধিকারে। ইংরেজরা কেশবভাস্কর তাম্বেকে নির্দোষ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় বলে বিশ্বাস করেন এবং পারোলার জায়গীর তাঁকে দেন। এই সুসমৃদ্ধ জনপদটি আজও এই তাম্বে পরিবারের অধিকারে রয়েছে। এঁদের পৈতৃক বাড়ি পুণাতে। কেশবভাস্কর-এর প্রপৌত্র রাজরত্ন শ্রী জি. আর. তাম্বে বরোদা নিবাসী এবং সেখানে সকলের শ্রদ্ধেয়।

সদাশিবরাওকে বন্দী করবার পর রাণী আবার রাজ্য শাসন ও যুদ্ধ প্রস্তুতির দিকে মন দিলেন এবং বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করলেন বিভিন্ন জনকে। লক্ষ্মণরাও বান্দে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। রামচন্দ্ররাও দেশমুখ হলেন দেওয়ান, ন্যায়াধীশ হলেন নানা-ভোপটকার। প্রধান সেনাপতি হলেন দেওয়ান জবাহর সিং। দেওয়ান রঘুনাথ সিং, মুহম্মদ জুমা খাঁ প্রভৃতি পদাতিক সৈন্যদের অধিনায়ক হলেন। প্রধান গোলন্দাজ হলেন গোলাম ঘৌস খাঁ। তাঁর অধীনে রইলেন দেওয়ান তুল্‌হাজু।

ইংরেজের অধীনে ঝাঁসী ক্রিমিনাল কোর্টে সেরেস্তাদার ছিলেন গোপালরাও। গোপালরাও সেরেস্তাদার রাণীর আনুগত্য স্বীকার করলেন। গোপালরাও ইংরেজী জানতেন, ইংরেজীতে চিঠিপত্র লেখা তাঁর অভ্যাস ছিল। তাঁর সাহায্য সময়ে মূল্যবান হতে পারে মনে করে তাঁকে বিশ্বাস করলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। এই গোপালরাও সেরেস্তাদার ইংরেজ-নিমকের বিশ্বস্ততা ভুলতে পারেননি। তিনি রাণীর গতিবিধি সম্পর্কে গোপনে কমিশনার আরস্কাইনকে জব্বলপুরে খোঁজখবর দিতে লাগলেন।

রাণী মেয়েদের জাতিধর্ম নির্বিশেষে আহ্বান করে একটি নারী-বাহিনী গঠন করেন। প্রাসাদ কাননে তিনি নিজে নিয়মিত মেয়েদের নিয়ে মালখাম্বা, নারিকেলে সাদা দাগ দিয়ে পিস্তল চালনা, তলোয়ার চালনা, অশ্বারোহণ ইত্যাদি অভ্যাস করতেন। গোলন্দাজ-দের সহায়তা করতে এবং পুরুষদের সমান লড়াই করতে মেয়েদের শেখান হয়েছিল। ইতিহাসের উত্তর অধ্যায়ে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেয়েরা দায়িত্ব গ্রহণ করে পুরুষদের সঙ্গে

সমানে যুদ্ধ করেছেন। শতবর্ষ পূর্বে আমাদেরই দেশের এক রমণী সেই গৌরবের সূচনা করেছিলেন জেনে আমরা ন্যায়ত গর্ব অনুভব করতে পারি। রাণী এবং তাঁর নারীবাহিনী বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কতখানি বলিষ্ঠ ছিল রাণীর সংগ্রামী চেতনা তাতেই অনুমেয়। মেয়েদের বীরত্বের দৃষ্টান্ত এর পূর্বেও আমাদের দেশে বহুবার মিলেছে কিন্তু রাণীর ভূমিকা তাঁদের থেকেও অনেক সার্থক ও সম্পূর্ণ।

সেই প্রবল স্বধর্মানুগত্যের দিনেও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রাণীর পতাকার তলায় যোগ দিল। উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সঞ্চারিত হল প্রত্যেকটি হৃদয়ে। ঘরে ঘরে তৈরি হল সৈনিক। রাণী সেই জন্যই সার্থক নেত্রী। সার্থক নেতৃত্ব শুধু নিজেকেই বড় করে তোলে না, সঙ্গে সঙ্গে আরো হাজারটা প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে গড়ে তোলে হাজারটা যোদ্ধা। রাণী সেই পরীক্ষায় সফল হয়েছিলেন, তাই তাঁর নেতৃত্ব হয়েছিল সর্বাধিক সার্থক।

নীল চন্দেরীর পাঠানী পোশাকে সারেংগী ঘোড়ীর পিঠে বসে নগরের পথে পথে ঘুরে সৈন্যদের সঙ্গে নিজে কাজ করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। তারা জেনেছিল রাণী তাদের মতোই শ্রম করেন। তিনি সিপাহীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতেন, সেই কথা আজও কখনও কখনও সন্ধ্যার অন্ধকারে বৃদ্ধ কিষাণের মুখে মুখে গান হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়—

> 'যিন্‌নে—
> সিপাই 'লোগোঁ'কো মালাই খিলায়ে
> আপনে খায়ে গুড়ধানী—
> অমর রহে ঝাঁসী কী রাণী ॥'

রাণী সিপাহীদের মালাই খাইয়ে নিজে খেয়েছেন গুড় ও খই। সুতরাং তিনি ছিলেন তাদের একান্ত আপন জন।

এমনি সময় অরছা এবং দতিয়া রাজ্যের বারংবার আক্রমণে ঝাঁসীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, একদা প্রায় সমস্ত বুন্দেলখণ্ড অরছা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বুন্দেলখণ্ডে মরাঠা অধিকার স্থাপিত হবার পর অরছা রাজ্যের সীমানা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে এল। ২৬-১২-১৮১২ তারিখে ইংরেজের

সঙ্গে অরছায় রাজপুত রাজা বিক্রমজিৎ যে সন্ধি করলেন, তাতে অরছারাজ্য মরাঠা গ্রাস থেকে বেঁচে গেল। বিক্রমজিতের পর তাঁর পুত্র ধর্মপাল রাজা হলেন। তাঁর মৃত্যু হল নিঃসন্তান অবস্থায়। অগত্যা বিক্রমজিতের ভাই তেজসিং এবং তাঁর পুত্র সুজানসিং পরপর রাজা হলেন। মৃত ধর্মপালের পত্নী লঁড়ই তুলৈঁয়া অসাধারণ উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন। তিনি সুজানসিং-এর সঙ্গে রাজ্য ভাগ করে নিলেন এবং হামীরসিং নামক একটি ছেলেকে দত্তক গ্রহণ করলেন। রাণী লঁড়ই তুলৈঁয়ার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে পরাভূত হয়ে ১৮৫১ এবং ১৮৫৩ সালে সুজানসিং ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর-রাও-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৪ সালে রাণী লঁড়ই তুলৈঁয়ার দত্তক হামীরসিংকে স্বীকার করে। এই সময় ঠিক হয় পূর্বতন সাহায্য এবং ঋণ পরিশোধ বাবদ অরছার টারৌলী জায়গীরের বার্ষিক কর ৬,০০০ টাকা ঝাঁসীরাজ্যকে দিতে হবে। অরছার নাবালক রাজা হামীরসিং-এর হয়ে রাণী লঁড়ই তুলৈঁয়া আপত্তির সঙ্গে এই কর প্রতি বছর ঝাঁসীরাজকে দিয়ে আসছিলেন। ঝাঁসী একদা অরছার অন্তর্গত ছিল। বুন্দেলখণ্ডের এই মরাঠা রাজ্যটির প্রতি দতিয়া, অরছা প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলি বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিল। তার কারণ, নেবালকর শাসকদের হাতে ঝাঁসীর উত্তরোত্তর উন্নতি। ঝাঁসীকে হিউরোজ বলেছিলেন—'The Richest Hindu city in C .tra India.'

ব্রিটিশ সরকার অরছারাজ্যকে বার্ষিক ছয় হাজার টাকা কর দিতে বাধ্য করার দরুন উভয় রাজ্যের মধ্যে পূর্বতন বিরোধ ও বিদ্বেষ আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। কাজেই ঝাঁসীর এই অরক্ষিত অবস্থায় রাণী লঁড়ই তুলৈঁয়া সেই সমুদয় বিরোধের প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর দেওয়ান নথে খাঁ বিশ হাজার সৈন্য এবং উপযুক্ত পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে ঝাঁসী রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জয় করতে করতে ঝাঁসী শহরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। নথে খাঁ'র অভিযান ও লক্ষ্মীবাঈ কর্তৃক অরছার সৈন্য প্রতিরোধ সম্পর্কে দতিয়ারাজ বিজয়-বাহাদুরের আশ্রিত জনৈক কল্যাণসিং কুড়রা 'লক্ষ্মীবাঈ রাসো' রচনা করেছিলেন। বুন্দেলখণ্ডী ভাষায় রচিত এই রাসো আজও দতিয়া অরছা, পান্না, ছত্রপুর, হামীরপুর, সর্বত্র ঘরে ঘরে গীত হয়। কবি বলেছেন—

'সংবত দশ নও সৈকরা, উপর চৌদহ সাল।
তাস মধ্য অংগ্রেজ কৌ, আপুস ম্যয় দহচাল॥
ফিরিঁ ফিরটৌ ছাওনী, ভয়ৌ গদর অসরার
জে পায়ে অংগ্রেজ জহঁ, তে তাঁ ডারে মার॥
ছলবল সৌঁ ঝাঁসী লই, গঙ্গাধর কী নার।
তাকৌ অব আগৈ কহত, ভাঁলী ভাঁত ব্যোহার॥
শহর ঔরছে কী হতী, কহি লড়ই (রাণী) সিরকার।
নথে খাঁ মুখ্ তিয়ার সৌ, বাত কহী নিরধার॥'

রাণী ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে প্রতিবেশী রাজপুত রাজ্যগুলির ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন বোধ করলেন। অন্তর্বিরোধ বা গৃহযুদ্ধ বাধাবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। যুদ্ধ হতে পারে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু ভারতীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে লড়াই যে আত্মঘাতী হয়ে উঠতে পারে, সে আশঙ্কা তাঁর ছিল। রাজনীতিক দূরদর্শিতায় তিনি শিবাজী আচরিত মহারাষ্ট্রীয় দক্ষতার যোগ্য উত্তরাধিকারিণী ছিলেন বলা চলে। সুতরাং তিনি রাজনীতিক নিরাপত্তার খাতিরে ঝাঁসীর কেল্লায় উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক ঝাঁসীর রাজা রামচন্দ্ররাওকে প্রদত্ত ইউনিয়ন জ্যাক প্রোথিত করলেন। কেননা অরছার ফৌজ যদি সংযত হয় তো ব্রিটিশ সরকারকে চটাবার ভয়েই হবে। সেজন্য তখন তাঁর ঐরূপ করবার প্রয়োজনও ছিল।

নথে খাঁ ততদিনে বেত্রবতীর ধারে তাঁবু ফেলেছেন।

রাণী মেজর আরস্কাইনের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। আরস্কাইন যে সে চিঠি পেয়েছিলেন তার নজীর আছে সরকারী দফ্তরে। তিনি লিখেছিলেন—

> 'রাণী নামেমাত্র ঝাঁসীর শাসক। সমস্ত জেলাতে চলেছে ব্যাপক অরাজকতা। তেহরীর রাণীর সেনাপতি এবং দতিয়ার রাজা, দুই-দিক থেকে ঝাঁসী আক্রমণ করবার ফলে বিপন্ন রাণী সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছেন।—২-১০-১৮৫৭।'

রাণীর বিপন্নাবস্থা সহজেই অনুমেয়। কেননা ১৯শে অক্টোবর এবং ১৬ই ও ২১শে নভেম্বর, তিনবার আরস্কাইন উপরোক্ত একই মর্মে বিবৃতি পেশ করেন।

আশ্চর্য এই যে, আরস্কাইন নিজেই রাণীকে ঝাঁসীর শাসনভার

দিয়েছিলেন, কিন্তু রাণীর উপস্থিত বিপদের সময়ে তিনি তাঁর চিঠিগুলির প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করলেন না এবং রাণীর এই সময়কার ক্রিয়াকলাপের জন্য যে তাঁর নিজের সেই ঘোষণাপত্র-খানি দায়ী, সে কথাও তিনি প্রকাশ করলেন না। আরো আশ্চর্য এই যে, ঝাসীর উপর অরছা রাজ্যের আক্রমণের যুক্তিস্বরূপ তিনি জানালেন—অরছার রাণী ব্রিটিশের মিত্র।

আরস্কাইনের এই উদ্দেশ্যমূলক আচরণে রাণী নিজেই ব্রিটিশ সাহায্যের অপেক্ষা না রেখে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে বেত্রবতী নদীর বালুকাবহুল তীরে তাঁবু ফেলে নথে খাঁ চিঠি লিখলেন রাণীকে—

'ব্রিটিশ সরকার তোমাকে যে মাসোহারা দিচ্ছে, তা আমিই দেব। তুমি কেল্লা ও শহর ছেড়ে চলে যাও।'

রাণীর তখনকার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কল্যাণ কবি বলেছেন—

'পায়ে সমাচার কীনৌ হ্যায় বিচার, বাই।
দিজিয়ে নিকার স্তৌ ভূমকা হামার হ্যায়॥
জো পৈ করৈ ন্যাব তৌ পরৌ হ্যায় ভলোদাব নাতৌ।
দৈ হ্যায় কচ্ছুগাঁব রাজনীত অনুসারী হ্যায়॥
কহে 'কলিয়ান' পুন্ন পুরুষ লোঁ জান হিয়ে।
বড়ো অভিমান কারী ফৌজ কি তিয়ারী হ্যায়॥
চড়ে ঘাট লৈ হো ম্যয় কিলে ম্যয় ছরা খাই হো।
জঙ্গ ঠানৈ জো মরাঠাকে নারী হ্যায়॥'

প্রকাশ্য দরবার ডাকলেন রাণী। নীল চন্দেরীর বুটিদার আচ্কান, গাঢ় নীল চিপা পায়জামা, মাথায় মুরেঠা, কণ্ঠে মুক্তার কণ্ঠি, হাতে রত্নখচিত তলোয়ার নিয়ে তিনি গদিতে বসলেন দামোদরকে কোলে নিয়ে। গঙ্গাধররাও-এর কাছে অরছার যেসব পওয়ার রাজপুত সর্দাররা আনুগত্য নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের জানালেন যে, স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দে তাঁরা অরছার পক্ষে ফিরে যেতে পারেন।

জবাহিরসিং পড়িবালে পওয়ার, দিলীপ সিং, রঘুনাথ সিং কুঁয়ার প্রভৃতি রাজপুত সর্দাররা জানালেন—

'জো নিমক খায়ো ঝাসীরাজকো
তৌ মান লয়ি বাইকী রাজ—

অব কৈসে ছোড়ী নিমক কী বাত্—
ঔর মান ভরি লাজ ?'

অতএব রাজপুত সর্দারদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে রাণী যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন।

সর্বসম্মতিক্রমে নথে খাঁকে জানালেন, শিবরাও ভাও-এর পুত্র-বধূর পক্ষে নথে খাঁ'র প্রস্তাব গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। নথে খাঁ'র ঔদ্ধত্যের জবাব একমাত্র যুদ্ধ। যুদ্ধের দিন এগিয়ে আসতে লাগল।

তখন রাণীর সৈন্যসংখ্যা বেশি নয়। তবুও জবাহিরসিং পট্টিবালে পওয়ার, দিলীপ সিং, রঘুনাথ সিং, গোলাম ঘৌস, লালা-ভাও বক্সী, খুদাবক্স, তুলাজী কারণেবালে প্রভৃতি বীরগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। পেশোয়া-আমলের কামানগুলি ঘসে মেজে অরছা, ভাণ্ডীর, সাগর, লছমী, সঁইয়ার গেটে বসিয়ে শহর সুরক্ষিত করলেন আফঘানী মুসলমান সিপাহীরা। রাণী স্বয়ং পাঠানী পোশাক পরে সর্বত্র তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন।

কেল্লার দক্ষিণদিক, যেদিকে বর্তমানে কেল্লার প্রবেশ পথ, তারই দক্ষিণ অংশটি ছিল সবচেয়ে সুরক্ষিত। অনন্ত চতুর্দশীর দিন নথে খাঁ সদলবলে সেদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। শত্রুসৈন্য আওতার মধ্যে এসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লার বুরুজ থেকে কামান গর্জে উঠল।

দু'দিন ভয়াবহ যুদ্ধ হল। অরছা গেটের অবস্থা শোচনীয় জেনে রাণী স্বয়ং সেখানে তত্ত্বাবধান করতে গেলেন। নথে খাঁ এই অরছা গেটের বাইরে প্রায় সমস্ত শক্তি সন্নিবিষ্ট করেছিলেন। ভগ্নোদ্যম সিপাহীদের উৎসাহ দেবার জন্য রাণী নিজে তাদের সোনার মোহর, অলঙ্কার ইত্যাদি পুরস্কার দিতে লাগলেন। উৎসাহিত হয়ে গোলাম ঘৌস খাঁ হাতী দিয়ে টেনে এনে রাণীর শ্রেষ্ঠ কামান কড়ক-বিজলী থেকে প্রবল গোলা-বর্ষণ শুরু করলেন।

'ইতৈ ঘৌস খাঁ নে কমানী চলাই।
কড়ংকে কড়ক গাজ ঘন তৈঁ সবাই॥
ইতৈ পাঁচ তোপৈঁ চড়ি মৌত ওপেঁ।
পচাসী ঘলৈঁ ওড়ছে (অরছা) কী অলোপৈঁ॥'

রাণী সিপাহীদের ভরসা দিয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা যদি

আজ আমার লজ্জা রক্ষা কর, তাহলে এই যুদ্ধে হতাহত সৈন্যদের বিধবাদের আমি যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেব। কবির ভাষায়—

'বাই নে বিনতি কিয়া শুনো সিপাই বাত।
অবকে কঠিন লড়াই, লাজ তিহারে হাত॥
লাজ তিহারে হাত, কৌন শঙ্কা ন মানো।
যাঁ তক জীবৎ রহুঁ তাঁ তক তব গুণ মানো॥
কহে সুকবি বিচার, লৌন কে লেও ভঁজাই।
রাঁড়ন রোটি দেউঁ, সনদ করকেঁ ম্যয় বাই॥'

উৎসাহিত সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন। গোলাম ঘৌস খাঁকে রাণী স্বয়ং তাঁর ব্যবহৃত স্বর্ণ অলঙ্কার দিয়ে সম্মানিত করলেন। বিপর্যস্ত নথে খাঁ তাঁর কুড়িটি হাতী, কামান, অস্ত্রশস্ত্র—সব ঝাঁসী কেল্লার দক্ষিণ ও পূর্ব প্রাচীরের বাইরে ফেলে রেখে পালাতে বাধ্য হলেন।

রঘুনাথসিং জাজেরবালে নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় বীর কর্নেল শ্লীম্যানের আমলে ঠগীদমনে জীবন বিপন্ন করে সক্রিয় সাহায্য করেন। পুরস্কারস্বরূপ কর্নেল শ্লীম্যান তাঁকে বিভিন্ন সম্মানসূচক পদক দিয়েছিলেন এবং ভিক্টোরিয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক রঘুনাথকে সম্মানিত করেন। রঘুনাথসিং জাজেরবালে ঝাঁসীর বাসিন্দা ছিলেন। এই রঘুনাথ-সিং এবং রাণীর দেওয়ান রঘুনাথ এক ব্যক্তি কিনা বোঝা যায় না। শ্লীম্যানের সমসাময়িক লোক হলে রঘুনাথসিং জাজের-বালে ১৮৫৭ সালে প্রৌঢ়বয়স্ক লোক ছিলেন বলে মনে হয়। দেওয়ান রঘুনাথ ও রাণীর অন্যান্য সহকর্মীদের সম্বন্ধে রাসো রচয়িতা কবি ভূপৎ বলেছেন—

'গুলাম ঘোস কা শোর বড়াই খুদাবকস জওয়ান।
বড়ী হিম্মতেঁ ন্যাব (যুদ্ধ) চঢ়াই নবীন রঘু দিবান॥
দেশমুখ কা যুক্তি অপার জবাহর থে বড়া শূর
ইতৌ মণ্ডলী সে মরাঠাকে নার (নারী) ফেরঙ্গ হঠাই অধূর॥'

এখানে রঘুনাথকে নবীন বয়সী বলা হয়েছে।

রঘুনাথসিং জাজেরবালে রাণীর সাহায্যার্থে ঝাঁসীর পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে সৈন্য নয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর পরাক্রমে নথে খাঁ'র পলায়নপর ফৌজ যথেষ্ট বিপর্যস্ত হল। নথে

খাঁ'র সঙ্গে যুদ্ধে যাঁরা সবিশেষ পরাক্রম দেখিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রঘুনাথসিং জারৈয়া এবং দেওয়ান রঘুনাথ সিং-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাণীর বিমাতা চিমাবাঈ-এর মতে, পরে কালিঞ্জরের জাহ্গীরদার চৌবে এবং বাণপুরের মর্দন সিং-এর মধ্যস্থতায় ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ এবং অরছার রাণী লঁড়ই ছুলৈঁয়ার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। তাঁরা দু'জনে 'ঝা সহোদর বহিনী প্রমাণেঁ মিলাল্যা।'

অরছা রাজ্যের সঙ্গে ঝাঁসীর রাণীর বিরোধ যে তারপরও দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, তার প্রমাণ আছে ইংরেজ সরকারের কাগজপত্রে। হিউরোজ ঝাঁসী শহর ও দুর্গ অবরোধ করেন মার্চ মাসে। তাঁরা এসে পৌঁছবার কিছুদিন আগে পর্যন্ত অরছার রাণীর ফৌজ ঝাঁসী আক্রমণ করেছিলেন। টমাস লো তাঁর 'Central India' বই-এ লিখেছেন—

> 'আমাদের ফৌজ এসে পৌছবার কিছুদিন আগেই তেহরী (অরছা)-র রাণী একটি ক্ষুদ্রবাহিনী এবং একটি কামান নিয়ে ঝাঁসীর কাছে আসেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি ইংল্যাণ্ডের রাণীর হয়ে লড়াই করতে এসেছেন। কয়েকটি মাত্র গুলী চালাবার পরই তাঁর যুদ্ধোত্তম ক্ষান্ত হয়।'

অরছার ফৌজ প্রথমে ঝাঁসী রাজ্য আক্রমণ করে অক্টোবর ১৮৫৭-তে। নভেম্বর মাসে যখন ঝাঁসীর কেল্লা আক্রমণ করেন নথে খাঁ, তখন একমাত্র ঝাঁসী শহর ছাড়া আর কিছুই রাণীর দখলে ছিল না। ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রাণী তাঁর হৃত এলাকাগুলি পুনরুদ্ধার করেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে লড়বার সময় পর্যন্ত রাণীকে এই অন্তর্বিরোধ নিয়ে বিব্রত থাকতে হয়েছিল।

এই যুদ্ধের সময়ে রাণী মহারাষ্ট্রীয় সামরিক প্রথা অনুযায়ী রাজপ্রাসাদে একটি যুদ্ধকালীন হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। আহত সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহন করে এনে এখানে যথাযোগ্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হত। রাণীর বিমাতা বলেছেন, রাণী নিজে আহতদের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়ে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করতেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতেন। প্রয়োজন হলে মলমপট্টি বদলে দিতেন নিজ হাতে।

অনেকে চিকিৎসকের নিষেধ অমান্য করে উঠে বসত এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইত। আহতাবস্থায় উত্তেজনা অনিষ্টকর বলে রাণী তাদের কাছে দাঁড়াতেন না, সরে যেতেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর এই নিঃসঙ্কোচ সহৃদয় ব্যবহার, যা শতবর্ষ পূর্বের যে কোন শাসকের পক্ষে অসম্ভব ছিল, তাই-ই তাঁকে জনসাধারণের কাছে একান্ত প্রিয় করেছিল।

এই সময় এবং পরবর্তী সময়েও রাণী একান্ত নিঃসঙ্কোচে মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে মিশতেন, বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতেন। এইরকম করে তাদের সঙ্গে পারস্পরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে তাঁর যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, তা কোনদিন বিচ্ছিন্ন হয়নি। রাণীকে রাতারাতি নিরাপদে দুর্গত্যাগে সাহায্য করতে এবং রাণীর অবর্তমানে ঝাঁসী নগরীকে রক্ষা করতে এই মুসলমান সৈন্যরাই সর্বাধিক বীরত্ব দেখিয়েছিল। একান্ত প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কই যে তাদের এই অসাধারণ সামরিক প্রেরণার উৎস ছিল না, তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ঝাঁসী ও অরছার এই যুদ্ধ সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের তৎকালীন নীতি বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। আরস্কাইন নিজে রাণীকে ঝাঁসীর শাসনভার কাগজে কলমে অর্পণ করেছিলেন। ঝাঁসী ছিল তখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের গভর্নর শাসিত একটি জেলা। অরছার রাণী ঝাঁসীতে ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডের সময় যদিও একান্ত নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তবু সুযোগ পাওয়া মাত্রই অরক্ষিত ব্রিটিশরাজ্য ঝাঁসী আক্রমণ করেছিলেন। তাই ঝাঁসীর রাণীর পক্ষে যুদ্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আরস্কাইন এই যুদ্ধ সম্পর্কে ওপরওলার কাছে যে সাপ্তাহিক রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে পরিষ্কার বলা হয়, ঝাঁসীর রাণী বিদ্রোহী ও দোষী এবং অরছার রাণীর আচরণ একান্ত সমর্থনযোগ্য। তার ভাষা হচ্ছে—

> 'Report of Divisional Commissioner of Saugar and Nerbudda Division for the week ending on 25-11-1857.
>
> The Rebel Rani of Jhansi is negotiating a coalition with the Banpore Chief, and further

endeavouring to secure the services of a portion of the Gwalior contingent in order to attack the Loyal Regent Ranee of Tehree (Orchha), who, presumably in our interest had, formally attacked her.'

ব্রিটিশ সরকার যে তেহ্‌রী-অরছা রাজ্যের রাণীকে মিত্র বলে জ্ঞান করেছিলেন, সে কথা সম্ভবতঃ অরছার রাণী জানতেন। এবং আজ যদি কাগজপত্র থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার একদিকে ঝাঁসীর রাণী ও অপরদিকে অরছার রাণীকে পরস্পর লড়িয়ে দিয়ে মধ্যভারতে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখবার প্রচেষ্টা করছিলেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অন্যথায় ১৮৫৯ সালে তাঁদের অরছা রাজ্যের প্রতি বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন কারণ পাওয়া যায় না।

ব্রিটিশ সরকারের এই বিরুদ্ধ মনোভাবের কারণ রাণী কিন্তু তখনও বুঝতে পারেননি। কেবল অরছা রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তা তিনি লক্ষ্য করলেন। নভেম্বর মাসের মধ্যেই তিনি জানতে পারলেন, ঝাঁসীতে ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডের জন্য একমাত্র তাঁকেই আসামী বলে ধরা হয়েছে এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঝাঁসী রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়ে গিয়েছে।

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করায় তাঁর সবিশেষ আপত্তি ছিল। নিজের নির্দোষের কথা বলে তিনি সার রবার্ট হ্যামিল্টনকে একখানি চিঠি লিখলেন। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের রিপোর্টে লেখা হল—

> 'সার রবার্ট হ্যামিল্টন ঝাঁসীর রাণীর কাছ থেকে জুন মাসের হত্যাকাণ্ডে তাঁর নির্দোষিতা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পেয়েছেন। তার যথাযথ অনুবাদ মাননীয় গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠান হয়েছে। কিন্তু ঝাঁসীর রাণীর পূর্বতন কার্যকলাপ লক্ষ্য করে গভর্নর জেনারেল তাঁর সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করতে রাজী হননি। রাণীর চিঠি সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে।'

যদিও রাণী তাঁর চিঠির জবাব পেলেন না, তথাপি ইংরেজের স্বরূপ তাঁর চিনতে দেরী হল না। একটি চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে

মানুষ যতদূর সম্ভব আপোষ করেই চলতে চায়। রাণীও তাই চেষ্টা করলেন। কিন্তু বুঝলেন, এই সমস্ত ঘটনা তাঁকে একটি অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অতএব তিনি চরমসিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

১৮৫৭-র গোড়ার দিকে রাণীর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। যে বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ ১৮৫৮ সালে হিউরোজের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন, সেই রাণীকেই আমরা ১৮৫৭ সালের গোড়ার দিকে ইংরেজ অফিসার আরস্কাইনের সঙ্গে পত্র ব্যবহার করতে দেখি। তাঁর এই সব আচরণের অর্থ মহারাষ্ট্রীয় জীবনকার এমনভাবে করেছেন, যাতে মনে হয়, রাণী ইংরেজের স্বপক্ষে ছিলেন, শুধু ইংরেজ তাঁর আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করবার ফলেই তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭-র গোড়ার দিকে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল উত্তরভারতে। ঝাঁসীর অবস্থিতি মধ্যভারতে। আশেপাশে তার কোথাও বিদ্রোহের নাম গন্ধ নেই। নিকটবর্তী চতুর্দিকস্থ রাজপুত রাজ্যগুলি একান্ত ব্রিটিশানুগত এবং ঝাঁসীর বিপক্ষে। মরাঠী রাজ্যগুলির মধ্যেও প্রবল পরাক্রান্ত গোয়ালিয়ার, ইন্দোর সবই ব্রিটিশের মিত্র। ভূপালের বেগমের তৎকালীন ইংরেজানুগত্য প্রসিদ্ধ। ব্রিটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ তখনও ব্যাপক সংগ্রামের রূপ নেবে কিনা তা বোঝা যায়নি। সেই অবস্থায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাঁর ও ঝাঁসীনগরীর অবস্থা হত শোচনীয় আর ঝাঁসীতে ইংরেজ নরনারীর হত্যার দায়ও তাঁরই হত।

এইসব ভেবেই তিনি আরস্কাইনকে সমস্ত জানিয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন এই সব খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহ থেমে গেলে পর ইংরেজ তাঁর ভূমিকা সহজেই বুঝতে পেরে দামোদরের রাজ্যাধিকার স্বীকার করবে।

এদিকে আরস্কাইন রাণীকে রাজ্যশাসনের অধিকার দেবার পরেই জানতে পারলেন, জুন মাসের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ক্যানিং রাণীকেই সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করেন। আরস্কাইন তখন দুই মুখো নীতি অবলম্বন করলেন। অরছার রাণীকে তিনি পরোক্ষে জানান ঝাঁসীর রাণী ব্রিটিশের শত্রু এবং ইংরেজদের হত্যার জন্য

দায়ী। কাজেই অরছা যদি ঝাঁসী আক্রমণ করে, তাহলে বন্ধুর কাজই করবে।

আরস্কাইনের এই গোপন ভূমিকাটুকুর জন্যই অরছার ফৌজ ব্রিটিশ পতাকা হাতে 'আমি ইংরেজের বন্ধু' এই কথা বলতে বলতে ঝাঁসী আক্রমণ করে। আরস্কাইন প্রকাশ্যে ঝাঁসীর রাণীকে রাজ্য শাসনের অধিকার দিয়ে গোপনে লেখেন,—

> 'অরছার রাণী ব্রিটিশের মিত্র এবং ঝাঁসীর রাণী ব্রিটিশের শত্রু। অরছা রাজ্যের ঝাঁসী আক্রমণ একটি ন্যায়সঙ্গত কাজ হয়েছে।'

সুখের বিষয় ইংরেজের এই দুই মুখো নীতি রাণী অনতিবিলম্বে বুঝতে পারলেন এবং খোলাখুলিভাবে কূটনীতি পরিহার করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

তিনি নিজেকে স্বাধীন ঝাঁসীর নাবালক রাজার অভিভাবক হিসেবে ঘোষণা করলেন এবং নিজের নামে টাকা চালু করলেন। ঝাঁসীর কেল্লায় উড়িয়ে দিলেন তাঁর নিজস্ব পতাকা। নাগারা ও চামর চিহ্নিত ঝাঁসী রাজ্যের পতাকার ওপর উড়তে লাগল তাঁর নিজের পতাকা।

একদা মরাঠা সাম্রাজ্যের পতাকা ছিল গৈরিক বর্ণের। গৈরিক বর্ণ ক্ষমা এবং ত্যাগের প্রতীক। কিন্তু সেই গৈরিক বর্ণ রাণীর মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিদেশী শক্তির সঙ্গে লড়বেন বলে তিনি তখন তাঁর বাইশ বছরের জীবন বাজি রেখেছেন। তিনি ঠিক করেছেন তখন থেকে তাঁদের মধ্যে একটি ভাষাতেই শুধু কথা হবে, সে ভাষা তলোয়ারের ঝঞ্ঝনা আর কামানের গর্জন। একই মাত্র জমিতে দাঁড়াবেন তাঁরা, সে জমি যুদ্ধক্ষেত্র এবং একই ভাবের আদান প্রদান করবেন তাঁরা, সে ভাব শত্রু বনাম শত্রুর মনোভাব। একদা অসহায় ইংরেজ নরনারীকে নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করেও সাহায্য করেছিলেন তিনি। তারই প্রতিদানে সমগ্র ঝাঁসীরাজ্য আর তার তিন লক্ষাধিক বাসিন্দার বিরুদ্ধে মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়ে গিয়েছে ফোর্ট উইলিয়ামে,—ঝাঁসী শহরের ষাট হাজার বাসিন্দার ওপর ঝুলছে ফাঁসীর দড়ির ছায়া।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে যদি রাণীর মনে কোথাও ক্ষমা বা

ত্যাগের কোন চিহ্নমাত্রও প্রকাশিত না হয়ে থাকে, যদি প্রতি-হিংসার আগুনে সমস্ত চিত্ত তাঁর বেদনা-রঙিন হয়ে ওঠে তো তাঁকে কি দোষ দেওয়া যায় ?

তাই তিনি লালপতাকা উড়িয়ে দিলেন কেল্লার দক্ষিণ বুরুজে। ঘন লাল রেশমের পতাকার একান্তে রইল নাগারা ও চামরের চিহ্ন।

১৮৫৭ সালের আকাশের রং তখন লাল। সমগ্র মধ্যভারতে তখন প্রবল বিক্ষোভ। মালোয়া, ইন্দোর, গোয়ালিয়ার, বান্দা, গড়াকোটা, বাণপুর, চিরখারী, চন্দেরী, শা-গড়, রাথগড়, সর্বত্র প্রবল ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানের ফলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব টলে গিয়েছে। গোয়ালিয়ার, ইন্দোর, নেপাল, বরোদা এই সব প্রবল পরাক্রান্ত সামন্তরাজাদের আনুগত্যও টিকিয়ে রাখতে পারেনি ব্রিটিশ অধিকার, দমিয়ে দিতে পারেনি জনসাধারণের ব্রিটিশবিরোধী প্রবল বিক্ষোভ। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় জনসাধারণের বিক্ষোভকে মূর্ত করে সেই লালপতাকা ঝাঁসীর কেল্লা থেকে অসীম গর্বভরে ১৮৫৭ সালের আকাশে উড়তে লাগল।

হিউরোজের সৈন্যদল ১৮৫৮ সালে টেনে ছিঁড়ে নামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সেই পতাকা তেমনিভাবেই সেখানে উড়ছিল।

বারো

স্বামীর জীবিতাবস্থায় রাণীর চরিত্র সম্যক প্রকাশিত হয়নি। সে সময়ে তিনি একান্তই ছিলেন অন্তঃপুরিকা। প্রাচীনপন্থী মহারাষ্ট্রীয় পরিবারের বিবিধ আচার নিয়ম তাঁকে শিখতে হয়েছিল। রাণী হলেও তাঁর বহুধা কর্তব্য ছিল স্বামী, আত্মীয়-পরিজন এবং দাসদাসীর প্রতি। তিনি তীব্রস্বভাবা ছিলেন না, তবু তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য সকলেই তাঁকে ভয় করত। তাঁর বিবাহকালে প্রাসাদে যে দাসী পরিচারিকা ছিল, তারা সবাই গঙ্গাধররাও-এর জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ সখুবাঈ-এর আমলের। বিশাল প্রাসাদের অন্তঃপুরে মেয়েরা নিরর্থক গল্প ও বিলাসব্যসনে দিন কাটাতেন। রাণী সেই অভ্যাস-গুলির আমূল পরিবর্তন করলেন। দাসীরা তাঁর সম্পর্কে সচেতন হল। তারা সচরাচর তাঁর সামনে আসতে চাইত না। সেজন্য গঙ্গাধররাও একদা পত্নীকে তীব্রস্বভাবা বলে অনুযোগ করেছিলেন।

যে নয় মাস তিনি ঝাঁসী শাসন করেন সেই সময়েই তাঁর চরিত্র পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করল।

মহারাষ্ট্রীয়দের নিরলস কর্মদক্ষতার কথা সর্বজনবিদিত। রাণী চরিত্রে এবং কর্মদক্ষতায় স্বজাতির সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখলেন।

ঝাঁসী শহরের বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, সমসাময়িক পর্যটক ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভট্ট গোড্‌সে বরসোইকর। তিনি বলেছেন, ঝাঁসী শহর উত্তর হিন্দুস্থানে অতি সমৃদ্ধ। ঝাঁসীর কেল্লা অতি প্রসিদ্ধ। শহরের পশ্চিমদিকে একটি জলাশয় আছে। রাজপ্রাসাদ চারতলা উঁচু এবং তাতে আটটি মহল আছে। তার পশ্চিমে সিপাহীদের প্যারেড করবার মতো বিস্তীর্ণ একটি ময়দান বিদ্যমান। সেখানে অনেক গাছ আছে। প্রাসাদটি অতি মজবুত ও সুন্দর। এতবড় এই প্রাসাদ যে সবটা দেখতে একমাস লেগে যাবে। প্রাসাদের ঘরে ঘরে গালিচা। ঝাঁসী তখন গালিচা নির্মাণের জন্য বিখ্যাত। দরবার ঘরে যে লাল গালিচা পাতা ছিল, তাতে পায়ের গোড়ালি অবধি ডুবে যেত। রমণীয় উদ্যানে ফোয়ারা ছিল। প্রাসাদের উত্তরদিকে সুপেয় জলের একটি কূপ। সেদিকে একটি বিস্তীর্ণ উদ্যানে ফুলের গাছ, আঙুরের লতা, আম, পেয়ারা, কমলালেবু ইত্যাদি নানাজাতীয় ফলের গাছ। শঙ্কর কেল্লা আরাম ও ক্রীড়ার উপকরণে সুসজ্জিত। কেল্লা এবং শহর ঘিরে রয়েছে সুউচ্চ প্রাকার। এই প্রাকারের মাঝে মাঝে আছে বুরুজ সম্বলিত দরজা। পাঁচটি দরজা এমন প্রশস্ত যে তার নিচ দিয়ে হাতী যেতে পারে। কেল্লার পূর্বদিকের প্রাকার সংলগ্ন ময়দান থেকে শহর শুরু হয়েছে। এই ময়দান থেকে শহরে যাবার রাস্তা চওড়া এবং সুন্দর। শহরের মধ্যে পাঁচটি কূপ-সম্বলিত একটি সুন্দর উদ্যানও ছিল।

শহরের সর্বত্রই অনেক উদ্যান, জলাশয় এবং কূপ আছে। কোষ্টিপুরা আর হালোয়াইপুরাতে শহরের সম্ভ্রান্ত লোকদের বাস। সেখানে বড়বড় প্রাসাদ ও সুন্দর অট্টালিকা আছে। শহরের দক্ষিণ দরজায় আছে একটি বৃহৎ জলাশয়। তার পাশে ঝাঁসীর রাজবংশের গৃহদেবতা কুলস্বামিনী মহালক্ষ্মী দেবীর মন্দির। মন্দিরের জন্য নন্দাদীপ, পূজা, মহানৈবেদ্য, চৌঘড়া (নহবৎ), গায়ক

এবং নর্তকীর বন্দোবস্ত ছিল। আষাঢ় মাস থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত মন্দিরে এমন উৎসব হত যে দেখলে বিস্ময় জাগত। শহরে যে বিভিন্ন বিষ্ণু, গণপতি ও শিবমন্দির ছিল, তার নিত্য সেবা ও সংস্কার কাজের জন্য সরকারী বৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল।

শহরের রীতি নীতি খুব ভাল। নাগরিকরা শ্রীমান, উদ্যোগী এবং কর্মপটু। ঝাঁসীর মতো রেশমী কাপড়, গালিচা এবং পিতলের বাসনের শিল্প অন্য কোন শহরে মিলত না। শহরে প্রায় ছ'শ' ঘর ব্রাহ্মণের বাস। প্রভাতে প্রাতঃস্নানান্তে ধৌতবস্ত্র পরে সুবাসিত আতর মেখে কাজ শুরু করা এই শহরের নিয়ম। সন্ধ্যায় মোতিয়াবেল, জুঁই ও চামেলীর মালা হাতে, গন্ধদ্রব্য কিনে প্রসাধন করা রেওয়াজ। ঝাঁসীতে মেয়েদের প্রাধান্য বেশি। মেয়েদের এরকম স্বচ্ছন্দ বিহার করতে অন্যত্র দেখা যায় না। সন্ধ্যায় স্নানান্তে সুন্দর শাড়ি পরে চুলে মালা জড়িয়ে, হাতে রৌপ্য বা তাম্র দক্ষিণা নিয়ে দেবদর্শনে চলেন মেয়েরা।

বিষ্ণুভট্ট মোরোপন্ত তাম্বের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মোরোপন্ত তাম্বের অনুরোধে লালুভাও ঢেকরের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। 'ব্রহ্মাবর্তা কড়ীল কোণী বিদ্বান ব্রাহ্মণ আলে আহেৎ' এই কথা বলে লালুভাও তাঁকে যথাযোগ্যভাবে সমাদর করেন,—'আদর সৎকার চাঙ্গলা কেলা, আপন স্বস্থ অসাবেঁ অসে আশ্বাসন কেলা।'

বিষ্ণুভট্ট বলেছেন, শত্রুক্ষয় এবং রাজ্য সুরক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে রাণী বিবিধ অনুষ্ঠান শুরু করেন। মহালক্ষ্মী মন্দিরে নিত্য নবচণ্ডী অনুষ্ঠান, জপ এবং দান, গণপতির মন্দিরে নিত্য সহস্রবার আবর্তন অনুষ্ঠিত হত। তারপর তিনি সহস্রপক্ষ, কুণ্ড মণ্ডপসহ গ্রহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি বিশাল জমিতে শামিয়ানা খাটিয়ে কুণ্ড, বেদী তৈরি করা হল। কাশী এবং বিঠুর থেকে অনেক ব্রাহ্মণ এলেন। রাণী স্বয়ং স্বচ্ছ শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে দামোদরের সঙ্গে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর কুলগুরু লালুভাও ঢেকরে সমস্ত বন্দোবস্ত উত্তমভাবে করেছিলেন। মোরোপন্ত তাম্বে কন্যার সন্নিধানে বসেছিলেন। সমস্ত সঙ্কল্প রাণীর নামে ছিল। যথাসময়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। কিন্তু যখন নান্দীশ্রাদ্ধ আরম্ভ হল তখন রাণীর পরিবর্তে দামোদররাও-ই মন্ত্র বলতে

লাগলেন। বিষ্ণুভট্ট ভাবলেন, যজ্ঞের সমস্ত সঙ্কল্প যখন রাণীর ন্যামে, তখন শ্রাদ্ধ কেন এই বালক করছে? পুরোহিত একজন যাজ্ঞিক বিদ্বান শাস্ত্রী হয়েও কিছুই আপত্তি করছেন না কেন? তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন—'অহো! ক্ষণকাল অনুষ্ঠান বন্ধ কর। আমার কিছু প্রশ্ন আছে। স্ত্রীলোক বেদাধিকারী নয় বলে পুণ্যাহবাচনাদি কর্ম উপাধ্যায়—প্রতিনিধি দ্বারা হয়ে থাকে। এখানে বালক কেন নান্দীশ্রাদ্ধ করছে?—সঙ্কল্প যখন বাঈসাহেবের নামে?'

তাঁর প্রশ্নে সকলেই সমস্যাকুল হলেন। তাঁরা মানলেন যে অনুষ্ঠানে ভুল হচ্ছিল। শুধু বিনায়ক ভট্ট যাজ্ঞিক তা মানলেন না। দুই পণ্ডিতে তর্ক বেধে গেল। ময়ূখ, হেমাদ্রি ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে টানাটানি পড়ল। শেষে ঠিক হল বিষ্ণুভট্টই এই যজ্ঞ পরিচালনা করবেন। তিনি এই বিধান দিলেন যে, বালক দামোদর বলবেন—'গ্রহযজ্ঞ বিধায়িন্যা মম মাতুঃ'। বিষ্ণুভট্টজী গুরুকৃপায় একটিও ভুল না করে এই যজ্ঞ নির্বাহ করে চতুর্থ দিবসে পূর্ণাহুতি দিলেন। তিনদিন ধরে ব্রাহ্মণ ভোজন এবং চতুর্থ দিবসে মুক্তদ্বার হল। ব্রাহ্মণরা দক্ষিণা ও বকশিশ পেলেন—বারো টাকার কাপড় এবং নগদ বিশ টাকা। সর্বসাধারণ ভোজন ও নববস্ত্র দ্বারা আপ্যায়িত হল।

এই অনুষ্ঠান অন্তে রাণী বিষ্ণুভট্টজীর অভিভাবককে বললেন—তোমাদের ছেলেটি বিদ্বান। তাকে রাজাশ্রয়ে দাও। আমি তাকে কাজ দেব। কিছুদিন পর শতচণ্ডী অনুষ্ঠান হল। কেল্লাতে ঘট স্থাপনা করে ধূপ ও ফুল দিয়ে এই পূজা নির্বাহ হবার পর রাণী বিষ্ণুভট্টকে ডেকে তাঁকে সরকারী বাসস্থান এবং ত্রিশ টাকা মাইনে ঠিক করে দিয়ে উত্তম বস্ত্র এবং জরীদার শাল উপহার দিলেন। মহালক্ষ্মীর মন্দিরে নিত্য সহস্র ব্যক্তিকে ভোজন করিয়ে রাণী চার আনা করে দক্ষিণা দিতেন। প্রত্যহ মোতিচূর পক্কান্ন এবং বিবিধ সুখাদ্য সেখানে দেওয়া হত।

এই সময় রাণীর দিনচর্যা ছিল এইরকম—প্রত্যহ তিনি ভোর চারটের সময় উঠতেন। নিয়মানুবর্তিতা নিয়ে পিতার সঙ্গে প্রায়ই পরিহাস হত। রাজা গঙ্গাধররাও-এর জীবিতকালে তিনি শরীর চর্চা করবার বিশেষ সুবিধা পাননি। এখন তিনি ভোরে

উঠে মালখাম্বা, মুগুর, তরবারি চালনা প্রভৃতি অভ্যাস করতেন। তাঁর বিমাতা বলেছেন, 'বাঈসাহেব একটি নারকেলে সাদা দাগ দিয়ে পিস্তল চালিয়ে লক্ষ্যভেদ করতেন। কথাপ্রসঙ্গে হেসে বলতেন, এই অস্ত্র আমার জন্য নয়, তলোয়ার হলেই আমার সুবিধা। চক্রাকৃতি মণ্ডল বেষ্টন করে অশ্বমণ্ডলী, গর্ত বা খাদ পেরিয়ে যাওয়া, ঘোড়ার খালি পিঠে বসা প্রভৃতি অভ্যাস করতেন। শরীর চর্চার পর তাঁর বিপুল কেশসম্ভার সুগন্ধি তৈলসিক্ত করে দেহ মার্জনার পর তিনি স্নান করতে যেতেন। স্নান তাঁর আর একটি বিলাসিতা ছিল। পনেরো থেকে বিশটি তাম্রকুণ্ডে ঈষতুষ্ণ জলে সুগন্ধি ঢেলে রাখা হত। ঝাঁসীর সিরাজুপরিবার আগ্রার সুবিখ্যাত গন্ধদ্রব্যের কারিগর সিরাজুদের জ্ঞাতি ছিল। তাদের তৈরি সুগন্ধি ও আতর কিনতেন রাণী। তাঁর ব্যবহারের আতরগন্ধী জল নেবার জন্য রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিবারগুলির মহিলারা দাসীদের পাঠাতেন। স্নানান্তে দাসীরা হাতে ছোট ছোট চুল্লী নিয়ে তাঁর চুল শুকিয়ে দিতেন। চুল অত্যন্ত ঘন ছিল বলে খোঁপা বেঁধে রাখতেন তিনি। স্নানান্তে স্বচ্ছ চন্দেরী বস্ত্র পরে তিনি ভস্মধারণ করতেন। তারপর— স্বামীর দেহান্তেও চুল কেটে ফেলেননি বলে—রূপোর তুলসীগাছে জলসিঞ্চন করে প্রায়শ্চিত্ত পূজা করতেন। তারপর শ্রীপার্থিবলিঙ্গ পূজা হত। এই সময় গায়ক তাঁকে ভজন ও গান শোনাতেন। পুরাণ পাঠের পর দর্শনার্থী সর্দার ও মন্ত্রীরা আসতেন। রাণীর জন্য তাঁরা বিভিন্ন উপহার আনতেন। উপহারের সঙ্গে যে শুষ্ক নারিকেলখণ্ড, সুপারী ইত্যাদি থাকত রাণী তাই তুলে নিয়ে তাঁদের সম্মান জানাতেন। পরে দামোদরকে ডেকে আদর করে দেখিয়ে বলতেন—কি নেবে এর থেকে বল। দামোদর যা ইচ্ছা তুলে নিতেন। রাণী কখন দুটি একটি জিনিষ নিয়ে বাকি সব আশ্রিত, অনুগৃহীত এবং দাসদাসীর মধ্যে ভাগ করে দিতেন।'

রাণী আহারে অতি অনাড়ম্বর ছিলেন। তাঁর বিমাতা বলেছেন—'মকাই তাঁর অতি প্রিয় ছিল।' মকাই পুড়িয়ে খেতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ফল তাঁর প্রিয় ছিল।

আহারান্তে দামোদরকে নিয়ে একটু বিশ্রাম করতেন। দামোদরের স্নান আহার দিনচর্যা সব প্রহর বাঁধা ছিল। যখন দামোদর আপত্তি করতেন তখন রাণী তাঁকে বলতেন— 'বড় হলেও স্বাধীনতা মেলে না।—দেখছ না আমি কি রকম নিয়ম মেনে চলছি'। বিশ্রামের সময়ে দামোদর চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতেন কোন কোন দিন। তার বদলে রাণীকে পুরাণের গল্প বলতে হত।

তিনটের সময় তিনি দরবারে যেতেন। কোনদিন পরতেন পাঠানী পোশাক। মধ্যভারতে তখন কাশীর বেনারসীর প্রচলন কম ছিল। গোয়ালিয়ার ও ইন্দোরের চন্দেরী শাড়ি ছিল অভিজাত রমণীদের পরিধেয়। রাণী সাদা রেশমের চিপা পাজামার ওপর নীল চন্দেরীর আঙরাখা পরতেন। মাথায় বাঁধতেন মুরেঠা। হাতে রাখতেন তলোয়ার। স্বামীর মৃত্যুর পর নথ, কানে বুগড়ী বা ঝুলানদা, গলায় কণ্ঠচিঞ্চি পরতেন না। হাতে একগাছা করে হীরার বালা, গলায় মুক্তোর কণ্ঠা এবং অনামিকায় একটি হীরার আঙটি এই ছিল তাঁর ভূষণ। কখন সাদা চন্দেরী শাড়ি, সাদা চোলি পরতেন, পায়ে পরতেন সাদা রেশমের নাগরা জুতো। সেদিন চুল বাঁধতেন দেশীয় প্রথায়।

দরবার ঘরের কার্পেট ছিল টুকটুকে লাল। তাতে পা ডুবে যেত। দুইজন ভালাদার রূপার ভালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার দুইপাশে।

দেশস্থ ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণরাও ছিলেন রাণীর দেওয়ান। বিষ্ণুভট্ট তাঁকে বলেছেন 'অক্ষরশত্রু'। কিন্তু রাজকার্যে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা ছিল। আটজন কারকুণ লেখার কাজ করতেন। দরবারের কোন কাজ রাণীর অজ্ঞাতসারে হত না। দরবারীদের প্রত্যেকে প্রত্যহ না এলে রাণী তাঁদের পরদিন প্রশ্ন করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ।

তাঁর সভাসদমণ্ডলীর মধ্যে লছমণরাও বান্দে, রামচন্দ্ররাও দেশমুখ, নানা ভোপটকার, লালাভাও বক্সী, জবাহির সিং, রঘুনাথ সিং এঁদের নাম পাওয়া যায়।

মোরোপন্ত তাম্বে এবং তাঁর স্ত্রী চিমাবাই রাণীর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু

এবং সঙ্গী ছিলেন। মোরোপন্তের ইতিমধ্যে দুটি কন্যা হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে ১২ই মার্চ, চৈত্র শুদ্ধ ষষ্ঠীতে তাঁর একমাত্র পুত্র চিন্তামণির জন্ম হয়। ভাই হওয়ার পর রাণী নগরীতে উৎসব করেছিলেন এবং সে উপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছিল। এই শিশুকে তিনি কখন কখন রাজপ্রাসাদে এনে রাখতেন। তার জন্য দুধের ব্যবস্থা এবং ধাই নিযুক্ত করেন। এবং তিনি স্বাধীন হবার পর একটি রক্ষীবাহিনী নিযুক্ত করে এই শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

১৮৫৭ সালে জুন মাসে যখন বর্ষায় নদীগুলি দুরতিক্রম্য, তখন দুঃসংবাদ এল বড়োয়া সাগর থেকে। ব্যাপক অরাজকতা শুরু হয়েছে সেখানে। তৎপর হয়ে উঠেছে দস্যুদল। প্রথমে কিছু ফৌজ পাঠালেন রাণী। তাতে প্রতিকার হল না। তখন তিনি স্বয়ং অশ্বারোহণে সেখানে ফৌজ নিয়ে গেলেন। অতর্কিতে বন্দী করলেন দুষ্কৃতকারীদের। যারা নরহত্যা করেছিল, তাদের দু'জনের ফাঁসী হল। কয়েকজন জীবিকার অভাবে দস্যুদলে যোগ দিয়েছিল। তাদের নিয়ে তিনি ফিরে এলেন এবং সেনাদলে ভর্তি করে নিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করলেন। বড়োয়া সাগর এবং অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু সেনা সন্নিবেশ করে গ্রাম-বাসীদের আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু বারবার অরছা ও দতিয়ার আক্রমণে গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল বলে রাণী তাঁর ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবার সময় পাননি। দস্যুদলকে সেনাদলে নিযুক্ত করার জন্য তাঁকে একদিন অনুযোগ করেছিলেন শুভানুধ্যায়ীরা। কিন্তু উত্তরকালে যখন প্রয়োজন হয়েছিল, তখন এই দস্যুদলই ইংরেজের হাত থেকে ঝাঁসীকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল।

কিছুদিন পরে ঝাঁসীতে রাণী হরিদ্রাকুঙ্কুমের উৎসবে নতুন সমারোহের প্রবর্তন করলেন। রাজপ্রাসাদে একটি বিশাল আধারে হরিদ্রাকুঙ্কুম রাখা হল। নগরের সমস্ত মহিলাদের কাছে নিমন্ত্রণ গেল। রাণীর পার্শ্বচারিণীদের মধ্যে কাশী, সুন্দর, মান্দার, হীরা কোরিণ, ঝলকারী কোরিণ, জুহী এবং মোতি নাটকওয়ালী, গঙ্গুবাঈ—এঁদের নাম পাওয়া যায়। রাণীর আহ্বানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,

মরাঠা এবং অন্যান্য জাতির সমস্ত মেয়েরা এলেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে রাণী তাঁদের নিজে আপ্যায়ন করলেন। উচ্চ এবং নীচবর্ণের প্রভেদ তিনি কখনই মানতেন না। মেয়েরা তুপুরবেলা নতুন কাপড় পরে অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে এলেন। সর্দারদের বাড়ির মেয়েরা এলেন তাঞ্জামে, পাল্কিতে চড়ে, ভালাদার, চোপাদার পাশে নিয়ে। কেউ এলেন হেঁটে, কেউ বা এলেন চৌদোলায়। রাজপ্রাসাদের বিশাল অঙ্গনের এখানে সেখানে বড় বড় জরীর ছাতা ও তার পাশে ফুলের মালা আর গুঞ্জা বেচতে বসেছে ফুলওয়ালীরা। রাণী নিজে সাদা শাড়ি পরে তাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে সকলকে হরিদ্রাকুঙ্কুমের টিপ, চুলে সুগন্ধি ফুলের মালা, চন্দন প্রলেপ, মিষ্টান্ন, রৌপ্য দক্ষিণাসহ উপহার, গুলাব, আতর, আর পানসুপারী দিয়ে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। তাঁর 'গায়কী' মিঠে সুরে গান ধরল—'আজু নবরঙ্গ শ্যামসঙ্গ ব্রিজললনারে'। রাণীকে কতজন কত উপহার দিলেন—বুন্দেলখণ্ডী পিতল তামার বাসন, কোরী চিত্রকরের আঁকা চিত্রাবলী, কাঠের আসবাব, পুতুল, মাটির ফুলদানী, ধূপদানী, রেশমের কাপড়। সব জমা হল। রাণী হাসিমুখে সেই সব উপহার অন্তঃ-পুরিকাদের মধ্যে বণ্টন করলেন। বড় বড় জরীর ছাতায় রোদ ঝলকাচ্ছে। পলাশ ফুলের পাঁপড়িগুলি মেয়েদের খোঁপায় শুকিয়ে যাচ্ছে। এমনি করেই রাত ন'টা অবধি উৎসব চলল।

এই ঘটনার অনেক পরে, যখন এই সব আনন্দের দিন গল্পকথায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে, তখনও মাঝে মাঝে মেয়েরা নিচুগলায় আস্তে আস্তে সেই সব দিনের কথা গল্প করতেন।—বাঈসাহেবকে সেদিন কিরকম দেখিয়েছিল, কত হাসি, কত কথা, কত আনন্দ করেছিলেন বাঈসাহেব, এই সব কথা তাঁরা ভয়ে ভয়ে নিচুগলায় আলোচনা করতেন—কেননা তখন রাণী লক্ষ্মীবাঈ একটি নিষিদ্ধ নাম।

ঝাঁসীর রাজবংশের কুলস্বামিনী বা গৃহদেবতা মহালক্ষ্মীর মন্দির ছিল লছমীতাল হ্রদের তীরে। রাজপ্রাসাদ থেকে তার দূরত্ব এক মাইলের মধ্যে। ঝাঁসী শহরটির পথঘাট অসমতল—কোথাও চড়াই আবার কোথাও উৎরাই। আজও সেই সব বাঁধান রাস্তা আর তার তু'পাশের শতাধিক বৎসরের বুন্দেলখণ্ডী ছাঁদের বাড়িগুলি একভাবেই

বিদ্যমান। কেবলমাত্র লছমী দরওয়াজার সুবিশাল কাঠের কপাটে সামান্য ফাটল ধরেছে, আর দরজার পাশে নৌবৎখানায় জমেছে জঞ্জাল। সেইপথ দিয়ে নিত্য রাণী যেতেন সন্ধ্যাবেলা মহালক্ষ্মীর আরতি দর্শন করতে। ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদের যে অংশটুকু এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি তার অনেকগুলি মহলের একটি মহল মাত্র। অপর একটি মহল ছিল পশ্চিমদিকে। মাঝখানে শহরের দিকে মুখ করে ছিল খাস মহল। সেদিকে ছিল প্রধান দরজা। সেই দরজা দিয়ে সারেংগী ঘোড়ীর পিঠে চড়ে মহারাষ্ট্রীয় রমণীর পোশাকে রাণী প্রত্যহ বেরুতেন মন্দিরের পথে, সঙ্গে চলতেন বালক দামোদর অপর একটি ঘোড়ায় চড়ে।

পথের দু'পাশে মানুষ দাঁড়িয়ে দেখত তাঁকে। যে গৃহগুলি আজ জীর্ণ, অবহেলিত, তাদের ঝরোখা খুলে তাকাতেন পুরবাসিনীরা। সকলের কল্যাণকামী দৃষ্টিতে অভিনন্দিত হত তাঁর পথ। ভিস্তিওয়ালা পথে জল ছিটিয়ে গিয়েছে, ফুলের মালা আর গুঞ্জা নিয়ে বুন্দেলখণ্ডী মেয়েরা বিক্রি করতে বেরিয়েছে। মহারাষ্ট্রীয় রমণীদের নিত্য প্রসাধনে ফুল চাই। ওপাশে মুরলীধর মন্দিরে সান্ধ্য-আরতির ঘণ্টা বাজছে, ভজন গান উঠছে চত্বর থেকে। পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে সিপাহীরা। কখন রব উঠছে—তফাত যাও, তফাত যাও! ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে টগ্‌বগ্ করে হয়তো চলেছেন সওয়ার। লছমীতাল হ্রদের বিস্তৃত বুকে তখন সন্ধ্যার শান্ত ছায়া। আজকের জীর্ণ শিবালয়গুলিতে সেদিন প্রদীপ ও ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে গিয়েছেন পুরোহিত, কুমারী মেয়েরা জল ঢেলে দিয়েছেন শিবের মাথায়। আজ যেখানে ধোপারা কাপড় কাচে আর ভাঁটি চড়ায় আগুন জ্বেলে, সেদিন সেখানে সারি সারি বসেছে কাঙাল, ভিখারী, অনাথ, আতুর। মহালক্ষ্মী মন্দির থেকে তারা নিত্যকার মতো প্রসাদ পাবে আরতি অন্তে। আজকের জীর্ণ মহালক্ষ্মী মন্দির সেদিন গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। মন্দিরে প্রবেশের সেতুটির দুইপাশে ফুটে থাকত পদ্ম। মন্দিরের বাগানে ফুল ফুটে আলো করত। মন্দিরে মহালক্ষ্মী দেবীর মূর্তি মহা সমারোহে দীপ্যমান। স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত তাঁর দেহ, রূপার আধারে জ্বলত দীপ। একপাশে সুবৃহৎ পেতলের প্রদীপে জ্বলত

অনির্বাণ নন্দাদীপ। বালক দামোদরের অক্ষয় আয়ু কামনা করে রাণী নীরব প্রার্থনা নিবেদন করতেন দেবতার পায়ে। ফিরে আসতেন যখন তখন ঘরে ঘরে বাতি জ্বলেছে। মশাল হাতে রক্ষীরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে আসত। লছমীদরওয়াজার নৌবৎখানায় সানাইয়ে তখন ইমন কল্যাণের সুর।

কোন কোনদিন বিশেষ উৎসবের দিনে রাজা গঙ্গাধরের সখের জিনিষ উত্তরভারত বিখ্যাত সুবর্ণ-মেনা বা তাঞ্জাম বেরুত। পাল্কিটি রূপোর, মাঝে মাঝে সোনার কারুকাজ। ভেতরে লাল ভেলভেটের ওপর সোনার কারুকার্য করা গদী এবং পর্দা। রাণী যেদিন এই পাল্কিতে যেতেন সেদিন পাল্কি বহন করতেন তাঁর সহচরীবৃন্দ। রাজকোষ থেকে তাঁদের দেওয়া হত জরীর চেলি, জরীর কাপড়, পায়ে থাকত নাগরা। একহাতে রূপোর চামর দোলাতেন তাঁরা, অপর হাতে বইতেন পাল্কি। সামনে রণবাদ্য বাজিয়ে চলত বাজনাদারের দল। পেছনে অনুসরণ করত ২০০ আফ্‌ঘান পদাতিক, ১০০ জন ঘোড়সওয়ার।

ঝাঁসী রাজপ্রাসাদের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারটির শোভাবর্ধন করবার দিকেও রাণীর নজর ছিল। যদিও ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্য, দর্শন, কাব্য পাঠের সময় মিলত না তাঁর, তবুও নেবালকর বংশের গৌরবচিহ্ন এই গ্রন্থাগারটির রক্ষণাবেক্ষণ করবার দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী মূল্যবান রেশম ও জরীর কাপড়ে হস্তলিখিত পুঁথি বাঁধিয়ে রাখা হত। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্ততঃ কুড়িটি বিভিন্ন আকারের অনুলিপি ছিল। তার একখানি রাণী সর্বদা নিজে ব্যবহার করতেন।

রাতে শোবার আগেও তিনি গীতা পাঠ করতেন কোন কোনদিন। একেবারে অন্ধকার ঘরে শুতে অনভ্যস্ত ছিলেন। বালক দামোদর তাঁরই সঙ্গে ঘুমোতেন। ঘরে সারারাত একটি রূপোর বাতি জ্বলত।

পারোলাতে নেবালকরদের পুরোহিত বংশ ছিলেন ঢেকরেরা। ঢেকরে পরিবার সুবিখ্যাত ধনী ছিলেন। টাকা ধার দেওয়া ছিল তাঁদের ব্যবসায়। ঝাঁসীতে ঢেকরে পরিবারের মেয়েরা যেরকম মূল্যবান অলঙ্কারাদি পরতেন তা দেখে ঝাঁসীর জনসাধারণ চমৎকৃত হতেন

ঢেকরে পরিবারের লালুভাও ঢেকরে একদা রাণীর কাছে একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে এলেন। নিবেদন করলেন, ব্রাহ্মণ কিছু সাহায্য প্রার্থী। ব্রাহ্মণ জানালেন, তিনি কাশীনিবাসী। প্রথমা পত্নী গত হওয়াতে দ্বিতীয়বার বিবাহেচ্ছু। তিনি দেশস্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। স্বশ্রেণীর সর্বতোভাবে যোগ্য একটি দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কন্যার পিতা চারশ' টাকা কন্যাপণ চেয়েছেন। ব্রাহ্মণ যুক্তকরে বললেন—'তে মীঁ গরিবানেঁ কোঠুন আনাবে ?—আমি গরীব ব্রাহ্মণ, কোথা থেকে চারশ' টাকা পাব ?' রাণী তাঁকে পাঁচশ' টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন এবং কৌতুক করে বললেন—'বিবাহের লগ্ন স্থির হলে আমাকে কুঙ্কুমপত্রিকা দিয়ে নিমন্ত্রণ করতে ভুলবেন না।'

ডিসেম্বর ১৮৫৭-তে ঝাঁসীতে তীব্র শীত পড়েছিল। সাধারণত মধ্যভারতে শীতের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি এবং আবহাওয়ার দিক থেকে ঝাঁসী বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য জায়গার মতোই শুষ্ক জলবায়ুর দেশ। সেখানে গ্রীষ্ম এবং শীত দুই-ই প্রবল।

সে বছর শীতের সন্ধ্যায় একদা মহালক্ষ্মী মন্দির থেকে ফিরবার সময় রাণীর ঘোড়ার চারপাশে ভিড় করল শীতার্ত দরিদ্র গ্রামবাসীর দল। লক্ষ্মণরাও দেশমুখ জানালেন, তারা শীতের প্রকোপে ক্লিষ্ট ; তাই রাণীর কাছে সাহায্য চায়। রাণী তাদের নিজমুখে চতুর্থ দিবসে সকালে রাজপ্রাসাদের সামনে জমায়েত হতে আদেশ করলেন। তাঁর ঘোষণা শহরের পথে পথে দবণ্ডী বাজিয়ে ঘোষণা করা হল। শহরের সমস্ত খলিফাদের একত্র করে রাণী তাদের একহাজার তুলোর কোট এবং টুপী তৈরি করতে আদেশ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে সেই কোট, টুপী এবং একটি করে কম্বল দরিদ্রদের বিতরণ করা হল।

রাণীর অশ্বপরীক্ষা সম্বন্ধে বিবিধ কাহিনী শোনা যায়। মহা-রাষ্ট্রীয়রা অশ্বারোহণে অতীব দক্ষ। অসমতল পর্বত সমাকীর্ণ মহারাষ্ট্রে চলাফেরা করতে হলে অশ্বারোহণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মহারাষ্ট্রীয় রমণীরাও সুদক্ষ অশ্বারোহিনী হতেন। একশ' বছর আগে ভারতবর্ষের সর্বত্র দ্রুত গমনাগমনের জন্য ঘোড়া ব্যবহৃত হত। আর উট, হাতী ইত্যাদি ব্যবহৃত হত দুর্গম এবং কষ্টসাধ্য যাত্রার

জন্য। আজও রাজস্থান, মধ্যভারত, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি জায়গায় চোখে পড়ে উটের পিঠে সারি দিয়ে চলেছে গ্রামবাসীরা।

স্বভাবতঃই প্রতিটি ভারতীয় রাজ্যে ভাল ঘোড়া রাখা এবং সংগ্রহ করবার প্রচলন ছিল। ঘোড়ায় চড়া একটি একান্ত সাধারণ ব্যাপার বলে গণ্য হত এবং অতীব সুদক্ষ অশ্বারোহী না হলে কেউ খ্যাতি লাভ করতে পারত না।

উত্তর হিন্দুস্থানে ঘোড়ার সমঝদার হিসাবে তখন তিনজন অশ্বারোহীর নাম সুবিখ্যাত ছিল—নানাধুন্ধুপন্থ, বাবাসাহেব আপ্তে গোয়ালিয়ারকার এবং ঝাঁসীর রাণী।

বাবাসাহেব আপ্তের অশ্বকুশলতার সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনা যায়। একদা এক ইংরেজের সঙ্গে তিনি বাজি ফেলেছিলেন। কথিত আছে, উক্ত ইংরেজ অশ্বচালনাতে অতীব দক্ষ ছিলেন। তিনি বাবাসাহেব আপ্তেকে বললেন 'শুনেছি আপনি একশ' রকম কৌশল জানেন, কিন্তু আমি জানি একশ' একটি।'

দুইপক্ষের মধ্যে কথা হল যে, তাঁরা উভয়েই একটি করে কৌশল দেখাবেন। একটি সুবৃহৎ কূয়োর মুখে কাঠের বর্গা ফেলা হল। সে কূয়োর মধ্যে কোন কারণে পড়ে গেলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। সাহেব জানালেন, তিনি সেই কূয়ো ঘোড়ায় চড়ে পার হবেন। সকলে যখন রুদ্ধশ্বাসে তাঁকে দেখছে, তখন বাবাসাহেব আপ্তে ঘোড়া নিয়ে অন্যদিক থেকে এলেন ও দুই অশ্বারোহী বরগাটির মধ্য-কেন্দ্রে এসে মুখোমুখি দাঁড়ালেন। একটি চরম সঙ্কটের মুহূর্ত। অপেক্ষা করলে ঘোড়া পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, পিছু হটে আসা অসম্ভব এবং সামনের পথও বন্ধ। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় সকলে বিচলিত। বাবাসাহেব আপ্তে বললেন—আমি তোমার কাছে একটি কৌশলমাত্র দেখতে চাই যে, তুমি এই অবস্থা থেকে তোমার ঘোড়াকে নিরাপদে কূয়ো পেরিয়ে নিয়ে যেতে পার কি না! সাহেব পরাজয় স্বীকার করে। বললেন—আমি সেরকম কোন কৌশল জানি না। বাবাসাহেবের নির্দেশে তাঁর ঘোড়া পেছনের পায়ে ভর করে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনে ঘুরে গেল এবং কূয়ো পার হয়ে নেমে গেল। সাহেবও নিরাপদে উত্তীর্ণ হলেন। বাবাসাহেব আপ্তে বললেন, এবার তোমার বাকি একশ'টি কৌশল

দেখাতে পার। সাহেবের উৎসাহ প্রশমিত হবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছিল। কিন্তু তিনি গুণের সমাদর করতে জানতেন। তাই খোলাখুলিভাবে বাবাসাহেবকে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করলেন।

রাণীর সম্বন্ধে যেসব গল্প শোনা যায় তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই সর্বাধিক প্রচলিত।

একদা জনৈক অশ্ববিক্রেতা দুটি বাছাই করা ঘোড়া এনেছিল তাঁকে দেখাতে। রাণীকে ঘোড়াগুলির দাম নিরূপণ করতে অনুরোধ জানাল অশ্ববিক্রেতা। রাণী দৃশ্যতঃ শ্রেষ্ঠ ঘোড়াটির দাম জানালেন পঞ্চাশ টাকা এবং অপরটির দাম জানালেন সহস্র টাকা। কারণ জানালেন এই যে, যদিও ঘোড়াটি দেখতে অতীব সুন্দর কিন্তু তার নিশ্বাস গ্রহণ ও গতিভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় যে তার ফুসফুস জখম। অতএব তার দাম কোনমতেই পঞ্চাশ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। অশ্ববিক্রেতা সবিস্ময়ে তাঁর কথা স্বীকার করল। বলল—একমাত্র যত্ন করেই আমি ঐ জখম ঘোড়াটির চেহারা ঠিক রেখেছি। অবশ্য রাণী দুটি ঘোড়াই কিনলেন। এবং রুগ্ন ঘোড়াটিকে আরামে রাখবার সুবন্দোবস্ত করলেন।

তাঁর পুরনো অশ্ববিক্রেতা আর এক দিন একটি অতি সুন্দর সুগঠন তেজী ঘোড়ী নিয়ে আসে। পরম দুঃখের সঙ্গে জানায়, এই দামী ঘোড়ীটিকে সে কোথাও বিক্রি করতে পারছে না। কে জানে কেন, পিঠে উঠলেই ঘোড়ীটি ছটফটিয়ে উঠে আরোহীকে ফেলে দেয়। রাণী একবার চড়ে দেখতে চাইলেন। পিঠে চড়ে সামান্য ঘুরে এসে তিনি জানতে চাইলেন, কত দাম পেলে সে ঘোড়ীটি বেচতে রাজী আছে। কিনবার পর তিনি বললেন, ঘোড়ীটির ডানদিকে পাঁজরের কাছে কোনও বেদনা আছে, সেজন্য পা দিয়ে ধাক্কা দিলেই যন্ত্রণায় সে ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে। তাঁর আদেশে অশ্বচিকিৎসক এলেন। অস্ত্রোপচারের পর একটি পেরেক বার করা হল ডানদিকের পাঁজর থেকে। সম্ভবতঃ জিনপোষ থেকে পেরেকটি সেখানে বিঁধেছিল। এই ঘোড়ীই পরে তাঁর একান্ত প্রিয় হয়ে ওঠে। রাণী তার নাম দিয়েছিলেন সারঙ্গী ঘোড়ী।

রাণীর স্বাধীন রাজত্বের সময়ে ঝাঁসীর কেল্লায় মাত্র দুইজন বন্দী ছিলেন। একজন সদাশিব নারায়ণ। তাঁর পরিচর্যা এবং

আরামের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অপরজন ছিলেন মালহরি। এই শেষোক্ত ব্যক্তি গঙ্গাধররাও-এর নাট্যশালার নর্তকীদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাঁর জিম্মাতে ছিল নাট্যশালার বহুমূল্য পোশাক, অলঙ্কার প্রভৃতি। ১৮৫৪ সালে ঝাঁসী ব্রিটিশ অধিকারে যাবার সময়ে মালহরি কিছু বহুমূল্য অলঙ্কার নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ সালের শেষে রাণী তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন। এই মালহরি ব্রিটিশ সৈন্যদের আগমনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন। রাণীর প্রতি তাঁর বিরুদ্ধ মনোভাব কেল্লার সকলেই জানতেন। একমাত্র এই ব্যক্তির বিষয়ে রাণীকে পরে কঠোর হতে দেখা গিয়েছিল। অন্যথায় তাঁর চরিত্রে অনাবশ্যক কঠোরতা একেবারেই ছিল না।

এইসময় গোয়ালিয়ারের কোঙ্কনস্থ নাটকমণ্ডলী নিয়ে নাট্যাধিকারী সদোবা ঝাঁসীতে এলেন। শহরে তাঁর বাসস্থান নির্দিষ্ট হল। কেল্লা থেকে প্রত্যহ সিধা যেতে লাগল। শহরে পনেরোদিন ধরে বাণাসুর, রাসক্রীড়া প্রভৃতি নাটক অনুষ্ঠান হল। শেষে রাজ-প্রাসাদের প্রাঙ্গণেও নাটক অভিনয় হল। অন্তঃপুরিকারা দেখছেন, রাণীও বসেছেন,—নাটক হচ্ছে হরিশ্চন্দ্র। শ্মশানে মৃৎকলস ভাঙবার দৃশ্য অভিনীত হবার সময় প্রাচীনারা নিষেধ করলেন। বললেন, এই দৃশ্য বাড়িতে অভিনয় করে কাজ নেই। সদোবা কাতর নেত্রে রাণীর দিকে তাকালেন। রাণী বললেন—না, ওকে ওর মতো অভিনয় করতে দিন। অভিনয় হল। যখন শ্মশানে হরিশ্চন্দ্র মৃৎকলস ভাঙলেন, তখন প্রাচীনারা 'হা অপশকুন আহে,' অর্থাৎ হায় অমঙ্গল হল, বলে সভাস্থল ত্যাগ করলেন।

পনেরোদিন ধরে নাটক করে সদোবা ঝাঁসী ত্যাগ করেন। যাবার আগে এই নাটকদলকে অলঙ্কার, ধুতি চাদর, পাগড়ী ও চার হাজার টাকা দেওয়া হল।

এই নাটক অভিনীত হবার অনেকদিন বাদেও প্রাচীনারা বলতেন, সেই অমঙ্গল দৃশ্য অভিনয়ের সম্মতি দিয়েই রাণী ঝাঁসীর ওপর দুর্ভাগ্য ডেকে আনলেন।

কিন্তু সেকথা সত্য নয়। তার অনেক আগেই সমরায়োজনে তৎপর ক্যানিং-এর জরুরী এত্তেলায়, চীন, পারস্য, আফ্রিকার ব্রিটিশ এলাকা

থেকে ব্রিটিশ সৈন্যরা জাহাজ বোঝাই হয়ে ভারতের পথে রওনা হয়েছে। আধখানা পৃথিবী পাড়ি দিয়ে একখানা পাল তোলা জাহাজ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭-তে বোম্বাই-এর বন্দরে এসে পৌঁছেছে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে এক প্রৌঢ় সৈনিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখেছেন ভারতের বেলাভূমিকে নিকট থেকে নিকটতর হতে। মালোয়া এবং মধ্যভারতে শান্তি স্থাপনার জন্য তিনি এসেছেন। তাঁরই নাম হিউরোজ।

তেরো

হিউরোজের নেতৃত্বে মালোয়া ও মধ্যভারত অভিযান শুরু হবার আগে বুন্দেলখণ্ডের তৎকালীন পরিস্থিতি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

ঝাঁসীতে সিপাহীদের অভ্যুত্থান এবং ইংরেজদের হত্যার খবরে প্রথমে বুন্দেলখণ্ড ও তৎপর ধীরে ধীরে সাগর ও নর্মদা ডিভিশানের অন্তর্গত সর্বত্র ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল। সাগর একটি সামরিক ঘাঁটি। সেখানে 31st ও 42nd B. N. Infantry ও 3rd Irregular Cavalry ছিল। ঝাঁসীর খবর পাবার পর সাগরের ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনরকম বিক্ষোভ দেখাবার আগেই ভারপ্রাপ্ত অফিসার ব্রিগেডিয়ার সেজ্ (Brig. Sage) সমস্ত সামরিক ও বেসামরিক ইংরেজ নরনারী শিশুদের নিয়ে সাগর কেল্লার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ভারতীয় গার্ডদের সরিয়ে দিলেন এবং আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কোনকিছু ঘটবার পূর্বেই এলাহাবাদ থেকে সাহায্য চাইলেন। 31st N. I. তখন পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার সেজের এই আচরণের তাৎপর্য বুঝতে পারেনি। এলাহাবাদের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী এবং গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারী ব্রিগেডিয়ার সেজের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে কৈফিয়ৎ তলব করলেন। ১৮ই জুলাই ১৮৫৭ সালে আর. জি. বার্চ, ডেপুটি এ্যাড্‌জুটেন্ট জেনারেলের কাছে চিঠিতে পরিষ্কারই লিখলেন—

> 'ব্রিগেডিয়ার সেজ হঠাৎ সমস্ত ক্যান্টনমেণ্ট খালি করে ইংরেজ নরনারীদের নিয়ে কেল্লায় চলে গিয়েছেন। তাঁর এই

আচরণের কৈফিয়ৎ প্রয়োজন। কেননা 31st Native Infantry-র মধ্যে কোনরকম বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যায়নি।'

ব্রিগেডিয়ারের আচরণে সিপাহীরা ইংরেজ অফিসারদের দুর্বলতা বুঝতে পারল।

ইতিমধ্যে বাণপুরের রাজা ঠাকুরমর্দন সিংহ (জুলাই, ১৮৫৭) খুরই কেল্লা অধিকার করেন। খুরই সাগর থেকে উনত্রিশ মাইল উত্তরে। সেখানে সরকারী তহশীলদার আহম্মদ বক্স সমগ্র আফঘানী সৈন্য নিয়ে বাণপুরের রাজার সঙ্গে যোগ দিলেন। খুরই-তে একটি ঘাঁটি স্থাপিত হল।

খুরই থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে ঠাকুরমর্দন সিংহ ঝাঁসীর অন্তর্গত ললিতপুরে পৌঁছলেন। ললিতপুর অধিকার করবার পর তিনি নিকটস্থ বালাবেহুত অধিকার করলেন। ললিতপুর, বালাবেহুত প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। বালাবেহুতের পর তিনি সোজা চন্দেরী চলে গেলেন। চন্দেরীর প্রস্তরদুর্গ ও প্রস্তর নির্মিত শহর ভারতীয়দের অধিকারে এল। শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব্ আলী বাণপুরের রাজার সহায়তা করলেন।

ভূপালের নবাববংশীয় মহম্মদ ফজিল খাঁ সংক্ষেপে নবাব আমাপানি নামে পরিচিত ছিলেন। রাথ্‌গড় পূর্বাপর নবাব আমাপানির অধিকারে ছিল। ১৮০৭ সালে সিন্ধিয়া রাথ্‌গড় অধিকার করে নবাব আমাপানিকে অধিকারচ্যুত করেছিলেন। ১৮২৬ সালে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধির ফলে আমাপানি পুনর্বার রাথ্‌গড় ফিরে পান।

মহম্মদ ফজিল খাঁ অথবা আমাপানি বাণপুরের রাজার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে রাথ্‌গড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। 31st July 1857-এ সাগরে অবস্থিত দুইটি রেজিমেণ্টের মধ্যে, 42nd. B.N.I.-র শেখ রমজান, সমগ্র 42nd. রেজিমেণ্টকে সঙ্গে নিয়ে অভ্যুত্থান করলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, দুর্গস্থিত ইংরেজ নরনারীদের ওপর কোন আক্রমণ হল না। সাগর শহরের তোষাখানা থেকে দশ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে শেখ রমজান সমস্ত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব্ আলীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

এইবার বাণপুরের রাজা ঠাকুরমর্দন সিংহ এবং শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব্ আলী নিকটস্থ তহশীলগুলিতে সম্মিলিত অভ্যুত্থান করবার

জন্য নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন। কিছু বাঘীসিপাহী দামোহ্ পৌঁছল। দামোহ্ জেলার ডেপুটি কমিশনার শঙ্কিত হয়ে জেলখানার ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

সাগর, দামোহ্ এবং জব্বলপুরে সিপাহী ও জনসাধারণ সকলেই 'বাঘী' বা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। দামোহ্ জেলার লোধী, ঠাকুর, কৃষাণরাও, ইংরেজের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করল। হিণ্ডোরিয়ার তালুকদার কিশোর সিংহ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। শাহ্‌গড়ের রাজা বিনাইকা অধিকার করলেন।

সাগরে 31st N. I.-র সামান্য কিছু সৈন্য তখনও ইংরেজের বিশ্বস্ত ছিল। এই 31st N. I.-র সৈন্যরা শাহ্‌গড়ের রাজার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য বিনাইকাতে এল। শাহ্‌গড়ের রাজার ফৌজের কাছে পরাভূত হল তারা। শাহ্‌গড়ের রাজার এক সর্দার পর্জন সিংহ ওরফে বোধন দৌয়া গড়াকোটা অধিকার করলেন। বাণপুরের রাজা সাগরের বিদ্রোহী 31st Regiment-এর অবশিষ্টাংশকে নিয়ে সাগর আক্রমণ করলেন।

ইতিমধ্যে জব্বলপুরে, 52nd B. N. I. বিদ্রোহী হয়েছে। জুলাই মাসে জব্বলপুরস্থ ইংরেজ অফিসাররা জানতে পারেন 52nd Regiment-এ অভ্যুত্থান হবার সম্ভাবনা আছে। গুপ্তচরের মুখে খবর পান গোণ্ডরাজা শঙ্করশাহ এবং তাঁর ছেলে রঘুনাথশাহ অন্যান্য সর্দার ও সামন্তদের সঙ্গে একজোটে, আগস্টমাসে মহরমের তারিখে অভ্যুত্থানের দিন ধার্য করেছেন। সিপাহীদের সঙ্গে বোঝাপড়া না হওয়ার দরুন তারিখটি দুই মাস পিছিয়ে দশহরার দিন ধার্য করা হয়েছে। যে ব্যক্তি রাজা শঙ্করশাহের নাম বলেছিল তার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে শঙ্করশাহের বংশানুক্রমিক বিরোধ ছিল।

গোণ্ডরাজ্য মোগল আমলে গোণ্ডোয়ানা নামে বিখ্যাত ছিল। চন্দেল্ল রাজপুতকুলকন্যা রাণী দুর্গাবতী গোণ্ডের রাজবধূ হয়ে এসেছিলেন। তাঁর বংশধর হৃদয়শাহের বিবাহ হয়েছিল বঘেলা রাজবংশে। গোণ্ডের রাজবংশ মূলতঃ রাজপুত ছিল।

একদা সুসমৃদ্ধ এই রাজ্যে রাণী দুর্গাবতী রাজত্ব করেছিলেন এবং গোণ্ডের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে তাঁর পতন ও মৃত্যু হয়।

রাণী দুর্গাবতীর পর গোণ্ডরাজ্যের দ্রুত অবনতি হয়েছিল। বুন্দেলখণ্ডে মরাঠা অধিকার স্থাপনের সময়ে সমগ্র গোণ্ডরাজ্যে রাজপুত অধিকার নষ্ট হয়ে গেল। শেষ রাজা সুমেরশাহ ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুমেরশাহের সঙ্গে সঙ্গে গোণ্ডরাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল। সুমেরশাহের ছেলে রাজা শঙ্করশাহ নামে মাত্র সম্পত্তি পেলেন। ইংরেজের সঙ্গে মরাঠা শক্তির সন্ধির পর শঙ্করশাহ মরাঠা প্রদত্ত জায়গীরটুকু থেকেও বঞ্চিত হলেন এবং রাজা নামের প্রহসন নিয়ে জব্বলপুর থেকে মাত্র চার মাইল দূর গ্রামে নির্বাসিত হলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল।

রাজা শঙ্করশাহ ও তাঁর পুত্র রঘুনাথশাহ ইংরেজ বিরোধিতার মন্ত্রণায় যোগ দিয়েছেন কি না, তদন্তের জন্য লেফটেনাণ্ট ক্লার্ক কুড়িজন সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে রাজা শঙ্করশাহের মাটির বাড়ি ঘেরাও করলেন। বন্দী করলেন বৃদ্ধ রাজা শঙ্করশাহ এবং তরুণ রঘুনাথ-শাহকে। পরিবারের বাকী তেরজন নারী, বালক বালিকা ও শিশুকে গরুর গাড়ি করে আনলেন জব্বলপুরে। রাজা শঙ্করশাহের রক্তাক্ত অভিসন্ধির অকাট্য প্রমাণস্বরূপ পাওয়া গেল একটি চণ্ডী স্তোত্র। "হে শত্রু সংহারিকা, তুমি শঙ্করের প্রতি প্রসন্ন হও, নিধন কর তোমার শত্রুকে।" এই কবিতা দেখে ক্লার্ক ঠিক করলেন, এই বৃদ্ধরাজা ও পুত্রকে ভয়াবহ কোন শাস্তি দিয়ে 52nd B. N. I.-র সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। তাঁদের উড়িয়ে দেবেন কামানের মুখে। কেননা "This type of execution is always feared by natives, since the body is left at the mercy of vultures and jackals and no funeral rite can lessen the pain or ease the path for the soul departing for heaven."

> 'এই ধরনের মৃত্যুদণ্ডকে ভারতীয়রা ভয় পায়। কেননা মৃতদেহ পড়ে থাকে শৃগাল শকুনের দয়ার ওপর। শাস্ত্রমতে সৎকারের অভাবে স্বর্গপথযাত্রী আত্মার কষ্টের এতটুকু উপশম হয় না।' (Charles Ball. Vol—I)

রাজা শঙ্করশাহের বয়স তখন সাতষট্টি। শ্বেত কেশ ও শ্মশ্রু শোভিত এই বৃদ্ধের হত্যা দেখবার জন্য বলপূর্বক তাঁর পরিবারবর্গকে

উপস্থিত করা হল। ভয়াবহ মৃত্যু আসন্ন। তবু রাজা শঙ্করশাহ ভয় পেলেন না। ঘৃণাপূর্ণ অবিচলিত কঠোর কণ্ঠে বললেন—

> 'আমাকে তোমরা হত্যা করতে পারবে না। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে আরো মানুষ। তারা তোমাদের তিলে তিলে হত্যা করবে।'

রঘুনাথশাহ পিতার অনুরূপ বীরত্ব দেখালেন। তাঁর সামনে বিস্ফারিত চোখে চেয়েছিল তাঁর শিশুপুত্র, আট বছরের কন্যা এবং পঁচিশ বছর বয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র। ক্লার্কের নির্দেশে কামান ছোঁড়া হল। এবং—

> 'তৎক্ষণাৎ দুটি মনুষ্যদেহের ছিন্নভিন্ন অবশিষ্ট উৎক্ষিপ্ত হয়ে রক্ত ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়ল রেসিডেন্সীর কম্পাউণ্ডে। চিল ও শকুনে যা পারল খেল। যতটুকু সংগ্রহ করা গেল পুঁটলি বেঁধে রাণীকে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ আগেও যাঁরা তাঁর স্বামী ও পুত্র ছিলেন, তাঁদের ভয়ঙ্কর স্মৃতি মাত্র সেই মাংসপিণ্ড।'

(Charles Ball. Vol—1.)

মূর্ছিতা রাণী, শোকবিহ্বলা রাজবধূ ও অনাথ শিশুদের নির্বাসিত করা হল দামোহ্ জেলার অন্তর্গত সিলাপরী গ্রামে। সদাশয় ব্রিটিশ সরকার রঘুনাথশাহের শিশুপুত্রের জীবিতকালে পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা ধার্য করলেন! আজ সে মাসোহারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাণী দুর্গাবতীর বংশধর এবং গোণ্ডরাজ্যের এককালীন রাজাদের

শেষ সন্তান বিংশ শতকের মধ্যাহ্নে কৃষিজীবী ছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসক্রমে তাঁর নাম ছিল বীরপ্রতাপশাহ।

ক্লার্কের ধারণা ছিল শঙ্করশাহ এবং তার পুত্র রঘুনাথশাহকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্তে 'নেটিভ' সিপাহীরা আতঙ্কগ্রস্ত হবে। তারা তা তো হলই না, বরঞ্চ বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

বিপন্ন আরস্কাইন পান্নার রাজার কাছে সাহায্য চাইলেন। সাগর, দামোহ্ এবং জব্বলপুর এইবার বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। পান্নার রাজা, কুমার শ্যামলেজুর সঙ্গে ছয় হাজার সৈন্য পাঠালেন। পান্নার সৈন্যের সহায়তায় মেজর আরস্কাইন সিমরিয়া এবং দামোহ্তে ইংরেজ অধিকার পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত করলেন।

জব্বলপুরের বাঘী পল্টন 52nd B. N. I. দামোহ্তে পান্নার সৈন্যদের কাছে পরাভূত হয়ে গড়াকোটা চলে গেল। সেখানে বোধন দৌয়া এই সৈন্যদের নিয়ে ভাপেল, বতৈরী এবং চূণা গ্রামে ইংরেজ প্রতিরোধ সংগঠন করতে লাগলেন।

এই থেকে বোঝা যাচ্ছে হিউরোজ মধ্যভারত অভিযান করবার সময়ে সমগ্র দক্ষিণ বুন্দেলখণ্ডে বিভিন্ন সামরিক নেতৃত্বে ইংরেজ বিরোধী সৈনিক ও জনসাধারণ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রতিরোধ সংগঠন করে অপেক্ষা করছিলেন।

চৌদ্দ

সার কোলিন ক্যাম্পবেল ১৪ই আগস্ট ১৮৫৭ সালে বিলেত থেকে কলকাতা এসে পৌঁছলেন। সতেরোই আগস্ট তিনি ভারতবর্ষের সমগ্র সেনাবাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ বা কমাণ্ডার-ইন্-চীফ-এর পদ গ্রহণ করলেন। অক্টোবরের শেষে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করলেন। আগস্টের মধ্য থেকে অক্টোবরের শেষ অবধি দশ সপ্তাহ ধরে তিনি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের অবস্থা তন্নতন্ন করে পর্যবেক্ষণ করলেন। ক্যানিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা স্থির করা হল। সে সময় সমগ্র অযোধ্যা বিদ্রোহী। রোহিলখণ্ড, দোয়াব, মধ্যভারত

সর্বত্র ব্রিটিশ অধিকার শ্লথ হয়ে গিয়েছে। দিল্লীর একটি বিশাল সামরিক গুদাম বা ম্যাগাজিন ভারতীয়দের অধিকারে। ফতেগড়ের কামান তৈরি করবার কারখানা সিপাহীরা নষ্ট করে দিয়েছে। পাঞ্জাবের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ। লখ্নৌ এবং আগ্রাতে দেশবাসীর বিক্ষোভ ধূমায়িত। কানপুরে হ্যাড্‌লকের অবস্থা একান্ত শোচনীয়। যেখানেই অভ্যুত্থান ঘটেছে, সেখানেই জনসাধারণ প্রথমে অধিকার করেছে সামরিক সরঞ্জাম এবং গুদামগুলি। ভারতে বলপূর্বক স্থাপিত ব্রিটিশ অধিকার উচ্ছেদ করতে হলে জনসাধারণের ওপর অত্যাচারের এই হাতিয়ারগুলিই প্রথমে খতম করা প্রয়োজন। তাই দেখা গিয়েছে সিপাহীরা সব সময়ই আগেভাগে সামরিক সরঞ্জামগুলি অধিকার করেছে। যখন সেগুলি আর রাখতে পারেনি তখন তা নষ্ট করে ফেলেছে। ক্যাম্পবেল আরো দেখলেন, বেঙ্গল আর্মির একলক্ষ সিপাহী এবং সমগ্র অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সমস্ত অধিবাসীই বিভিন্ন নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছে। ব্রিটিশের সাহায্যে সামরিক বাহিনী প্রেরণের প্রধান যোগাযোগ, রাস্তা ও নদীপথগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ক্যানিং-এর সঙ্গে পরামর্শের পর ক্যাম্পবেল গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে অবিরত সেনাবাহিনী পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। ক্যানিং এবং ক্যাম্পবেল দু'জনেই বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারত সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা শঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁদের সেই আশঙ্কার ফলে মালোয়া ও মধ্যভারত অভিযান বাহিনী গঠিত হল।

অভিযানের সামগ্রিক পরিকল্পনার পক্ষে বাংলা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ এই তিন প্রেসিডেন্সীর সমস্ত সেনাবাহিনী যথেষ্ট নয় বলে বিলেত থেকে সামরিক কর্মচারী ও ফৌজ আনবার বন্দোবস্ত করা হল। Bombay Column-এর সঙ্গে রাজপুতানা ফিল্ড ফোর্স (Rajputana Field Force), আর Madras Force অথবা সাগর ও নর্মদা ফিল্ড ফোর্স (Saugor and Nerbudda Field Force) নিয়ে সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া ফিল্ড ফোর্স (Central India Field Force) গঠিত হল। স্থির হল, দোয়াব, রোহিলখণ্ড ও অযোধ্যায় যখন কোলিন ক্যাম্পবেল যুদ্ধ করবেন তখন যাতে

গোয়ালিয়ার কন্টিনজেন্ট এবং মধ্যভারতের অন্যান্য বিদ্রোহীরা, তাঁকে বিপর্যস্ত করতে না পারে, সেইজন্য এই বাহিনীটি মধ্যভারতের ভিতর দিয়ে তিনমুখো অভিযান চালাবে। এই তিনটি বাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে এসে ঝাঁসীর সামনে মিলিত হবে এবং ঝাঁসী জয় করবে। সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ফিল্ড ফোর্সের প্রধান ঘাঁটি হবে মৌ। ঝাঁসী অধিকারের পর এই বাহিনীটি যাবে কাল্পিতে। সেখানে তাঁতিয়া টোপীর নেতৃত্বে একটি সুবিশাল বাহিনী শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি গঠন করেছে। কাল্পিতে যোগদান করবেন কোলিন ক্যাম্পবেল স্বয়ং। 'মাদ্রাজ কলাম' বা 'সাগর ও নর্মদা ফিল্ড ফোর্স', জব্বলপুর থেকে রওনা হয়ে এলাহাবাদ ও মীর্জাপুরের মধ্যস্থ বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ পুনর্স্থাপিত করে বুন্দেলখণ্ড দিয়ে বান্দায় যাবে।

ক্যাম্পবেলের নেতৃত্বে তিনজন সামরিক কর্মচারীকে এই দায়িত্ব বহনের জন্য নিযুক্ত করা হল। তাঁরা হচ্ছেন মেজর জেনারেল হিউরোজ, হুইট্‌লক ও রবার্টস। হিউরোজ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ফিল্ড ফোর্সের নেতৃত্ব করবেন। হুইট্‌লক মাদ্রাজ কলাম এবং রবার্টস রাজপুতানা ফিল্ড ফোর্সের ভার গ্রহণ করবেন।

এই সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ফিল্ড ফোর্সের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের জন্য ক্যানিং প্রথমে নির্বাচিত করেছিলেন জেনারেল জন জ্যাকবকে। আফঘানিস্থান ও বেলুচিস্থানের সীমান্তের লড়াইয়ে জন জ্যাকব নিজের যোগ্যতা প্রমাণিত করেছিলেন। ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা জন জ্যাকবকে তাঁর তৎকালীন অবস্থান পারস্য থেকে আসতে দিতে চাইলেন না। কাজে কাজেই হিউরোজকে নির্বাচিত করা হল।

হিউরোজ ১৮২০ সালে সামরিক জীবনে প্রবেশ করেন। ১৮৫৭ সালে তাঁর সেনাজীবনের সাঁইত্রিশটি বছর কেটে গিয়েছে। আয়ার্ল্যাণ্ড, সিরিয়া, ক্রিমিয়া এবং সিবাস্তোপোলের বিভিন্ন যুদ্ধে যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন তিনি। উচ্চতম সামরিক সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ, প্রবীণ এবং বিচক্ষণ সৈনিক হিউরোজ।

মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হিউরোজ সুচিন্তিত একটি পরিকল্পনা করলেন।

১৮৫৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তিনি সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া ফিল্ড

ফোর্সের দুই ব্রিগেড সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রথম ব্রিগেড, (যার নতুন নাম হল মালোয়া ফিল্ড ফোর্স) রইল মৌ-এ। দ্বিতীয় ব্রিগেড রইল সিহোরীতে।

(C. S. Stuart of Bombay Army), বম্বে আর্মির ব্রিগেডিয়ার সি. এস. স্টুয়ার্টের নেতৃত্বাধীনে মৌ-এ রইল প্রথম ব্রিগেড। তাতে রইল—

একটি স্কোয়াড্রন (14th Light Dragoons),
একটি ট্রুপ (3rd Bombay Light Cavalry),
দুটি রেজিমেণ্ট (Hyderabad Contingent Cavalry),
দুটি কোম্পানী (86th Regiment ও 25th Bombay N. Infantry),
একটি রেজিমেণ্ট (Hyderabad Contingent Infantry),
তিনটি Light Field Battery (1—Royal Artillery, 2—Bombay, 3—Hyderabad).
কিছু Sapper.

14th Dragoons-এর ব্রিগেডিয়ার Stuart-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় ব্রিগেড রইল সিহোরীতে। তাতে রইল—

(14th Light Dragoons ও 3rd Bombay Light Cavalry-র অবশিষ্টাংশ।
একটি রেজিমেণ্ট (Hyderabad Contingent Cavalry, 3rd Bombay European Fusiliers, 24th Bombay Native Infantry).
একটি রেজিমেণ্ট (Hyderabad Contingent Infantry).
একটি ব্যাটারী (Horse Artillery).
একটি লাইট ফিল্ড ব্যাটারী।
একটি ব্যাটারী (Bhopal Artillery).
একটি কোম্পানী (Madras Sappers).
বম্বে স্যাপার ও 'সীজ ট্রেইনের' একটি ডিটাচমেণ্ট।

২রা জানুয়ারী ১৮৫৮তে মৌ-এ খবর পৌঁছল সাগর দুর্গের অবস্থা শোচনীয়। কিছু ব্রিটিশ গোলন্দাজ ও চল্লিশজন ব্রিটিশ কর্মচারী, একশ' বাহাত্তরজন ইংরেজ নরনারী ও শিশুকে নিয়ে বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। ক্যান্টনমেণ্টে বেঙ্গল আর্মির এক হাজার সিপাহী এবং একশ'জন অশ্বারোহী রয়েছে। যদিও তারা ইংরেজের

প্রতি কোন বিরুদ্ধ মনোভাব দেখায়নি, তবুও ক্রমবর্ধমান অভ্যুত্থানের তুফানের মুখে তারা কতদিন বিশ্বস্ত থাকতে পারবে কে জানে।

মাদ্রাজ কলামের অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার হুইট্‌লকের ওপর জব্বলপুর থেকে সাগরে যাবার ভার পড়ল। হিউরোজ বুঝলেন হুইট্‌লকের পক্ষে তুই মাসের আগে সাগরে পৌঁছন সম্ভব হবে না। সুতরাং তিনি নিজেই যাবেন সাগরে।

১০ই জানুয়ারী প্রথম ব্রিগেড মৌ ছেড়ে রওনা হয়ে গেল। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের (বম্বে থেকে গোয়ালিয়ার) সমান্তরাল পথ ধরে এই ব্রিগেড দেওয়াস, সারংপুর, বিজৌরা, নিপালপরী, বরসাদ, রাঘোগড়, গুণা, সাদৌরা, চন্দেরী, বালাবেহুত হয়ে ঝাঁসী আক্রমণ করবার জন্য দ্বিতীয় ব্রিগেড-এর সঙ্গে মিলিত হবে।

১৫ই জানুয়ারী সকালে হিউরোজ দ্বিতীয় ব্রিগেড নিয়ে সিহোরী ছাড়লেন। সেদিনই তাঁরা ভূপাল পৌঁছলেন। ভূপালের বেগমসাহেবা অভ্যুত্থানের জন্য ব্যস্ত জনসাধারণকে নানারকম মিষ্টি কথায় বিভ্রান্ত করছিলেন আর ইংরেজ ফৌজের পথ চেয়ে দিন গুণছিলেন। সেই শুভদিন এল। ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে রণবাদ্য বাজিয়ে হিউরোজ পৌঁছলেন ভূপালে। ভূপালের বেগমসাহেবা মিত্রসুলভ আদরযত্নে পথশ্রান্তি দূর করলেন ইংরেজ ফৌজের। রাজপ্রাসাদে রাজ-অতিথির সম্মানে আপ্যায়িত হলেন হিউরোজ ও ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট। সৈন্যদের জন্য খানাপিনার ফলাও বন্দোবস্ত হল। ভূপালের বেগম তাঁর বন্ধুত্বের স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য ও আখেরের কথা ভেবে সাতশ' সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্র দিলেন। একদিনের পথ পিছিয়ে যে 'সীজ্‌ ট্রেন' আসছিল হিউরোজকে অনুসরণ করে তাদেরও রসদ এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দিলেন।

হিউরোজ চলেছিলেন সাগরের দিকে। পথে পড়ল রাথ্‌গড়ের তুর্ভেদ্য তুর্গ। রাথ্‌গড়ের তুর্গ বীণা নদীর তীরে, পাহাড়ের ওপরে। তুর্গম জঙ্গলাবৃত তার পথ। বীণা নদী বয়ে গিয়েছে পুব থেকে পশ্চিমে। উত্তরদিকে তুর্ভেদ্য জঙ্গল এবং তুর্গের পাদদেশে কুড়ি ফিট চওড়া পরিখা উত্তরদিককে আরো সুরক্ষিত করেছে। উপরন্তু

উত্তরদিকে প্রাচীরের বাইরে একটি দেয়াল আছে। পশ্চিমদিকে সাগর রোড ও রাথ্‌গড় শহর। সেদিকে দুর্গে প্রবেশের প্রধান গেট। গেটের দুইপাশে চৌকো এবং গোল বুরুজ। পুব এবং দক্ষিণে পাহাড়ের গা একেবারে খাড়া উঠে গিয়েছে। পুব ও দক্ষিণ থেকে রাথ্‌গড় আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। পশ্চিমদিকে শহর, অতএব সেদিকও দুর্ভেদ্য।

রাথ্‌গড়ের কেল্লায় ইংরেজদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করবার জন্য যারা সমবেত হয়েছিল তাদের মধ্যে সিপাহীদের সংখ্যা কম। বেশির ভাগই ছিল স্থানীয় অঞ্চলের জনসাধারণ। আরো উল্লেখযোগ্য এই যে, স্থানীয় কৃষিজীবী মানুষ রাথ্‌গড় কেল্লা থেকে চার ছ' মাইল দূরের গ্রামগুলিতেও ব্রিটিশ বিরোধী এক একটি সামরিক ঘাঁটি গড়ে অপেক্ষা করছিল। নোরীওনলী, কুরি প্রভৃতি গ্রামগুলি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

রাথ্‌গড়ে হিউরোজের সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রবল যুদ্ধ হল। তিনদিন ধরে পাহাড়, জঙ্গল এবং গুহার ভেতরে আত্মগোপন করে ভারতীয়রা যুদ্ধ করল ইংরেজদের সঙ্গে। হিউরোজের অধীনে তৎকাল অনুযায়ী আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র ও সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল। অপরপক্ষে ভারতীয়দের মধ্যে সিপাহীদেরও কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র ছিল। কিন্তু প্রধানতঃ তাদের লড়তে হয়েছিল তলোয়ার নিয়ে। ইংরেজদের বন্দুকের সঙ্গে সেইজন্য তারা বেশিক্ষণ যুঝতে পারেনি। তাদের পক্ষে যখন অসংখ্য হতাহত হয়েছে ইংরেজ পক্ষে আনু-পাতিকভাবে তখন কম ক্ষতি হয়েছে। তবু উল্লেখযোগ্য এই যে, অসমান সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে প্রধানতঃ কৃষিজীবী জনসাধারণ (যারা সামরিক শিক্ষা পায়নি তারাই) তিনদিন ধরে ইংরেজ ফৌজকে বিপর্যস্ত করেছিল।

এই অঞ্চলে ভারতীয়দের পক্ষে সামরিক নেতৃত্ব করেছিলেন মহম্মদ ফজিল খাঁ। তিনি ভূপালের বেগমের আত্মীয়। নবাব কামদার খাঁ, কিষেণরাম, ওয়ালিদাদ খাঁ প্রভৃতি নেতাদের নামও উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ ফজিল খাঁ অসীম বীরত্বের সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করেন দুইদিন। তৃতীয়দিনে তিনি বীণা নদী পার হয়ে গুহাতে লুকিয়ে যুদ্ধ করেন। ভূপালের বেগমের যে সেনাবাহিনী হিউরোজের

সঙ্গে ছিল তারাই মহম্মদ ফজিল খাঁকে ধরিয়ে দিতে সাহায্য করে। কিছুসংখ্যক ভারতীয় রাথ্‌গড় থেকে বারোদিয়া চলে যায়। সেখানে তারা যুদ্ধের জন্য নিজেদের সংগঠন করে অপেক্ষা করতে থাকে।

২৮শে জানুয়ারী, রাথ্‌গড় কেল্লার সামনে মহম্মদ ফজিল খাঁ, নবাব কামদার খাঁ, কিষেণরাম ও ওয়ালিদাদ খাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ওয়ালিদাদ খাঁ নির্ভয়ে স্বীকার করেন যে, রাথ্‌গড়ে ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধ সংগঠনে তিনি মহম্মদকে ফজিল খাঁ সাহায্য করেছিলেন।

রাথ্‌গড়ের কেল্লাতে মান্দাসোরের শাহ্‌জাদার প্রতি বাণপুরের রাজা ঠাকুরমর্দন সিংহের লিখিত একটি চিঠি পাওয়া গেল। সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে যে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে একটি সুপরিকল্পিত ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ সংগঠন করা হয়েছিল, উক্ত চিঠিতে সে কথা মনে করবার কারণ নিহিত রয়েছে। এবং ইংরেজ বাহিনী ঝাঁসীর পথে সর্বত্র এই প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। একান্ত সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্ব কখনও কখনও একক বীরত্বে সমুজ্জ্বল হলেও জনসাধারণের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান সংহত করে পরিচালনা করতে পারেনি, কাজেই ইংরেজের পক্ষে সুযোগ্য সামরিক নেতৃত্ব এবং উন্নত ধরনের সামরিক সাজসরঞ্জাম নিয়ে ভারতীয়দের পরাজিত করা সম্ভব হয়েছিল। তবুও মৌ থেকে ঝাঁসীর পথে প্রথম ব্রিগেড, সিহোরী থেকে ঝাঁসীর পথে দ্বিতীয় ব্রিগেড, সর্বদা প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য কেল্লা, শহর, গ্রাম ও জঙ্গলে প্রতিরুদ্ধ হয়েছে। জীবন-মরণ সংগ্রাম ব্যতীত ভারতীয়রা ব্রিটিশকে অগ্রসর হতে দেয়নি। শতবর্ষ পরে একটি সুবিশাল স্বাধীনতা সমরের ব্যর্থতার কাহিনীর মধ্যে সেই প্রতিরোধগুলির কথা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে বাণপুরের রাজার যোগাযোগের কথা পূর্বাধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। রাথ্‌গড়ে বাণপুরের রাজার লিখিত চিঠির ওপর কাজেই গুরুত্ব আরোপ করা চলে। ঝাঁসীর রাণীর এবং অন্যান্য ভারতীয় নেতাদের গঠিত গুপ্তচর বাহিনীর সাফল্যের কথা ইংরেজরা বারবার উল্লেখ করেছেন। ঝাঁসীর রাণী ও বাণপুরের রাজা গুপ্তচর বাহিনীর কাছে ইংরেজদের অগ্রগতির পরিকল্পনা জানতে পেরে রাথ্‌গড় এবং অন্যান্য জায়গার নেতাদের সঙ্গে একজোট হয়ে এই প্রতিরোধ গঠন করেছিলেন কি

না, সে সম্বন্ধে কাগজেকলমে কোন প্রমাণ নেই। যদিও প্রত্যেকটি ভারতীয় ঘাঁটি থেকে হিউরোজ ভারতীয়দের বিদ্রোহ সম্পর্কীয় প্রচুর কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন, তথাপি সেগুলি আজও অনুসন্ধিৎসু ভারতীয়দের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। রাথ্‌গড়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতীয় সৈন্য ও জনসাধারণের বারোদিয়া গমন, বারোদিয়ার পর মাদিনপুর প্রভৃতি প্রত্যেকটি জায়গায় দ্রুত খবরাখবর আদানপ্রদান, একটি দুর্গ বা ঘাঁটির পতনের পরই অন্যটিতে প্রতিরোধ সংগঠন ইত্যাদিতে ভারতীয়রা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ইংরেজদের অগ্রগতি ও সামরিক শক্তি যে তারা বহু আগে থেকেই জেনেছে, তাও তাদের সমরপদ্ধতিতে বোঝা গিয়েছে। এই ঘটনাগুলি থেকে মনে হয়, সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে একটি সুচিন্তিত সামরিক পরিকল্পনা ছিল এবং সেই পরিকল্পনার কেন্দ্র ছিল ঝাঁসী। ঝাঁসীর পথে ব্রিটিশ সৈন্য যাতে বিনা বাধাতে অগ্রসর হতে না পারে, সেজন্য ভারতীয়পক্ষে উদ্যম ছিল অপ্রতিহত।

রাথ্‌গড় কেল্লার সামরিক প্রস্তুতি ছিল দীর্ঘদিন লড়বার উপযোগী। তিন হাজার লোকের এক বছর ধরে খাবার মতো রসদ ছিল, কামান তৈরি করবার একটি বিশাল ছাঁচ ছিল। প্রচুর ঘোড়া, গরু, উট আর তা ছাড়া ছিল ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কীয় প্রচুর চিঠিপত্র। একটি খড়ে তৈরি ইংরেজ মহিলার বিচ্ছিন্ন মাথা আর লাল কাপড়ের ওপর উদ্যত হস্ত আঁকা তিনটি পতাকা পাওয়া গিয়েছিল। বিদ্রোহে যোগ দেবার এইগুলি ছিল নিশানা।

রাথ্‌গড়ের যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে পাঁচজন হত ও ষোলজন আহত হয়। ভারতীয় পক্ষে একশ' সাতাশজনকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল, নিহত হয়েছিল দু'শ'র বেশি তিনশ'র কম।

রাথ্‌গড়ে পরাজিত হয়ে ভারতীয় সৈন্যরা রাথ্‌গড়ের বারো মাইল উত্তর-পশ্চিমে বারোদিয়া চলে যায়। চান্দেরাপুর গ্রামে যে সব ভারতীয় সৈন্য জমায়েৎ হয়েছিল তারাও বারোদিয়া গিয়ে অপেক্ষা করে। বারোদিয়া গ্রামটি বীণা নদীর বাম তীরে ঘনজঙ্গল পরিবেষ্টিত। তাতে একটি ছোট কেল্লাও ছিল।

মধ্যভারত এবং রাজপুতানায় অতি-শীতোষ্ণ আবহাওয়া ও

দস্যুভীতির জন্য গ্রামগুলি তৈরি হত কেল্লার ছাঁদে। একটি নাতি-উচ্চ টিলা বা পাহাড় ঘিরে গ্রাম গড়ে উঠত এবং প্রাচীর দিয়ে উহা বেষ্টিত থাকত। আজও ঐসব অঞ্চলে সে ধরনের গ্রাম চোখে পড়ে।

বারোদিয়া গ্রামের আশেপাশের জঙ্গলে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করছিল ভারতীয় সৈন্যরা। বারোদিয়াতে বাণপুরের রাজার কামান ছিল আটটি, তাছাড়া বন্দুকধারী বিলায়েতী, আফঘান এবং পাঠান সৈন্যরা সুসজ্জিত ছিল।

বারোদিয়ার যুদ্ধের ওপর ভারতীয়রা যে কতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, তা তাঁদের সামরিক প্রস্তুতি থেকেই বোঝা যাবে। সাগর থেকে উনত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত খুরই-এ একটি শক্তিশালী কেল্লা ছিল। সেখানকার সমস্ত সামরিক শক্তি এনে বারোদিয়াতে জমায়েৎ করা হয়েছিল। বাণপুরের রাজা ঠাকুরমর্দন সিং নিজে নেতৃত্ব করছিলেন বারোদিয়াতে। রাথ্‌গড়ের যুদ্ধের সময়েও তিনি বারোদিয়াতে ছিলেন।

বারোদিয়ার প্রতিরোধ ঝাঁসীর রাণী এবং বাণপুরের রাজার যুক্ত পরামর্শে সংগঠিত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ঝাঁসীর রাণী সমগ্র বুন্দেলখণ্ড জুড়ে ছড়িয়েছেন তাঁর গুপ্তচর বাহিনী। কাল্পিতে তাঁতিয়া টোপী ও রাওসাহেবের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী ভারতীয় সামরিক ঘাঁটির সঙ্গেও তাঁদের যোগাযোগ ছিল।

ঝাঁসীর গোপালরাও সেরেস্তাদার এই সময় ষোলই জানুয়ারী ১৮৫৮ তারিখে মেজর আরস্কাইনকে জানান—

> 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল নানাসাহেবের পক্ষ থেকে একজন ভকীল ঝাঁসীতে আছেন। ঝাঁসীর রাণীর একজন ভকীলও কাল্পিতে আছেন। ঝাঁসীর রাণী ঝাঁসীতে নানাসাহেবের পরিবারবর্গের অভ্যর্থনার জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ রেখেছেন। বাণপুরের রাজা এবং নানাসাহেব দু'জনেই ঝাঁসীকেই তাঁদের শেষ আশ্রয়স্থল বলে ধরে রেখেছেন।
>
> বাণপুরের রাজার সৈন্যাধক্ষ্য লালা দুলকারা সাগরে একলা অসহায় বোধ করছেন। কাজেই বাণপুরের রাজা কাল্পি থেকে গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেন্টের একাংশকে আনিয়ে সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করছেন। সাদাৎ আলী এবং মহম্মদ আলীর নেতৃত্বে কিছু

সৈন্য তিনি ইতিমধ্যেই সাগরে পাঠিয়েছেন। অবশিষ্ট বাণপুরের ফৌজ তিন হাজার থেকে চার হাজার বন্দুকধারী সৈন্য এবং দুইটি কামান রাখা হয়েছে ঝাঁসীতে। তাদের মধ্যে মাত্র তেরশ' সৈন্য সম্পূর্ণ সশস্ত্র।

ঝাঁসীর রাণী বাণপুরের রাজাকে মাসে পাঁচশ' করে টাকা দিচ্ছেন। তিনি নিজে ধনীমহাজন ও দোকানদারদের লুঠ করে নিজের তোষাখানা বোঝাই করছেন। এই সব দোকানদাররা দিবারাত্র ব্রিটিশের আগমন প্রতীক্ষা করছে। ব্রিটিশ সৈন্যদের অগ্রগতির খবর রাণী সর্বদাই অবিশ্বাস করছেন। কানপুরে ব্রিটিশ সৈন্যরা বিজয়ী হয়েছে, এই কথা যে বলছে তাকেই রাণী শাস্তি দিয়েছেন।

জেলদারোগা বখ্‌শীশ আলী (১৮৫৭ সালের জুন মাসে ঝাঁসীতে ব্রিটিশ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম নায়ক) রাণীকে লিখে জানিয়েছে, সে দিল্লীর বাদশাহের শ্যালকের সঙ্গে আলিগড়ে ছিল এবং এখন সে একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে ঝাঁসীর পথে আসছে। বখ্‌শীশ আলী রাণীকে জানিয়েছে পাঁচ হাজার টাকা নজরানা দেবার জন্য। রাণী তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছেন।

ঝাঁসীতে দিবারাত্রি সামরি প্রস্তুতিক চলেছে।'

এই চিঠি থেকে বোঝা যায় ঝাঁসীর রাণীর আদর্শ আশপাশের অন্যান্য সামন্ত রাজাদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বাণপুরের রাজার সঙ্গে রাণীর সহযোগিতা জীবনের শেষদিন অবধি অবিচ্ছিন্ন ছিল।

বারোদিয়ার সামনে বীণা নদীর উপকূলের গভীর জঙ্গলে ও ঘাস বনের মধ্যে বিলায়েতী ও আফঘানদের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এখানে হিউরোজের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন ক্যাপ্টেন নেভিল। তিনি যুদ্ধস্থলে নিহত হলেন। যুদ্ধ করতে করতে ইংরেজ সৈন্য বারোদিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে কিছু সংখ্যক বিলায়েতী সৈন্য খুরই, কারলাসা এবং নারিয়াওয়ালী চলে গেল। বারোদিয়া গ্রামে গ্রামবাসীরা ইংরেজ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত ছিল। ইতিমধ্যে ভারতীয় পক্ষের যোগ্যতম অধিনায়ক অনন্ত সিংহ ও তাজি মোহাম্মদ খাঁ নিহত হলেন, বাণপুরের রাজা ঠাকুরমর্দন সিংহের কাঁধে গুলী লেগে তাঁর ডান হাত অকেজো হয়ে গেল। বাণপুরের রাজা কিছুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে চলে গেলেন উত্তরে।

গ্রামবাসীরা আগে থেকে বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল। তারা বিপদের সঙ্কেত পেয়ে গ্রামের নিকটস্থ গভীর জঙ্গলে আত্মগোপন করল।

এই সময়ে বিলায়েতী ও আফঘান সৈন্যরা তাদের চারিত্রিক একটি বৈশিষ্ট্য দেখাল, যার মহত্ত্ব শতবর্ষ বাদেও ম্লান হয়নি। এই বৈশিষ্ট্য তারা সর্বত্র দেখিয়েছে। বাণপুরের রাজাকে এবং গ্রাম-বাসীদের পালাবার সুযোগ দেবার জন্য কিছুসংখ্যক সৈন্য আমৃত্যু লড়াই করে ইংরেজদের দৃষ্টি তাদের ওপর নিবদ্ধ রাখল। হিউরোজের ভাষায়—

> 'The Valaitees and Pathans fought with their accustomed courage, several of them, even when dying, springing from the ground, and inflicting mortal wounds with their broad swords.'

বিলায়েতী সৈন্যদের আত্মাহুতি দেবার কারণ হচ্ছে ইংরেজদের অগ্রসর কিছুসময় পর্যন্ত আটকে রাখা, অন্যথায় বারোদিয়া থেকে কামানগুলি সরিয়ে ফেলা সম্ভব হত না। আটটি কামান চলে গেল খুরই-এ।

অন্যান্য যুদ্ধ ক্ষেত্রগুলির মতো বারোদিয়াতেও ইংরেজ পক্ষের হতাহতের সংখ্যা আনুপাতিকহারে নগণ্য হল। তিনজন নিহত এবং কুড়িজন আহত হল ইংরেজ পক্ষে, ভারতীয়রা নিহত হল প্রায় পাঁচশ'জন। এদের তিনশত ছিল কৃষিজীবী গ্রামবাসী। এরা পাথর, তীর ধনুক ও বর্শা নিয়ে ইংরেজের বন্দুকের গুলী রুখতে এগিয়ে গিয়েছিল।

বারোদিয়ার যুদ্ধের পর হিউরোজ চলে গেলেন সাগরে। সাগরে তাঁদের বাধা দেবার কেউ ছিল না। সহজেই হিউরোজ সাগর অধিকার করলেন।

ইতিমধ্যে গড়াকোটায় সমবেত হয়েছেন অবশিষ্ট ভারতীয়রা। হিউরোজের বর্তমান পরিকল্পনা হল, সাগর থেকে সোজা ঝাঁসী যাওয়া এবং পথে ভারতীয়দের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করা। পথিমধ্যে কোথাও সাহায্য বা রসদ মিলবে না বলে বোম্বাইয়ে তার করে দিলেন রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ইত্যাদি পাঠাবার জন্য। ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সাগরে রইলেন তিনি।

এই বিলম্ব দেখে ভারতীয়রা উৎসাহিত হয়ে ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে একত্র করলেন। শাহ্‌গড় জেলার বিশিষ্ট সামরিক ঘাঁটি সেরাই, মারাওরা প্রভৃতিকে শক্তিশালী করলেন। সাগর ও শাহ্‌গড় জেলার মধ্যবর্তী তিনটি তুরূহ গিরিসঙ্কট অধিকার করে বাণপুরের রাজা ও শাহ্‌গড়ের রাজা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হলেন।

চন্দেরীর তুর্গ বাণপুরের রাজার পারিবারিক সম্পত্তি। চন্দেরীর পথে ওদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন প্রথম ব্রিগেড নিয়ে ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট। চন্দেরীর তুর্গেও একটি প্রতিরোধের প্রস্তুতি রইল।

২৭শে ফেব্রুয়ারী ঝাঁসীর পথে রওনা হলেন হিউরোজ।

ঝাঁসী তখন সমগ্র মধ্যভারতে ভারতীয়দের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থানের প্রধান সামরিক ঘাঁটি। ঝাঁসীর পথে ইংরেজকে যেতে দেবেন না বলে যে সব ভারতীয় প্রাণপণে লড়েছেন এতদিন ধরে, তাঁদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা জমাট বেধেছে ঝাঁসীর রাণীর প্রতিরোধে। জনসাধারণের মুখে মুখে গীত রাসোতে সেদিনকার কাহিনী রয়ে গিয়েছে—

'তেজ অংরেজ কী, অংরেজ রাজ নে হাঁসী—
মাহ বল বিক্রম কী, লেওঁ ঝটপট ঝাঁসী ॥
ঝাঁসী গলে মে ফাঁসি দেউ, অরছা গলেঁমে হার
যবতক রাণী নে কিল্লা না ছোড়ী, তবতক না হোই উধার ॥
রাখগড়, বারোদিয়া, খুরই লৈ,
বাণপুর, শাহ্‌গড়, মুসে ডরী হ্যায়
কহত ভূপৎলাল যবতক বুন্দেলা শূর রহে জীউ।
তবতক অংরেজ ক্যায়সে লেবত ঝাঁসী, সবী দেখ লেও ॥
ঝাঁসী কিল্লা ঔর বাঈসাহেব যবতক রহে জীউ,
তবতক অংরেজ ক্যায়সে লেবত ঝাঁসী হামে দেখ লেও ॥'

পনের

মধ্যভারতের অভ্যুত্থান সম্পর্কে ক্যানিং যত ভীত হয়েছিলেন, ততখানি শঙ্কিত বোধহয় অন্য কোন স্থান সম্পর্কে তাঁকে হতে হয়নি।

মধ্যভারতে একটি ক্ষুদ্র মরাঠারাজ্যে স্বাধীনতার পতাকা ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের খণ্ড খণ্ড ইংরেজ বিরোধিতা কিভাবে একটি ব্যাপক সুসংবদ্ধ স্বাধীনতা সমরে পরিণত হতে চলেছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। মধ্যভারতের অভ্যুত্থানকে Rice-Holmes প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজ ঐতিহাসিকরা মরাঠা অভ্যুত্থান বলে অভিহিত করেছেন। অথচ বুন্দেলখণ্ডে, যাঁরা ঝাঁসী ও অন্যত্র লড়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন বুন্দেলা, বঘেলা, রাজপুত, আফঘান ও পাঠান। তাঁদের সঙ্গে সমগ্র বুন্দেলখণ্ডের কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ, যারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি, তারা সাহায্য করেছিল ভারতীয়দের আশ্রয় দিয়ে, আহার দিয়ে এবং প্রাণ বিপন্ন করে তাদের খবরাখবর সরবরাহ করে।

সমগ্র মধ্যভারতে সেদিন ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্য রসদ মেলা দুরূহ ছিল। সেইজন্য হিউরোজ মিত্ররাজ্য ভূপাল, অরছা এবং বোম্বাই, সাগর, ইত্যাদি ঘাঁটি ছাড়া অন্যত্র কোন জায়গা থেকে রসদ সংগ্রহ করবার ভরসা পাননি। এও উল্লেখযোগ্য যে, তাঁদের একান্ত বন্ধু, মিত্র, সখা সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়ারেও সাধারণ মানুষ অসহযোগী এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন ছিল। ("Hostile and aloof.") তার প্রধান কারণ সেদিন সমস্ত মধ্যভারতের জনসাধারণের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। আর সেই মনোভাব চরমভাবে প্রকাশ হয়েছিল ঝাঁসীর প্রতিরোধ সংগ্রামে।

ঝাঁসীতে বিদ্রোহের আংশিক সাফল্য এবং মধ্যভারতে বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণের মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। প্রথমতঃ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সমরের নেতৃবর্গ ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক। উত্তর ও মধ্যভারতবর্ষের সর্বত্র খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের ব্রিটিশ বিরোধিতার যে প্রকাশ হয়েছিল, তাকে সুপরিচালিত করে একটি সুবিশাল ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সমরে পরিণত করবার কোন কল্পনা বা কর্মসূচী সামন্ত নেতাদের ছিল না।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁতিয়া টোপী ছিলেন অসাধারণ গেরিলা যোদ্ধা। আজিমউল্লার ভূমিকা সম্বন্ধে বারবার বলা হয়েছে অনেক কথা। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপে সবিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। নানাসাহেব, তাঁর ভাই-পো রাওসাহেব, তাঁতিয়া

টোপী, আজিম উল্লা, কুমার সিং, মৌলভী, এঁদের কারো সেই যোগ্যতা ছিল না, যার দ্বারা তাঁরা সেই লক্ষ লক্ষ সিপাহী, কৃষাণ, জনসাধারণকে একটি মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে একটি সুসংবদ্ধ স্বাধীনতা সমর গড়ে তুলতে পারেন। নানাসাহেব, রাওসাহেব ও তাঁতিয়া টোপী পেশোয়াশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠার আওয়াজ দিয়ে মধ্যভারতের জনসাধারণের আনুগত্য দাবী করছিলেন। এই দাবী মূলতঃ ভ্রান্ত। কেননা মধ্যভারতে মরাঠা অধিকার সেখানকার জনসাধারণের কাছে স্বীকৃতি পায়নি। যেখানে মরাঠা শক্তি একান্তভাবে বহিরাগত সেখানে পেশোয়াশাহী পুনঃপ্রতিষ্ঠার আওয়াজ একান্তই দুর্বল। এই দুর্বল এবং ভ্রান্ত আদর্শের পট-ভূমিকায় (তাঁতিয়া টোপী অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট বীরত্ব দেখালেও) যখনই যুদ্ধ হয়েছে তখনই তা বিফল হয়েছে: কেননা, বাণপুরের রাজা প্রমুখ অন্যান্য নেতৃবর্গের মধ্যে পেশোয়াশাহীর প্রতিষ্ঠায় কোন স্বার্থের আকর্ষণ ছিল না।

সামন্ত নেতারাই যেখানে বিদ্রোহের মূল কারণ, উৎপত্তি এবং সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থদ্বারা অন্ধ হয়েছিলেন, সেখানে সিপাহী ও জনসাধারণের অবস্থা আরও বিভ্রান্তকর হয়ে দাঁড়াল। তাদের ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান যে বিলাসব্যসনে আদর্শভ্রষ্ট, বরবাদ পেশোয়াশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না এবং তাদের সংগ্রামী-চেতনা যে ঐটুকুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না, তা অন্যান্য নেতারা সেদিন বুঝতে পারেননি।

একটি মাত্র মানুষের মধ্যে তারা নিজেদের মানসের চরিতার্থতা কিছুটা দেখতে পেয়েছিল, তিনি হচ্ছেন ঝাঁসীর রাণী।

ব্যক্তিগত বীরত্ব দেখিয়ে শ্রদ্ধেয় হয়ে আছেন তাঁতিয়া টোপী, বাণপুরের রাজা, জগদীশপুরের কুমার সিংহ, বান্দার নবাব প্রভৃতি। কিন্তু একটি বিরাট ঘটনা যখন ঘটে তখন ইতিহাস সৃষ্টির মাঝখানে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত বীরত্ব ছাড়াও দরকার হয় দূরদর্শিতার। সমস্ত ব্যাপারটিকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখে ঠিকমতো চলবার ক্ষমতা একমাত্র ঝাঁসীর রাণী ছাড়া অন্য কারও ছিল না। তাঁর ও অন্য নেতাদের মধ্যে একটিমাত্র সাধারণ ঐক্য ছিল এই যে, তাঁরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী।

সেইজন্য রাণী যখন ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য রুখে দাঁড়ালেন তখন নানাসাহেব, তাঁতিয়া টোপী প্রমুখ সকলে প্রথম উপলব্ধি করলেন যে, এই সুবিশাল গণবিক্ষোভকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করে একটি স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত করা যায়।

তাঁদের এই উপলব্ধিকেই ছিল ব্রিটিশের ভয়। আর সেই ভয় থেকেই বহু লক্ষ ভারতীয় মুদ্রা ব্যয়ে মধ্যভারতে তাদের এই বিরাট অভিযান। তাই এই কথা বললে ভুল হবে না যে, ১৮৫৭ সালে যখনই ঝাঁসীর রাণীর আদর্শে মধ্যভারতে একটি সুবিপুল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা গেল তখনই ইংরেজ তার মূলে আঘাত করল।

আর এই কাজে সহায় হলেন গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, নেপালের জংবাহাদুর, অরছার রাণী, ভূপালের বেগম, পান্নার রাজা প্রভৃতি ভারতে ব্রিটিশ তখ্‌তের বত্রিশ পুত্তলিকা।

ইতিমধ্যেই ঝাঁসীর রাণী সমস্ত বুন্দেলখণ্ড জুড়ে ছড়িয়েছেন তাঁর গুপ্তচর বাহিনী। ব্রিটিশ সৈন্যের অগ্রগতি এবং প্রত্যেকটি যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে তিনি খবরাখবর রাখছেন। বাণপুরের রাজা অন্যত্র পরাজিত হলেও নারুত, মাদিনপুর ও ধামুনীর গিরিসঙ্কটে নিজে উপস্থিত থেকে বাধা দেবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন শাহগড়ের রাজা। কাল্পিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছেন তাঁতিয়া টোপী। সেখানে নানাসাহেবের প্রতিভূ হয়ে নেতৃত্ব করছেন নানার ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেব।

সেখান থেকে প্রয়োজন হলে সাহায্য পাওয়া যাবে, সে ধারণা রাণীর ছিল। তিনি ঝাঁসীকে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধের জন্য সর্বতোভাবে তৈরি করতে লাগলেন। শত্রুসৈন্যের অগ্রগতি সম্পর্কে খবরাখবর চালনার একটি অতি প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় প্রথা চালু করলেন রাণী। পাহাড় ও জঙ্গল থেকে গ্রামবাসীরা ইংরেজদের আগমন লক্ষ্য করলেই শুকনো কাঠপাতায় আগুন লাগিয়ে দেবে। সেই আগুন লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচ মাইল দূরের ঘাঁটিতে আগুন জ্বালিয়ে সঙ্কেত জানাবে প্রহরী। তার সেই সঙ্কেতের সূত্র ধরে আগুন জ্বলে উঠবে আরো দূরে অপর একটি

ঘাঁটিতে। আর সেই আগুন দেখে কেল্লার প্রহরীরা সতর্ক হবে। শত্রুসৈন্যের অগ্রগতির চেয়ে অনেক দ্রুতগামী এই সঙ্কেত।

প্রথমে রাণীর শুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রীমণ্ডলী যুদ্ধ না করে সন্ধির প্রস্তাব করতে বলেছিলেন। অভিমানিনী রাণী, সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় কবি মোরোপন্ত-এর কবিতায় তাঁদের উত্তর দিলেন। বললেন—

'মরণা রুচে বীরালা, না রুচে ক্ষণমাত্র অপযশে মরণে।'

আজকে সঙ্কটের দিনে রাণী সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন বুন্দেলা, ঠাকুর প্রভৃতি উচ্চবর্ণ থেকে কাচ্ছি, কোরি, তেলি প্রভৃতি সাধারণ বুন্দেলখণ্ডী মানুষের দিকে। সাহায্য চাইলেন নিঃসঙ্কোচে আফঘানী, পাঠান সৈন্যদের কাছে। দেশের এই চরম সঙ্কটের দিনে মেয়েদের আহ্বান করলেন। জানালেন তাদের সাহায্যও কম প্রয়োজনীয় নয়।

ঝাঁসীর জনসাধারণ বুঝল তাদের এই দুর্লভ ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতা, যার পুরোধায় রয়েছেন তাদের বাঈসাহেব, তাকে কোনমতেই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। যে রমণীর কপাল থেকে কুঙ্কুমতিলক নিশ্চিহ্ন, যার গলা থেকে ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে মঙ্গলসূত্র, যার অনাথ পুত্র ন্যায্য আসন থেকে বঞ্চিত, সে ব্যক্তিগত কোন সাফল্যের উদ্দেশ্যে আজ সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে না! নিয়তির বিধানও সে মেনে নিচ্ছে না। আত্মবিশ্বাস থেকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছে সে। তারা আরো জানল, তাদের ওপরও রাণীর আস্থা অসীম। তাই তাঁর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হল তারা। শতবর্ষ অতিক্রান্ত প্রায়, তবু আজও রাণীর সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা পরম গর্বের সঙ্গে সবাই স্মরণ করে। তাঁর কাছে ধর্মভেদ বা জাতিভেদ ছিল না। আফঘান, পাঠান, মুসলমান সকলকে তিনি অনায়াসে পাশে ঠাঁই দিলেন। সেদিন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ। নিশ্চয়ই সুন্দরী ছিলেন তিনি! যৌবনের পরিপূর্ণ শ্রীতে শোভিত ছিল তাঁর দেহ। তবু তাঁর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ছাড়া অন্য কোন দৃষ্টিতে তাকায়নি কেউ। শতবর্ষ পূর্বের ভারতবর্ষের কথা আর তৎকালীন সমাজে মেয়েদের অবস্থা কল্পনা করলে রাণীর পক্ষে সেটা যে কত বড় গৌরবের তা বোঝা সহজ হবে। রাণীর

সবচেয়ে বড় জয় এই যে, তিনি ঝাঁসীর মানুষকে সচেতন সংগ্রামের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। আর সেই কারণেই তারা ইংরেজশক্তিকে অমন দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হয়েছিল। ঝাঁসীর সংগ্রামী মানুষ সম্পর্কে G. B. Malleson বলেছেন—

'It was sure that the Rani had infused some of her lofty spirit into her compatriots. Women and children were seen assisting in the repair of the havoc made in the defences by the fire of the besiegers, and in carrying food and water to the soldiers on duty. It seemed a contest, between the two races, under conditions unusually favourable to the besieged.' (P—33).

Kaye and Malleson বলেছেন—

'She gained a great influence over the hearts of her people. It was this influence, this force of character, added to a splendid and inspiring courage, that enabled her, some months later to offer to the English troops under Sir. H. Rose, a resistance which made to a less able commander, might even have been successful.'

Innes-এর মতে—

'The decisive contest lay in Oudh and the Southern theatre,—Central India and Bundelkhand. Seizure of Lucknow and Jhansi was the most decisive contest between the Indians and the British.'

'একথা নিশ্চয় যে, রাণী তাঁর উচ্চ আদর্শের কিছুটা সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে। মেয়েদের ও শিশুদের দেখা যাচ্ছিল কর্তব্যে নিরত সৈনিকদের কাছে খাবার ও পানীয় বয়ে নিয়ে যেতে এবং আক্রমণকারীদের গোলাতে বিধ্বস্ত প্রাচীর মেরামতে সাহায্য করতে। মনে হচ্ছিল দুটি বিভিন্ন জাতির এই সঙ্ঘর্ষে যারা অবরুদ্ধ রয়েছে অবস্থা যেন বিচিত্রভাবে তাদেরই অনুকূল।' (G. B. Malleson.)

'তাঁর প্রজা-সাধারণদের ওপর তিনি এক বিরাট প্রতিপত্তি

অর্জন করেছিলেন। এই প্রতিপত্তি এবং চরিত্রের এই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেরণাসঞ্চারী শৌর্যের এক অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধন হয়েছিল তাঁর মধ্যে। তারই ফলে কয়েকমাস বাদে হিউরোজের অধীন সৈন্যদের তিনি এমন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী কোন সেনাপতির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলে সার্থক হতে পারত।' (Kaye And Malleson)

'চূড়ান্ত সংগ্রাম ক্ষেত্র ছিল অযোধ্যা, মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ড। লক্ষ্ণৌ ও ঝাঁসীর যুদ্ধই ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশদের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রাম।' (Innes).

এককথায় বলা চলে, রাণীর নেতৃত্বে ঝাঁসীতে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান একটি সত্যিকারের স্বাধীনতা সমরের রূপ গ্রহণ করল।

সংগ্রামের প্রস্তুতির প্রারম্ভে ঝাঁসী শহরের আশেপাশে সর্বত্র কৃষকদের জরুরী তলব দিয়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হল। তারপর সে-সব ক্ষেত জ্বালিয়ে দিয়ে, গাছ কেটে ফেলে, কুয়ো ও পুকুরের জল বিষাক্ত করে দেওয়া হল। শত্রুসৈন্য ক্ষুধায় আহার পাবে না, ঘোড়ার ও অন্যান্য ভারবাহী পশুর ঘাস মিলবে না, তৃষ্ণায় মিলবে না জল, এই ছিল রাণীর উদ্দেশ্য।

ঝাঁসীর কেল্লাতে একটি, প্রাসাদে সাতটি এবং শহরের বিভিন্ন জায়গায় বারোটি বড় বড় কুয়ো ছিল। সুতরাং পানীয় এবং ব্যবহার্য জল সম্পর্কে ভাবতে হয়নি রাণীকে। আর যুদ্ধে ঘোড়ার ভূমিকা সওয়ারের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তাই রাজপ্রাসাদের ঘোড়শালার তত্ত্বাবধানের ভার রইল আশীজন আফঘানের ওপর।

ঝাঁসী নগরী প্রাচীরবেষ্টিত। তাতে প্রবেশের বিভিন্ন দরজা ছিল। তার মধ্যে অরছা, দতিয়া, সঁইয়ার, ভাণ্ডীর, লছমী, খণ্ডেরাও, ওনাও, সাগর এই আটটি ছিল প্রধান। প্রত্যেকটি দরজার ওপরে বুরুজ এবং দুইপাশে প্রশস্ত প্রাচীরে বন্দুকধারী সৈন্য দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার মতো পর্যাপ্ত জায়গা ছিল। পুরনো ক্যান্টনমেণ্ট থেকে কেল্লাতে আসবার পথের তিনটি দরজা সাগর, অরছা ও সঁইয়ার বিশেষ যত্নের সঙ্গে সুরক্ষিত করা হল। কিন্তু ইংরেজরা ফুটা দরজা ধ্বংস করে ঝাঁসীতে ঢুকেছিল। আজ ক্যান্টনমেণ্ট রোড ধরে সোজা

পথে কেল্লায় আসতে গেলে জোকানবাগ ছাড়িয়ে প্রথমে যে বিরাট প্রশস্ত পথ, সেখানেই ছিল সেদিন ফুটা দরজা।

প্রবীণ গোলাম ঘৌস খাঁ ছিলেন অভিজ্ঞ গোলন্দাজ। তাঁর সহকারী ছিলেন প্রিয়দর্শন যুবক খুদাবক্স। গোলাম ঘৌস খাঁ তাঁর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ঝাঁসীর কেল্লার বিভিন্ন বুরুজে সন্নিবেশিত করলেন ভবানীশঙ্কর, গরনালা, কড়কবিজলী, নলদার, অর্জুন, সমুদ্র-সংহার প্রভৃতি কামানগুলিকে। কেল্লার দক্ষিণের বুরুজটির অবস্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, আক্রমণের সম্ভাবনা দক্ষিণদিক থেকে। দক্ষিণে ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে আসবার রাস্তা। দক্ষিণে বুরুজটি থেকে আনুমানিক সাতশ' গজ দূরে, নিচু টিলা কাপু টিক্রী। সেখান থেকে কেল্লা আক্রমণ করবার জন্য শত্রুপক্ষের দলবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। দক্ষিণে জোকানবাগ উদ্যান, যেখানে ১৮৫৭ সালে ইংরেজ নরনারীদের হত্যা করা হয়েছিল। জোকানবাগের গাছপালার আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করবার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া, দক্ষিণে মহাদেবের মন্দিরও রয়েছে কয়েকটি। দক্ষিণদিকের বুরুজ থেকে প্রাসাদ ও নগরে প্রবেশের পথ রক্ষা করা যায়। অতএব সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে গোলাম ঘৌস খাঁ, ব্যক্তিগতভাবে ঘনগরজ কামান নিয়ে দক্ষিণ বুরুজে রইলেন। পূর্ব এবং উত্তরদিকের কেন্দ্রে অবস্থিত বুরুজে রইলেন লালাভাও বক্সী কড়কবিজলী নিয়ে। পশ্চিমদিকের বুরুজে ভবানীশঙ্কর নিয়ে রইলেন দেওয়ান রঘুনাথ সিং। জবাহির সিং, দিলীপ সিং, এঁরা অশ্বারোহীদের নেতৃত্বে রইলেন। মোরোপন্ত তাম্বে একটি অশ্বারোহী দলের নেতৃত্ব নিলেন। আর রামচন্দ্ররাও দেশমুখ ওরফে বালারাও দেশমুখ, লক্ষ্মণরাও বান্দে প্রভৃতি রইলেন রাণীর সঙ্গে।

অরছা, সঁইয়ার ও সাগর দরজার ভার নিয়ে রইলেন যথাক্রমে, দেওয়ান দুলহাজু, খুদাবক্স খাঁ ও পীর আলী। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, পীর আলী গঙ্গাধররাও-এর মেজদাদা রঘুনাথরাও-এর অবৈধপুত্র আলী বাহাদুরের সহকর্মী। ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে এই সময়ে আলী বাহাদুরের কোন যোগাযোগ ছিল না তবুও পীর আলী রাণীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

রাণী নিজে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন আফঘান ও পাঠান

সওয়ারদের। তিনি মেয়েদের সমর শিক্ষা দিয়ে সমরোপযোগী করে তুলেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজরা মেয়েদের প্রাচীর মেরামত, তোপমঞ্চ তৈরি, গোলাবারুদ সরবরাহ ও কামান চালানোতে সাহায্য করতে দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনশ' মিস্ত্রী দিবারাত্রি পরিশ্রম করে ঝাঁসী শহরের পুরনো প্রাচীর ও দরজাগুলি মেরামত করল। আর তাদের সর্বদা প্রস্তুত রাখা হল এই জন্য যে, যখনই শত্রুর গোলার আঘাতে প্রাচীরের কোন জায়গা ভেঙে পড়বে তখনই তারা তা মেরামত করবে।

এই সময় ঝাঁসীতে রাণীর সৈন্য ও কামানের সংখ্যা সঠিক নিরূপণ করা কঠিন। ঝাঁসী শহর অধিকারের পর সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী হিউরোজ ছাব্বিশটি কামান পেয়েছিলেন। দুইটি তার মধ্যে বিলিতী, অন্য চব্বিশটি দেশী কারিগরের তৈরি। ঝাঁসী কেল্লা থেকে নয়টি কামান পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলি প্রত্যেকটি দেশী কারিগরের তৈরি। একটির দৈর্ঘ্য ষোল ফুট, অন্যগুলি যথাক্রমে সাত, আট, ছয়, চার ফুট দীর্ঘ। ঝাঁসীতে সবশুদ্ধ যে পঁয়ত্রিশটি কামান পাওয়া গিয়েছিল, তার মধ্যে বাইশটি ঝাঁসী রাজ্যের পুরনো কামান। বাণপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং দুইটি কামান রেখেছিলেন। বিলিতী কামান দুটি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহী 12th N. I. ও 14th Irregular Cavalry শহর পর্যন্ত টেনে এনেছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবৃতি রয়েছে। বাকি নয়টি কামান নথে খাঁ'র পরিত্যক্ত।

সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা নানারকম মন্তব্য করেছেন। হিউরোজ ১৯শে মার্চ ১৮৫৮ তারিখে জেনারেল হুইটলক্‌কে লিখেছেন—

> 'Sir, R. Hamilton tells me, Jhansi garrison consists of 1,500 Sepoys and 1,000 Bundelas.'

Forrest লিখেছেন—

> 'To attack with a handful of European Soldiers a city......garrisoned by eleven thousand Afghans...'

অন্যান্য ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও ফরেস্টের বিবৃতির স্বপক্ষেই বলে গিয়েছেন।

ঝাঁসী অধিকারের পর সরকারী বিবৃতি ও একাধিক ইংরেজ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী ভারতীয় পক্ষে নিহতদের সংখ্যা পাঁচহাজার। এই সংখ্যাকে কতদূর বিশ্বাস করা চলে বলা কঠিন। তবে একথা যদি ধরে নেওয়া যায় যে, ভারতীয়দের পক্ষে নিহতদের সংখ্যা বেশি হওয়া ইংরেজরা নিজেদের কৃতিত্ব বলে মনে করতেন এবং হতাহতের সংখ্যা যতদূর সম্ভব সঠিকভাবেই দিতেন, তাহলে হিসেব করে দেখা যায় যে, ঝাঁসী অধিকারের পর নগরীতে পাঁচহাজার জন নিহত হয়েছিল। এবং রাণীর সঙ্গে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন মাত্র চারশ' জন।

ঝাঁসীতে তখন বাণপুরের রাজার দুই থেকে তিন হাজার, ঝাঁসীরাজের প্রাক্তন তিনহাজার এবং ঝাঁসীস্থ বুন্দেল-খণ্ডীদের নিয়ে গঠিত আনুমানিক একহাজার সৈন্য ছিল। সকলে সুশিক্ষিত ছিলেন না এবং অস্ত্রশস্ত্রও অনুন্নত ছিল। তরবারিই ছিল তাঁদের প্রধান অস্ত্র। আফঘানরা দুর্ধর্ষ সাহসী ছিলেন। ঝাঁসীর প্রতিরোধ সংগ্রামে আফঘান ও পাঠানদের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি।

ঝাঁসী কেল্লার মধ্যে শঙ্কর কেল্লা নামক পশ্চিম অংশে মহাদেবের মন্দির। তারই পাশে কেল্লার সুবৃহৎ কুয়ো। শঙ্কর কেল্লার উত্তরে বাগিচা বুরুজ বা কেল্লার বাগান। কেল্লার মধ্যেই তোপখানা বা গোলাবারুদ তৈরি করবার ব্যবস্থা রেখেছিলেন রাণী।

সাধ্যমতো ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে রাণী অপেক্ষা করতে লাগলেন। সমস্ত শক্তি সংহত করে কেল্লা ও নগরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলি শক্তিশালী করা হল। বাইরে কোন ফৌজ রাখা হল না। শেষমুহূর্তে রাণীর সঙ্গে কিছু মুসলমান ফকীর এবং হিন্দু সন্ন্যাসীও যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের কালো ও সবুজ পতাকা পাশাপাশি প্রোথিত করা হল।

রাণীর উৎসাহে উৎসাহিত হল নগরের অধিবাসীরা। সকলেই প্রস্তুত হয়ে রইল। ইতিমধ্যে সার কোলিন ক্যাম্পবেল এবং লর্ড ক্যানিং, দু'জনের মনেই একটি আশঙ্কা প্রবল হয়ে উঠল।

ষোল

হিউরোজের নেতৃত্বে গঠিত ব্রিগেড দুইটিতে ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসার ছিলেন দেড় হাজার। ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা ছিল ছয়হাজার। তাছাড়া "সীজ্ ট্রেনে" ওয়্যারলেস অপারেটার, ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, পশুচিকিৎসক প্রভৃতি মিলিয়ে পাঁচশ' লোক ছিল। ক্যানিং এবং ক্যাম্পবেল ঝাঁসী সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের আশঙ্কা হল সম্ভবতঃ হিউরোজের বাহিনী ঝাঁসী জয় করবার পক্ষে পর্যাপ্ত হবে না।

১৪শে জানুয়ারী ১৮৫৮ সালে ম্যান্সফিল্ড (W.R. Mansfield, Major General, Chief of the Staff), হিউরোজকে লিখলেন—

> 'Sir Colin will be glad to learn, if Jhansi is to be fairly tackled during your present campaign. To us, it is all important. Until it takes place, Sir Colin's rear will always remain inconvenienced, and he will be constantly obliged to look back, over his shoulders. The stiffneck, Jhansi gives to the C-in-C. you will, I hope, understand.'

> 'আপনার বর্তমান অভিযানেই ঝাঁসী আক্রমণ করা সম্ভব হবে কিনা জানতে পারলে সার কোলিন খুসী হবেন। আমাদের কাছে বিষয়টি একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ না তা হচ্ছে, ততক্ষণ সার কোলিনের বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ সবসময় অসুবিধায় পড়বে। এবং সেজন্য সার কোলিনকে পশ্চাৎদিকে নজর রাখতে হবে। কাজেই আপনি বুঝতে পারবেন আশা করি যে, ঝাঁসী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের পক্ষে কতখানি যন্ত্রণা বিশেষ।'

কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্ যে ঝাঁসী জয় করবার ওপর অতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, হিউরোজ সেই ঝাঁসী জয় করে কৃতিত্ব অর্জন করবার সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না।

হিউরোজের সৈন্যসংখ্যা যে অপর্যাপ্ত, সে আশঙ্কা ক্যাম্পবেল ও ক্যানিং-এর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

ক্যাম্পবেলের আদেশে ম্যান্সফিল্ড হিউরোজকে জানালেন—

> 'কানপুর—১১-২-১৮৫৮
>
> মাননীয় কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফের আদেশে ঝাঁসীর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আপনি নিশ্চয়ই জানেন স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ঝাঁসী জয় করার ওপর কতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু যদি ঝাঁসী প্রতিরোধের ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী হয় এবং নগরটিতে বিদ্রোহীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি থাকে তাহলে আপনার সৈন্যসংখ্যা পর্যাপ্ত কি না সন্দেহজনক।

মাননীয় ক্যাম্পবেল জানেন যে, আপনার ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যা পনেরশ'র বেশি নয়।

তিনি মনে করেন এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের ভার গ্রহণ করবার পূর্বে আপনার, সার রবার্ট হ্যামিল্টন বা অন্য কারও সূত্রে শত্রুসৈন্য-সংখ্যা সঠিক জেনে নেওয়া উচিত ছিল। অপর্যাপ্ত সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঝাঁসী জয়ের চেষ্টার খুব অবাঞ্ছনীয় পরিণতি হওয়া অসম্ভব নয়।

এই সব কথা বিবেচনা করে যদি আপনি মনে করেন যে, ঝাঁসী অবরোধ সম্ভবপর হবে না, তাহলে আপনার অগ্রগতি দুই দিকে পরিচালিত করতে পারেন। একটি হচ্ছে চিরখারী দিয়ে যমুনা তীরে অবস্থিত কাল্পি, অন্যটি হচ্ছে বান্দা অভিমুখে। এই দুটি জায়গা থেকেই আপনি কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্‌কে বিবৃতি পাঠাবেন।

স্বাক্ষরিত—ম্যান্সফিল্ড'

(W. R. Mansfield, Major General, Chief of the Staff.)

সেই তারিখেই লর্ড ক্যানিং রবার্ট হ্যামিল্টনকে লিখলেন—

'এলাহাবাদ, ১১-২-১৮৫৮

প্রিয় সার রবার্ট,—যদি নর্মদা ফিল্ড ফোর্স ঝাঁসী যায়, এবং রাণী যদি তাদের হাতে বন্দী হন, তাহলে কোর্টমার্শাল নয়, কমিশন নিযুক্ত করে তাঁর বিচার করতে হবে।

সার হিউরোজকে নির্দেশ দিতে হবে রাণীকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য এবং আপনি নিশ্চয়ই সাধ্যমতো শ্রেষ্ঠতম কমিশন নিয়োগ করতে ভুলবেন না।

যদি কোন কারণে তাঁর সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কিছু করা সম্ভব না হয় এবং তাঁকে ঝাঁসীতে অথবা নিকটস্থ কোথাও বন্দী করে রাখতে অসুবিধা হয়, তবে তাঁকে এখানে পাঠান যেতে পারে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে প্রাথমিক তদন্ত করে নিরূপণ করতে হবে বিচারের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না। এই প্রাথমিক তদন্ত তিনি এখানে এসে পৌঁছবার আগেই শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি যেন তাঁর বিচার হওয়ার প্রয়োজন আছে কি না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নিয়ে

এখানে না আসেন। আমার অবশ্য মনে হয়, আপনি ঘটনাস্থলেই তাঁর বিচার শেষ করতে পারবেন। বিচারের পরে তাঁকে কি করা হবে সেটা রায়ের ওপর নির্ভর করবে।

প্রথমেই "যদি" নর্মদা ফিল্ড ফোর্স ঝাঁসীতে যায় বলেছি, তার কারণ হচ্ছে, সার হিউরোজ যদি তাঁর ঝাঁসী জয় করবার পক্ষে সৈন্য সংখ্যা সম্বন্ধে সংশয়-গ্রস্ত হন, তাহলে ঝাঁসীর প্রশ্ন মুলতবী রেখেই তিনি চলে যাবেন। সে ক্ষেত্রে তিনি কাল্পি বা বান্দা অথবা উভয় স্থানেই যাবেন এবং এখান থেকে আরও সৈন্য না পাঠান পর্যন্ত ঝাঁসীর বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান মুলতুবী থাকবে।

নর্মদা ফিল্ড ফোর্স যদি ঝাঁসীর সামনে অথবা কাছাকাছি গিয়ে উপলব্ধি করে যে, ঝাঁসী জয়ের পক্ষে তার শক্তি অপর্যাপ্ত এবং অগত্যা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থেকে এখান থেকে সাহায্য যাবার জন্য অপেক্ষা করে তবে তার পরিণতি হবে লজ্জাকর ও বিপদজ্জনক।

অতএব আমি মনে করি সার হিউরোজ যেন একথা না মনে করেন, সাফল্যের সম্ভাবনা না থাকলেও তাঁকে ঝাঁসী আক্রমণ করতে হবে।

তাঁর ইউরোপীয় পদাতিক সৈন্য সংখ্যা প্রয়োজনানুসারে একান্ত অপর্যাপ্ত। 'স্বাক্ষরিত—ক্যানিং।'

হিউরোজকে এই চিঠির সম্বন্ধে যখন জানান হয় তখনও চিরখারী সম্বন্ধে আশঙ্কার কোন কারণ ঘটেনি।

হিউরোজ দু'দিন সাগরে রইলেন এবং সে স্থান পরিত্যাগ করবার পূর্বে মেজর বয়লো (Boileau)-কে পাঠিয়ে দিলেন গড়াকোটা অধিকার করবার জন্য। শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব আলীর সহকারী বোধন দৌয়া নেতৃত্ব করছিলেন গড়াকোটায়।

সাগর থেকে কুড়ি মাইল উত্তরে গড়াকোটার দুর্ভেদ্য দুর্গ একটি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে। পুবদিক দিয়ে তার বয়ে গিয়েছে সোনার নদী। একটি পাহাড়ী নদী পশ্চিম ও উত্তরদিক দিয়ে বয়ে চলেছে। সোনার নদীর অপর তীরে গড়াকোটা শহর কেল্লা থেকে এক মাইল দূরে। কেল্লা ঘিরে রয়েছে একটি পরিখা। পরিখাটি কুড়ি ফুট গভীর ও ত্রিশ ফুট বিস্তৃত। ফরাসী ইঞ্জিনীয়ারদের তৈরি এই গড়াকোটা কেল্লা। ১৮১৮ সালে পিণ্ডারী যুদ্ধের সময় ব্রিগেডিয়ার ওয়াট্‌সন, এগারো হাজার সৈন্য এবং আঠাশটি কামান নিয়েও এতটুকু ফাটল ধরাতে পারেননি তার পাঁচিলে। বাসেরী গ্রামে কিছু ভারতীয়

ফৌজ ছিল। বাসেরী গড়াকোটার কেল্লা থেকে ছুই মাইল দূরে।

গড়াকোটার কেল্লাতে সমস্তরাত ধরে বোধন দৌয়া অতুলনীয় বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন।

'The enemy were driven back in disorder by the 3rd Europeans. They again formed up and advanced with renewed vigour—' '3rd European-রা শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে পিছু হটিয়ে দিল। তবু তারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে নতুন উদ্যমে এগোতে লাগল।'

শেষরাত্রিতে কেল্লা পরিত্যাগ করে বোধন দৌয়া চলে গেলেন অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে মাদিনপুরের গিরিসঙ্কটে। সেখানে শাহ্‌গড়ের রাজা হিউরোজের অগ্রগতি প্রতিরোধ করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেখান থেকে তিনি চলে যান চন্দেরী। বেওয়াস নদীর অপর তীরে গড়াকোটার কেল্লা থেকে পঁচিশ মাইল দূরে দৌয়ার সৈন্যদলের সঙ্গে ক্যাপ্টেন হেয়ারের সংঘর্ষ হয়।

ঝাঁসী ও সাগরের মধ্যবর্তী তিনটি গিরিসঙ্কটের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল নারুতের পাস। নারুত-পাসে ছিলেন বাণপুরের রাজা ৮,০০০ সৈন্য নিয়ে। শাহ্‌গড়ের রাজা ছিলেন মাদিনপুরে। ধামুনীতে ছিলেন বাণপুরের রাজার সহকারী লাল্লা ছুলকারা।

চন্দেরীর ছুর্গেও ভারতীয় প্রতিরোধ সংগঠিত হয়েছে জেনে হিউরোজ তাঁর প্রথম ব্রিগেডের নেতা স্টুয়ার্টকে হুকুম দিলেন বেত্রবতী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত চন্দেরী ছুর্গ অধিকার করতে।

তিনি নিজে চললেন গিরিসঙ্কট তিনটি জয় করতে।

হিউরোজ যুগপৎ নারুত ও মাদিনপুর—ছুইটি গিরিসঙ্কটে যুদ্ধ করবার জন্য অভিনব পরিকল্পনা করলেন।

নারুতের গিরিসঙ্কটের ওপরে মালথোনের কেল্লা ও শহর। সেখানে রইলেন মেজর স্কুডামোর (Scudamore)। কিন্তু আসল যুদ্ধ হবে মাদিনপুরে। শাহ্‌গড়ের রাজার সঙ্গে যখন হিউরোজ লড়বেন মাদিনপুরে, তখন স্কুডামোর নারুত-পাস থেকে বাণপুরের রাজাকে শাহ্‌গড়ের রাজার সাহায্যার্থে অগ্রসর হতে দেবেন না। এইভাবে একই সময়ে ছু'জনকেই পরাজিত করবেন হিউরোজ।

৩রা মার্চ হিউরোজ মাদিনপুরে চললেন। মাদিনপুরের অরণ্যসঙ্কুল গিরিসঙ্কটে ভয়াবহ যুদ্ধ হল। নারুতের প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক শক্তিশালী ছিল। মাদিনপুর যে আগে আক্রান্ত হবে তা বাণপুরের রাজা বা শাহ্‌গড়ের রাজা ভাবেননি। মাদিনপুরের যুদ্ধে ভারতীয়দের পরাজয় হল। তাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করলেন একটি সুবিশাল হ্রদের পেছনে অবস্থিত মাদিনপুরের গ্রামে। কিন্তু ব্রিটিশসৈন্য অনুসরণ করাতে মাদিনপুর থেকে তাঁরা চলে গেলেন সেরাইয়ের কেল্লাতে। এখানেও মেজর অর ও ক্যাপ্টেন এ্যাবট তাঁদের অনুসরণ করলেন। সেরাইয়ের জঙ্গলে যুদ্ধ হল। ভারতীয় পক্ষের সৈন্যরা ছিলেন প্রাক্তন 52nd B. N. I.-র অন্তর্ভুক্ত। যাঁরা নিহত হলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন লাল টুরবাডিও। জব্বলপুরের 52nd Bengal Native Infantry-তে তিনি ছিলেন হাবিলদার মেজর। গোণ্ডরাজা বৃদ্ধ শঙ্করশাহকে ও তাঁর পুত্র রঘুনাথশাহকে কামানের মুখে উড়িয়ে দেবার সময় লাল টুরবাডিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অসমসাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি সহকর্মীদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বলেন।

শাহ্‌গড়ের রাজার সম্পত্তি সেরাইয়ের কেল্লাকে ভারতীয়েরা বারুদ ও গোলা বানাবার কারখানা বানিয়েছিলেন। সাগর থেকে গোলা বানাবার ছাঁচগুলি এনে এখানে রেখেছিলেন ভারতীয়েরা। নারুত ও মাদিনপুরে পর্যুদস্ত হবার পর বাণপুর ও শাহ্‌গড়ের রাজা অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে চিরখারী অভিমুখে চলে গেলেন। সেখানে তাঁতিয়া টোপী তৎপর হয়ে উঠেছেন। চিরখারীর রাজাকে পরাজিত করে তিনি চিরখারী অধিকার করেছেন। মর্দন সিং ও বখ্‌তব্‌ আলী তাঁদের অবশিষ্ট ফৌজ নিয়ে সেখানেই যোগ দিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁতিয়া টোপীকে ঝাঁসীর সাহায্যার্থে আসতে বলাই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল কিনা, কে জানে? তাঁরা যে তখন কেন সোজা ঝাঁসী অভিমুখে গেলেন না সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায়নি। সম্ভবত তাঁরা সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে তাঁতিয়া টোপীর সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন মনে করেছিলেন।

> 'মর্দন সিং কহৈ তবৈ, বখতবলী সৌ বাত।
> সমর সহিত টোপৈ (তাঁতিয়া) জহাঁ নানা সাব দিখাত॥'

সেরাইয়ের কেল্লার পর হিউরোজ শাহ্‌গড়ের রাজার সম্পত্তি মারাওরার কেল্লা অধিকার করলেন। উল্লেখযোগ্য এই যে, সেরাই মারাওরা ইত্যাদি কেল্লাতে কোন ভারতীয় বাহিনী তখন ছিল না। মাদিনপুরের যুদ্ধের পরেই এই জায়গাগুলি তারা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

সার রবার্ট হ্যামিল্টন পূর্বাপর হিউরোজের সঙ্গে ছিলেন; গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। হুইট্‌লকের বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন হ্যামিল্টনের সহকারী মেজর এলিস। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, মেজর এলিসই একদা ১৮৫৪ সালে ঝাঁসী অন্তর্ভুক্ত হবার সময়ে ঝাঁসীর রাণীর স্বপক্ষে ডালহৌসীর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। বাহিনীদ্বয়ের সঙ্গে হ্যামিল্টন ও মেজর এলিসের থাকবার অপর একটি গুরুতর রাজনৈতিক কারণও ছিল।

১৮৬২ সালে অবসর গ্রহণের পর রবার্ট হ্যামিল্টন Secretary of State for India-র অনুমতি নিয়ে ১৮৫৮ সালে মধ্যভারত অভিযান সম্পর্কে কতকগুলি গোপন খবর প্রকাশিত করেন। তিনি জানান, মীরাটে বিদ্রোহের সময় তিনি ছুটি নিয়ে বিলেতে ছিলেন। ক্যানিং-এর জরুরী তার পেয়ে তিনি চলে আসেন। সমগ্র মধ্যভারত অভিযান পরিকল্পনা তাঁর ও সার কোলিন ক্যাম্পবেলের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করা হয়। অভিযানের গতি পরিবর্তন বা বহাল রাখা, সবই তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্বে করা হয়েছে। সার হিউরোজ ও জেনারেল হুইট্‌লক তাঁর আদেশ পালন করেছেন মাত্র। মেজর এলিস ও তিনি সর্বদা চিঠিপত্রে যোগাযোগ রাখতেন। দীর্ঘ বারো বছর ধরে মধ্যভারতে বাস করবার দরুন হ্যামিল্টন ও এলিস সেখানকার প্রত্যেকটি গ্রামের অবস্থিতি পর্যন্ত জানতেন। কাজেই তাঁদের পক্ষে ভেতর থেকে অভিযানের গতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল। যদিও তাঁরাই যে এই অভিযানের প্রধান নিয়ন্তা ছিলেন, তা ১৮৫৮ সালে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি।

মধ্যভারত অভিযানে তাঁর উপস্থিত থাকবার সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে, একমাত্র তাঁর কাছেই গভর্নর জেনারেলের আদেশপত্র ছিল

এবং এই জোরে নানাসাহেব, রাওসাহেব, তাঁতিয়া টোপী, বান্দার নবাব, বাণপুরের রাজা, শাহ্গড়ের রাজা এবং ঝাঁসীর রাণী—এই সব নেতাদের ঘটনাস্থলেই বিচার ও উপযুক্ত শাস্তিবিধান করবার এবং প্রয়োজন হলে মৃত্যুদণ্ড দেবারও তাঁর অধিকার ছিল।

এই সব রাজনীতিক দায়িত্ব নিয়ে রবার্ট হ্যামিল্টন অভিযানের সঙ্গে ছিলেন। তিনি শাহ্গড়ের রাজার সমস্ত রাজ্যকে ব্রিটিশ অধিকৃত বলে ঘোষণা করলেন। ৭ই মার্চ ১৮৫৮ সালে ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে দেওয়া হল মারাওরা ও সেরাইয়ের কেল্লাতে।

হিউরোজ ৯ই মার্চ পৌঁছলেন বাণপুরে। বাণপুরের রাজার বিশাল প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিলেন। রাজপ্রাসাদ জ্বলে গেল।

১৪ই মার্চ হিউরোজ দ্বিতীয় ব্রিগেড নিয়ে পৌঁছলেন বালাবেহুত-এ। বালাবেহুত-এর বিশাল হ্রদের ওপর তখন জলচর পাখীরা উড়ে বেড়াচ্ছিল পরম নিশ্চিন্তে; সর্বত্র প্রভাতের সুন্দর প্রশান্তি বিরাজমান ছিল।

বালাবেহুত অতিক্রম করে কিছু দূর এসে বেত্রবতী নদীর অগভীর জল পার হয়ে হিউরোজ সসৈন্যে তাঁবু ফেললেন। চন্দেরীর পথে প্রথম ব্রিগেড এসে পৌঁছলে তাঁরা যুক্ত-শক্তিতে ঝাঁসী আক্রমণ করবেন।

গড়াকোটাতে পরাজিত হয়ে বোধন দৌয়া চলে গিয়েছিলেন চন্দেরীতে। সেরাই, মারাওরা, নরাওলী প্রভৃতি ঘাঁটি ত্যাগ করে অন্যান্য ভারতীয়রাও চন্দেরীতে সমবেত হয়েছিলেন। বাণপুর ও শাহ্গড়ের রাজা ব্যতীত বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য ভারতীয় নেতারা সকলেই সমবেত হয়েছিলেন চন্দেরীতে।

চন্দেরী রাজপুত গৌরবের দিন থেকে ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সুশোভিত এক নগরী ছিল। সম্রাট বাবর চন্দেরী আক্রমণ করেছিলেন এবং রাজপুতরা জীবনপণ করে লড়েছিলেন। আকবর বলেছিলেন, সৌধমালা শোভিত কোন নগরী যদি দেখতে চাও তো চন্দেরী দেখ। চন্দেরী, রাজপুত আধিপত্যে ও মোগল আমলে শিল্পে বাণিজ্যে সুসমৃদ্ধ ছিল। মরাঠা আধিপত্যের সময়ে চন্দেরীর গৌরব অবনতির দিকে যেতে থাকে। চন্দেরী বাণপুরের রাজার পারিবারিক সম্পত্তি। এই ভাস্কর্য শোভিত সুন্দর অট্টালিকাপূর্ণ চন্দেরী নগরী ক্রমশঃ

জনমানবশূন্য হয়ে পড়ল। তবু কেল্লাটি অটুট রইল। এই কেল্লাটিতে ভারতীয়দের একটি বড় ঘাঁটি তৈরি হল। চন্দেরীর প্রশস্তিতে একদা কবি লিখেছিলেন।

'গগন মেঁ চন্দা দেখো
নগর মেঁ চন্দেরী
ঘর মেঁ চন্দা দুল্‌হন কা মুঁ
ঔর রোশ্‌নি চন্দেরী'—

শেষছত্রে 'চন্দেরী' বলতে চান্দেরী শাড়ির কথা বলা হয়েছে। ছড়া ও গানে সুবিখ্যাত চন্দেরী নগরীতে একটি গৌরবময় সংগ্রামের সূচনা করলেন ভারতীয়রা।

ভারতীয়রা জীবনমরণ পণ করে এই চন্দেরী রক্ষা করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৬ই মার্চ ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট চন্দেরী কেল্লার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে গিরিসঙ্কটের দুইধার থেকে অবিশ্রান্ত গোলা গুলী বর্ষণে তাঁকে উত্যক্ত করল ভারতীয় সৈন্য। পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত চন্দেরীর দুর্গের প্রতিটি বুরুজ ও ঘাটি থেকে কামান মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ করতে লাগল।

ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট হাতী দিয়ে টানিয়ে কামান তুললেন পাহাড়ে। তারপর দুর্গ আক্রমণ করলেন। দীর্ঘ সাতদিন যুদ্ধের পরেও চন্দেরী অধিকার করা যখন সম্ভব হল না, ষোলই মার্চ রাতে মেজর কীটিঞ্জ (Major Keatinge) জনৈক গুপ্তচরের সাহায্যে চন্দেরীর কেল্লার প্রধান বুরুজ পর্যন্ত গেলেন। দুর্গে প্রবেশের সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে ফিরে এলেন। সতেরই মার্চ ভোরে তাঁরা চন্দেরী দুর্গ আক্রমণ করলেন। এতদিন অবরুদ্ধ হয়ে থেকে ভারতীয়দের গোলাগুলী ফুরিয়ে গিয়েছিল। কিছু ভারতীয় সৈন্য পালাতে সক্ষম হল। অবশিষ্ট যারা জীবিত ছিল তারা যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যু বরণ করল।

> 'Every rebel that remained, were shot or bayoneted by the Royal County Downs. It was St. Patrick's Day and the Irishmen swore by their Patron Saint that they would avenge the little

babies and poor ladies who were butchered in Cawnpore and Jhansi.'

'অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের প্রত্যেককে Royal County Down-এর লোকরা গুলী এবং বেয়নেটে বিদ্ধ করল। সেদিন St. Patrick's Day. আইরিসরা St. Patrick-এর নামে প্রতিজ্ঞা করল যে, কানপুর ও ঝাঁসীতে নিহত মহিলা ও শিশুদের মৃত্যুর প্রতিশোধ তারা নেবে।'

মার্চ মাসের কুড়ি তারিখে হিউরোজ ঝাঁসী থেকে আট মাইল দূরে পৌঁছে তাঁবু ফেললেন। ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট (Steuart)-কে পাঠালেন সওয়ার ও গোলন্দাজ সৈন্যসহ ঝাঁসী শহর ঘিরে ফেলতে। যখন পদাতিক সৈন্যরাও পেছন পেছন রওনা হবে তখন ক্যানিং-এর জরুরী তার এল রবার্ট হ্যামিল্টন-এর কাছে।

ইতিমধ্যে তাঁতিয়া টোপী চিরখারী জয় করেছেন। পান্না এবং রেওয়ার অবস্থাও আশঙ্কাজনক। চিরখারীর রাজা ইংরেজ অনুগত। তাঁকে সাহায্য করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন ক্যানিং, কিন্তু তাঁর পক্ষে তখন চিরখারীতে সৈন্য পাঠান অসম্ভব। অগত্যা তিনি হুইট্‌লকের প্রতি নির্দেশ পাঠালেন, হিউরোজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করে তাঁরা দু'জন যেন তৎক্ষণাৎ তাঁদের বর্তমান ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে চিরখারীর সাহায্যে চলে যান। তাঁর এই চিঠির একটি কপি হিউরোজকেও পাঠান হল।

হিউরোজ গভর্নরের সেক্রেটারীকে জানালেন, তিনি তাঁর কথামতো হুইট্‌লকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। তবে, যেহেতু চিরখারীতে গিয়ে পৌঁছতে যথেষ্ট সময় লাগবে এবং তাতে চিরখারীর রাজাকেও সাহায্য করা যাবে না এবং চতুর্দিকে ভারতীয় সৈন্যরা তৎপর হয়ে উঠবে, সেহেতু তিনি আগে ঝাঁসী জয় করে মধ্যভারতে ভারতীয়দের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি ধ্বংস করে ফেলতে চান।

হিউরোজ ও হুইট্‌লক পারস্পরিক পত্রসংযোগ স্থাপনা করলেন। রবার্ট হ্যামিল্টন তখন প্রথমে ঝাঁসী জয়ের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি দিয়ে গভর্নর জেনারেলকে সমস্ত ঘটনাটি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি লিখলেন—

'..................গভর্নর জেনারেলকে হিউরোজের দ্বিতীয় ব্রিগেডের যথাযথ অবস্থান বোঝাবার জন্য আমার নিম্নলিখিত কথাগুলি বলা প্রয়োজন।

আমাদের দ্বিতীয় ব্রিগেড আজকে ঝাঁসীর দশ মাইলের মধ্যে রয়েছে। ব্রিঃ স্টুয়ার্ট (Steuart)-এর অধীনে সমস্ত সওয়াররা ঝাঁসী শহর কিভাবে বেষ্টন করা যায় তাই পর্যবেক্ষণ করছে। আমাদের চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার মেজর বয়লো (Major Boileau)। কেল্লার পাঁচিলের দুর্বল স্থান কোনটা, কোথায় আক্রমণ করা যায়, আমাদের ঘাঁটি কোথায় হবে, সেইসব দেখতে গিয়েছেন। ঝাঁসীর ভারতীয় সৈন্যরা আমাদের অগ্রগতি সম্বন্ধে সমস্ত খবর রাখে। এখন আমরা যদি নিষ্ক্রিয় হয়ে সরে যাই, তাতে তারা উৎসাহিত হবে এবং যুদ্ধের উদ্দীপনা তাদের বেড়ে যাবে।

প্রথম ব্রিগেড চন্দেরী জয় করে এখনও এসে পৌছয়নি। আপনার আদেশমতো চিরখারীর পক্ষে যেতে হলেও হিউরোজকে তার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

হিউরোজ যদি এখনই চিরখারী চলে যান, তাঁকে কেল্লার কামানের পাল্লার ভেতর দিয়ে (কেননা তা ছাড়া আর পথ নেই) বড়োয়া সাগর রোড ধরে যেতে হবে। তাতে করে এই হবে যে, প্রথম ব্রিগেডের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগই থাকবে না এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রিগেডের মাঝখানে থেকে যাবে ঝাঁসীর কেল্লা, তার ১,৫০০ বিলায়েতী ও ১,০০০ বুন্দেলা সৈন্য।

তাছাড়া, রাণী আমাদের অগ্রগতির খবর পেয়ে অরছা ও মৌ থেকে তাঁর ফৌজ গুটিয়ে এনেছেন। সম্ভবতঃ তিনি তাঁতিয়া টোপীর সাহায্য চাইবেন। তাঁতিয়া তখন বাধ্য হয়ে চিরখারী ছেড়ে ঝাঁসীর দিকে আসবেন এবং আমরা ঝাঁসীর কাছাকাছিই তাঁতিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব।

কাজেই গভর্নর জেনারেল নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন বর্তমানে ঝাঁসী ছেড়ে চলে যাওয়া কতখানি রাজনীতিক অদূরদর্শিতার কাজ হবে।

ঝাঁসীর পতন সমস্ত ভারতীয় বিদ্রোহীদের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে এবং বুন্দেলখণ্ড থেকে ভারতীয় বিদ্রোহীদের সমূলে উচ্ছেদ করা অনেকখানি সহজ হবে।

স্বাক্ষরিত—ডবলিউ. আর. হ্যামিল্টন।'

এই চিঠি পেয়ে লর্ড ক্যানিং হ্যামিল্টনের যুক্তির জোর বুঝলেন। তিনি হ্যামিল্টনের মতে মত দিলেন।

২১শে মার্চ ১৮৫৮ তারিখে হিউরোজ সকাল সাতটায় ঝাঁসীর সামনে পেঁীছলেন।

নাতিউচ্চ পাহাড়ের ওপর দুর্নিবার প্রতিরোধের মতো ঝাঁসীর কেল্লার দক্ষিণবুরুজ থেকে ইংরেজকে স্বাগত জানাতে রাণীর লালনিশান প্রভাতের মন্দবাতাসে উড়তে লাগল।

'One of these towers had been raised by the rebels, from it floated the red standard of the Ranee.'

'বাঈ নে ভেজো অংরেজো বাত।
হৌতা লেব কটোয়ার হাঁথ॥
কটোয়ার হাঁথ লেব ন্যাব চঢ়াও।
ন্যাব চড়াও সী মোরছে বড়াও॥
মোরছে বঢ়াও সী তেলংগা শের।
মৈঁ তো বাঘিন্ হৌ সমঝায়ো ফের॥'

'বাঈ ইংরেজকে খবর পাঠালেন, যদি পুরুষ হও তো তলোয়ার হাতে নাও। যুদ্ধ শুরু কর, মোরচা এগিয়ে আন। কিন্তু তুমি যদি বাঘ হও তো আমিও বাঘিনী—সে কথা মনে রেখ।'

সতের

ঝাঁসীর কেল্লা দেখে হিউরোজ বুঝলেন, এবারে তিনি সত্যিকারের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছেন। হিউরোজ দেখলেন— অত্যুন্নত পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝাঁসীর কেল্লা। সুদৃঢ় গ্র্যানাইট পাথরে তৈরি তার দেহ। সুউচ্চ শিখরগুলিতে সন্নিবেশিত কামান চতুঃপার্শ্বের ওপর নজর রাখছে। কেল্লার গায়ে গোলন্দাজদের দাঁড়িয়ে কামান ছুঁড়বার জায়গা এবং দুটি, তিনটি করে বন্দুক ছুঁড়বার চৌকো খিড়কীও রয়েছে।

দক্ষিণের কিয়দংশ ও পশ্চিম ছাড়া কেল্লার অন্য সবদিকেই শহর। কেল্লার পশ্চিমদিকে খাড়া পাহাড়, দক্ষিণদিকের মাঝামাঝি বিশাল বুরুজ। এই বুরুজ থেকে নগরপ্রাচীর শুরু এবং শেষ হয়েছে কেল্লার দক্ষিণতম অংশে গিয়ে একটি বিশাল সুদৃঢ়

নিরেট পাথরের গাঁথনিতে। এই গাঁথনিটির সামনে রয়েছে একটি গোল বুরুজ। তার বিস্তৃতি ও পরিসর এত বেশি যে, সেখানে পাঁচটি কামান বসান চলে। এই বুরুজটি ঘিরে একটি পাথরের গভীর পরিখা। এই বুরুজটির অবস্থিতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে এখানে সর্বদাই বহুলোক ব্যস্ত রয়েছে।

ঝাঁসীর উত্তর ও পূর্ব সীমান্ত দিয়ে যে পর্বতমালা, তার ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছে ঝাঁসী-অরছা এবং ঝাঁসী-কাল্পি রোড। উত্তর দিয়ে চলে গিয়েছে ঝাঁসী-দতিয়া ও ঝাঁসী-গোয়ালিয়ার রোড।

কেল্লা থেকে পুবদিকে, নগরপ্রাচীর গিয়ে শেষ হয়েছে লছমীতাল হ্রদে যাবার পথে লছমী দরওয়াজায়। সেখান থেকে প্রাচীর পুব থেকে উত্তর, উত্তর থেকে পশ্চিম ঘুরে নগর বেষ্টন করেছে। কেল্লার দক্ষিণ থেকে পুবদিকে বিস্তৃত নগরপ্রাচীরের মধ্যে চারটি গুরুত্বপূর্ণ দরওয়াজা—অরছা, সাগর, লছমী, সঁইয়ার।

প্রথম ব্রিগেড সহ ব্রিগেডিয়ার Steuart এসে না পৌঁছন পর্যন্ত হিউরোজ ঝাঁসী আক্রমণ করতে ভরসা পাননি। ১০শে মার্চ হিউরোজ যখন ঝাঁসী থেকে আট মাইল দূরে, তখনই তিনি ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্টকে শহর বেষ্টন করতে পাঠিয়েছিলেন।

রাণীর সাহায্যার্থে সেদিন একশ' বুন্দেলখণ্ডী গ্রামবাসী ঝাঁসীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ব্রিগেডিয়ার Steuart-এর সৈন্যদের সঙ্গে এই গ্রামবাসীদের লড়াই হল কেল্লার পশ্চিমে আড়াই মাইল দূরে, বর্তমান স্টেশন থেকে নয়া ক্যান্টনমেন্ট যাবার পথে কোন জায়গাতে। ব্রিগেডিয়ার Steuart বেরিয়েছিলেন সাতশ' অশ্বারোহী নিয়ে। এই অসমান যুদ্ধে একশ' বুন্দেলখণ্ডী নিহত হল। Steuart তাঁদের ঘোড়া দিয়ে ঘিরে ফেলে (ভারতীয়দের ঘোড়া বা বন্দুক কিছুই ছিল না) গুলী করে মারলেন। মৃতদেহগুলি সেখানেই পড়ে রইল।

রাণী ব্রিটিশ সৈন্যদের সংখ্যা, শক্তি, পরিকল্পনা সম্পর্কে যথাযথ খবর রাখতেন। এইসময় তাঁতিয়া টোপীকে খবর দেওয়া তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল। তাঁতিয়া টোপীকে তিনি যা জানিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তাঁতিয়া টোপী ১০-৪-১৮৫৯ তারিখে তাঁর অন্তিম স্বীকারোক্তিতে বলে গিয়েছেন,—

'যখন আমি চিরখারী জয় করলাম, বাণপুরের রাজা ঠাকুরমর্দন সিং, শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব্‌ আলী, দেওয়ান দেশপৎ, দৌলত সিং, কুচওয়া খারওয়ালা এবং অন্যান্য অনেকে আমার সঙ্গে চিরখারীতে যোগ দিলেন। সেই সময় আমি ঝাঁসীর রাণীর চিঠিতে জানলাম যে, তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমি যেন তাঁর সঙ্গে যোগ দিই।

আমি কাল্পিতে রাওসাহেবকে খবর দিয়ে জানালাম সেই কথা। রাওসাহেব জয়পুরে এলেন। আমাকে রাণীর সাহায্যার্থে যেতে অনুমতি দিলেন। ঝাঁসীর পথে আমি যখন বড়োয়া-সাগরে এলাম, রাজা মানসিং আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। ঝাঁসী থেকে এক মাইল দূরে বেতোয়ার বুকে আমাদের যুদ্ধ হল ইংরেজের সঙ্গে। সেই সময় আমার সঙ্গে ২২,০০০ সৈন্য ও ২৮টি কামান ছিল। আমি যুদ্ধে পরাজিত হলাম। একদল সৈন্য ৪।৫টি কামান নিয়ে কাল্পি চলে যায়। আমি নিজে ভাণ্ডীর ও কুঁচ হয়ে ২০০ সিপাহী নিয়ে কাল্পি পৌছলাম ৫ই এপ্রিল ১৮৫৮-তে। রাণী ৪ঠা এপ্রিল রাতে ঝাঁসী পরিত্যাগ করে ৫ই এপ্রিল রাত দুটোর সময়ে কাল্পি পৌছলেন। তাঁর নিজের সৈন্য ছিল না, সেইজন্য তিনি রাও-সাহেবকে অনুরোধ করেন তাঁকে সৈন্য দিতে। রাও-এর অনুমতি ক্রমে আমি রাণীর নেতৃত্বাধীনে কুঁচ-এ যুদ্ধ করেছিলাম।'

রাওসাহেবের অনুমতি নিয়ে আসতে তাঁতিয়া টোপীর যে ক'দিন দেরী হল তার মধ্যে হিউরোজ তাঁর কাজ শুরু করে দিলেন।

দক্ষিণের সেই বুরুজটি দখল না করতে পারলে শহরে প্রবেশ বা প্রাসাদ দখল যে কিছুই সম্ভব হবে না, তা তিনি বুঝলেন। শহর দখল করতে পারলেই কেল্লা দখল করা যাবে। অন্যথায় যাবে না। শহর দখলের জন্য, কেল্লা আক্রমণের জন্য, দক্ষিণদিকের এই বুরুজটি দখলের গুরুত্ব বুঝে তিনি লছমীতাল হ্রদের দক্ষিণে অরছা দরওয়াজার মুখোমুখি একটি নাতিউচ্চ টিলার ওপর তাঁর ব্যাটারী স্থাপন করলেন।

জোকানবাগের নিকটস্থ কাপুটিক্‌রীতে তিনি অপর একটি ব্যাটারী স্থাপন করলেন। ২৫শে মার্চ প্রথম ব্রিগেড নিয়ে Steuart এসে পৌছবার আগে পর্যন্ত এই দুটি ব্যাটারী স্থাপন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল না।

২৩শে মার্চ হিউরোজ দক্ষিণবুরুজটির ওপর গোলাবর্ষণ শুরু

করলেন। শহরের বাইরে একজনও ভারতীয় ছিল না। সমস্ত শক্তি ছিল ভিতরে। রবার্ট হ্যামিল্টন এইসময় অনুমান করে জানালেন, ঝাঁসীতে দশহাজার বুন্দেলা ও আফঘান সৈন্য, পনেরশ' ভারতীয় সিপাহী, চারশ' সওয়ার ও ত্রিশ থেকে চল্লিশটি কামান আছে।

কেল্লার প্রত্যেকটি শিখর—সাগর লছমী ও অরছা দরওয়াজার ব্যাটারী থেকে কামানের জবাবে কামানের উত্তর আসতে লাগল। ভারতীয় গোলন্দাজদের অদ্ভুত নৈপুণ্যে বিস্মিত হলেন ইংরেজরা। প্রধান গোলন্দাজ গোলাম ঘৌসের পক্ষে প্রথমদিকে কামানের পাল্লা ঠিক করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একবার ঠিক করে নিয়ে তিনি এমনভাবে কামানের গোলাবর্ষণ করতে লাগলেন যে, প্রত্যেকটি গিয়ে পড়তে লাগল ইংরেজ ব্যাটারীর ওপর। ঘনগর্জ-এর গোলাবর্ষণে ইংরেজরা পর্যুদস্ত হলেন বেশি। কেন না ঘনগর্জ-এর বিশেষত্ব ছিল গোলা বের হবার সময়ে অন্যান্য কামানের মতো ধোঁয়া বের হত না। তীব্র শীৎকারের সঙ্গে গোলা এসে পড়তে লাগল দক্ষিণদিকে নির্মিত বিভিন্ন ইংরেজ ব্যাটারীর ওপর। মহাদেবের মন্দিরে একটি ব্যাটারী নির্মাণ করেছিলেন হিউরোজ। সেটি ২৩শে মার্চ বারবার অকেজো হয়ে পড়তে লাগল। গরনালাকে ইংরেজরা নাম দিয়েছিল "Whistling Dick."

২৩শে মার্চ দুপুরের মধ্যে ঝাঁসীর কামানগুলি সাময়িকভাবে নীরব হল। কিন্তু ২৪শে মার্চ পুনর্বার তারা গর্জে উঠল। গোলাম ঘৌস খাঁ নিজে সবগুলি কামান তদারক করছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সহকারী লালাভাও বক্সী ও দেওয়ান রঘুনাথ সিংহ ছিলেন কেল্লাতে। সঁইয়ার গেট থেকে ২৩শে মার্চ রাতে সাগর গেটে চলে গেলেন খুদাবক্স খাঁ। পীরআলী, দুলহাজু, খুদাবক্স প্রত্যেকেই অতীব বিচক্ষণ গোলন্দাজ ছিলেন। গোলন্দাজদের সাহায্য করছিলেন মেয়েরা। পরমদুঃখের বিষয় সুন্দর, মান্দার, কাশী, ঝলকারী এই কয়েকটি ছাড়া আর কোন মেয়ের নাম জানা যায় না। ইংরেজরা সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন ভারতীয় মেয়েরা ব্যাটারীতে ব্যাটারীতে পাঠানী পোশাকে সজ্জিত হয়ে ক্ষিপ্রগতিতে আসা যাওয়া করছেন, কামানের গোলা সরবরাহ করছেন, এবং প্রয়োজন মতো গুলী চালাচ্ছেন।

কেল্লার বাগিচাবুরুজে ছিলেন সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা। দেশের এই দুর্দিনে হিন্দু মুসলমান উভয়েই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। শতাধিক বর্ষ পূর্বে ঝাঁসীর কেল্লার বাগিচাবুরুজে মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের পতাকা পাশাপাশি প্রোথিত হয়েছিল।

সর্বত্র একটি সুদৃঢ় প্রতিরোধ দেখে হিউরোজ বলেছিলেন—

> 'সর্বত্র সবকিছুতেই জনসাধারণ যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছিল। রাজনীতিকভাবে এই বলা যায় যে, সম্মিলিত বিদ্রোহী দল জানতেন, মধ্যভারতের সব চেয়ে বিত্তশালী হিন্দুনগরী ও শ্রেষ্ঠ দুর্গ ঝাঁসীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যভারতে ভারতীয় বিদ্রোহেরও পতন ঘটবে।'

২৫শে মার্চ প্রথম ব্রিগেডের সীজ্ ট্রেন এসে পৌঁছল। পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্বে ইংরেজদের যে কয়েকটি ব্যাটারী নির্মিত হয়েছিল, তার থেকে অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করে হিউরোজ দক্ষিণের বুরুজটি দুর্বল করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ২৬শে মার্চ থেকে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত পারস্পরিক গোলাবর্ষণ চলল।

> 'The garrison, were as resolute to hold the fortress as their opponents were to wrest it from their groop. Even women were seen working in the batteries and distributing ammunition.'(T.R. Holmes).

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার দিকে হিউরোজ আশান্বিত চিত্তে দেখতে লাগলেন প্রাচীরে ফাটল ধরেছে এবং ভারতীয় ব্যাটারীগুলি তাঁর গোলার আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। কিন্তু রাতারাতি রাণীর মিস্ত্রীরা কালোকম্বলে গা ঢেকে সেই সব মেরামত করে নিতে লাগল। দুর্গ ও নগর প্রাকারের সর্বত্র বালির বস্তা জলে ভিজিয়ে সারবন্দী করে রাখা হয়েছিল। তাতে কামানের গোলা প্রতিরোধ করেছিল।

হিউরোজ, দক্ষিণ বুরুজ ও নিকটবর্তী পাঁচিল ভেঙে শহরে ঢুকবার পরিকল্পনা করেছিলেন। ভারতীয়দের গোলাবর্ষণে তাঁর যতটা ক্ষতি হল তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল ঝাঁসীর কেল্লা ও নগরী। শহরের মধ্যে দক্ষিণদিকে লছমীতাল রোডের পাশে ঘাসের বিশাল গঞ্জ ছিল। মার্চ মাসের তীব্র গরমে (১১৫°—১২০°

তাপের মাত্রায়) ঘাসগুলি শুকিয়ে গিয়েছিল। ইংরেজের গোলা পড়াতে ঘাসে আগুন লেগে নিকটস্থ ঘরবাড়িতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ল। তাছাড়া ঘন বসতি নগরীর যেখানেই গোলা পড়ছিল সেখানেই ক্ষতি হচ্ছিল।

রাণী এবং তাঁর সহ-যোদ্ধাদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়লেন। ২৯শে মার্চ সঁইয়ার গেটে খুদাবক্স খাঁ নিহত হলেন। ঝাঁসীর পুরনো বাসিন্দারা আজও কুমার খুদাবক্স খাঁ'র বীরত্বের কথা গল্প করে থাকে। এই বীর যোদ্ধা তাঁর ডান হাত অকর্মণ্য হয়ে গেলে বাঁ হাতে কামান চালাবার চেষ্টা করেন এবং মাথায় সাঙ্ঘাতিক আঘাত না লাগা পর্যন্ত সঁইয়ার গেটের প্রতিরোধকে তিনি দুর্বল হতে দেননি। রঘুনাথ সিংহ লছমী, অরছা ও সাগর দরওয়াজার তত্ত্বাবধান সেরে ফিরছিলেন। মুমূর্ষু খুদাবক্সকে ঘোড়ার পিঠে করে সযত্নে তিনি কেল্লায় বহন করে আনলেন। কিন্তু তখন তার চেয়েও নিদারুণ দুঃসংবাদে রাণী থেকে যোদ্ধারা সকলেই বিচলিত। ঘনগর্জ কামান চালাতে চালাতে গোলাম ঘৌস খাঁ'র বুকে গুলী এসে বিঁধেছে। প্রৌঢ় পাঠান গোলাম ঘৌস খাঁ, সুদক্ষ গোলন্দাজ, মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীর সৈনিক তিনি। তাঁর পতনে সমগ্র ঝাঁসী নগরীর ওপর বিপদের কালো ছায়া যেন সমাসন্ন হল। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ইংরেজের কামান নীরব। শঙ্কর মন্দির থেকে আজ ইংরেজরা নতুন ব্যাটারী স্থাপন করে যুদ্ধ করছিলেন। গোলাম ঘৌস, সুনিপুণ লক্ষো, শঙ্কর মন্দিরকে ধূলিসাৎ করেছিলেন। কাপুটিক্রীতে ব্যাটারী মেরামত নিরত ইংরেজ পক্ষের হাবিলদার ও দুইজন সিপাহীকে নিহত করেছিলেন এক গোলায়। তাঁর সুনিপুণ গোলা চালনায় উৎফুল্ল হয়ে আজই রাণী তাঁকে নিজের পা থেকে খুলে রূপার চিপাতোড়া (anklet) পুরস্কার দিয়েছিলেন। এই কয়দিন ধরে গোলাম ঘৌসের কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত হয়েছে বিভিন্ন কামানের নাম, "নলদার! কড়কবিজলী! ভবানীশঙ্কর, সমুদ্র-সংহার! অর্জুন!" তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করেছেন খুদাবক্স প্রমুখ বীর গোলন্দাজরা! আজ একই দিনে গুরু ও শিষ্যের পতন

হল। মুমূর্ষু গোলাম ঘৌসের মাথা রাণী কোলে তুলে নিলেন। নিঃসঙ্কোচে অশ্রুবর্ষণ করলেন। গোলাম ঘৌসের মৃত্যু হলে নির্দেশ দিলেন কেল্লার ভেতর বীরের সম্মানে গোলাম ঘৌস ও খুদাবক্সকে সমাহিত করা হোক। কেল্লার চবুতরা মহলের দক্ষিণ কোণে আজও সেই সমাধি রয়েছে। ২৯শে মার্চ তার জিয়ারৎ হয়, আর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়। ঝাঁসীর মানুষ আজও সেখানে এসে এই দুই বীর সৈনিককে শ্রদ্ধা জানায়। খুদাবক্সের সমাধির পাশে রয়েছে মোতিবাঈ-এর কবর। গোলাম ঘৌসের পতনের পর কামান চালাতে চালাতে মোতি প্রাণ দিয়েছিলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা স্বরূপ খুদাবক্সের পাশে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। রাজনর্তকীকে সংগ্রামী যোদ্ধায় রূপান্তরিত করেছিলেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। সেদিন অন্য দেশে কোন নর্তকী সংগ্রামী সৈনিকের সম্মান পেয়েছেন বলে জানা নেই।

ঝাঁসীর যুদ্ধে এই কয়দিনে রাণীর বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হয়েছে, ক্ষতিও হয়েছে প্রচুর। তাতে তাঁর উৎসাহ বা যুদ্ধোদ্যমে ভাঁটা পড়েনি। কিন্তু আজ তাঁর মন অজানিত শঙ্কায় পূর্ণ হল। তাঁর সহযোদ্ধারা বিষণ্ণ হয়েছেন জেনে তিনি সন্ধ্যার পর ঘোড়ায় চড়ে শহরের প্রত্যেকটি ঘাঁটি ও বুরুজ ব্যক্তিগতভাবে তত্ত্বাবধান করলেন। সৈন্যদের মুক্তহাতে পুরস্কৃত করলেন অর্থ ও অলঙ্কারে। নানারকম আশা ও ভরসার কথা বলে তাদের মনে উৎসাহ সঞ্চার করলেন।

লালুভাও ঢেকরে রাণীকে বললেন, আমি গণপতি-মন্দিরে মাঙ্গলিক পূজা দিতে চাই। রাণী বললেন, আপনার অভিরুচি মতো যা হয় করুন।

ক্লান্ত রাণী সেদিন সন্ধ্যায় আহার পর্যন্ত করলেন না। স্নানান্তে সামান্য দুধ পান করে তিনি দেওয়ানখানায় ক্ষণিক বিশ্রামের জন্য গেলেন। তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন, সুবিশাল কালো চোখ, গৌরবর্ণ দেহ, রক্তবর্ণ অধর এক সুন্দরী যুবতী কেল্লার বুরুজে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকার আকাশের পটভূমিকায় তাঁর দিব্য মূর্তি দীপ্যমান। আরো দেখলেন, সেই রক্তাম্বরবসনা, রত্নালঙ্কার ভূষিতা রমণী অতি অবহেলে এক অগ্নিবর্ণ গোলক দুই হাতে ধরে আছেন। রাণীকে ডেকে তিনি বললেন—আমি এই দুর্গলক্ষ্মী।

এতদিন পর্যন্ত আমি দুর্গ রক্ষা করেছি। আজ বুঝি আর পারব না। তুমি চেয়ে দেখ, আমার দুটি হাতের দিকে চাও। রাণী সভয়ে দেখলেন সেই সুন্দর হাত দুইখানা ঘোর কালিমালিপ্ত এবং দগ্ধ।

পলকে নিদ্রাভঙ্গ হল। বেরিয়ে এসেই এই স্বপ্নের কথা তিনি বললেন। আশ্চর্য হয়ে শ্রোতারা শঙ্কা গণল মনে।

দক্ষিণবুরুজ এবং শঙ্কর কেল্লা নীরব দেখে ৩০শে মার্চ হিউরোজ দ্বিগুণ উৎসাহিত হলেন। এই সময় হিউরোজের ইঞ্জিনীয়ার মেজর বয়লো (Boilaeu) জানালেন, গোলাবারুদের পরিমাণ কমে এসেছে। দক্ষিণবুরুজ ও প্রাচীর ভেঙে নগরে প্রবেশের পরিকল্পনা বর্তমানে পরিহার্য। অতএব জোর করে নগরে ঢুকে পড়তে হবে। হিউরোজ সম্মত হলেন। জানালেন, প্রাচীর ভেঙে মইয়ের সাহায্যে নগরে ঢুকতে হবে।

হিউরোজের সঙ্গে আধুনিকতম কামান ছিল একশ' দুইটি। ৩০শে মাচ লেফটেনাণ্ট স্ট্রাট বেলা দুটোর সময় দূরবীণ দিয়ে শঙ্কর কেল্লার গতিবিধি লক্ষ্য করে কেল্লার জলাধারের ওপর পরপর তিনটি গোলাবর্ষণ করলেন। ত্রিশজন পুরুষ ও আটজন রমণী নিহত হলেন। তাঁদের গোলা কেল্লাতে বিপর্যস্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছে বুঝতে পেরে ইংরেজরা আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। নিদারুণ গ্রীষ্মের মধ্যে জলাধার নষ্ট হওয়াতে কেল্লাতে দারুণ বিশৃঙ্খলা ও হতাশা উপস্থিত হল।

হিউরোজ সবদিক দেখে শুনে ৩১শে মার্চ ঝাঁসী আক্রমণের দিন ধার্য করলেন। শত্রুপক্ষের অটল যুদ্ধোদ্যম তাঁকে ধৈর্যচ্যুত করছিল। এতখানির জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। শত্রুপক্ষ যেন পরাজিত হয়েও হার স্বীকার করতে চায় না—'With many men disabled, many men killed and wounded the enemy still maintained the fight.' (H. Rose.)

বহুজন অপারগ, বহুজন নিহত এবং আহত, তবুও শত্রুরা যুদ্ধ করে চলল।

ঝাঁসীস্থ তেরটি ব্যাটারীর মধ্যে কেল্লার দক্ষিণবুরুজ, (হিউরোজ যার নাম দিয়েছিলেন Wheel tower), শঙ্কর কেল্লা, বাগিচাবুরুজ, সঁইয়ার গেট এইসব প্রধান প্রধান ভারতীয় ঘাঁটিগুলি নীরব

হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ঝাঁসীতে দারুণ হতাশ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

হিউরোজ ঝাঁসীর পূর্বদিকে পাহাড়ের ওপর টেলিগ্রাফ পোস্ট স্থাপন করেছিলেন। ৩১শে মার্চ অতর্কিতে ঝাঁসী আক্রমণ করবার সমস্ত ব্যবস্থা যখন ঠিক হয়ে গিয়েছে তখন এক দূত এসে খবর দিল যে, কমপক্ষে বিশহাজার সৈন্য নিয়ে তাঁতিয়া টোপী উত্তরদিক থেকে অগ্রসর হচ্ছেন ঝাঁসীর দিকে।

৩১শে মার্চ তাঁতিয়া টোপী ঝাঁসীতে রাণীকে তাঁর আগমনবার্তা দেবার জন্য বেতোয়ার উত্তর তীরের শুকনো ঝোপ ঝাড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। ঝাঁসীতে আনন্দ এবং নতুন উৎসাহের সঞ্চার হল। মহানন্দে কেল্লার প্রাকারে, অলিন্দে জমায়েৎ হয়ে আনন্দ করতে লাগলেন অবরুদ্ধ যোদ্ধারা। সাময়িকভাবে তাঁরা নিজেদের বিপদ বিস্মৃত হলেন।

হিউরোজ বুঝলেন তাঁর সমূহ বিপদ সমাসন্ন। ঝাঁসী শহর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে বেতোয়ার তীরে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাতে সমগ্র ব্রিটিশবাহিনী বিধ্বস্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। অতএব তিনি নগরীর অবরোধ এতটুকু শিথিল না করে, ৩১শে মার্চ সন্ধ্যার পর প্রথম ব্রিগেডের কিছু সৈন্য ঝাঁসী-কাল্পি রোডের ওপর টেলিগ্রাফ হিলের নিচে সন্নিবেশিত করলেন। হাতী দিয়ে টানিয়ে ছুটি চব্বিশ পাউণ্ড গোলার কামান নিয়ে বসালেন ঝাঁসী-অরছা রোডের ওপর। সমস্ত রাত ধরে অপেক্ষা করে রইল তাঁর বাহিনী এবং তিনি নিজে রইলেন সেখানে।

৩১শে মার্চ-এর রাতে অবরুদ্ধ ঝাঁসীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ইংরেজদের পক্ষেও সে রাত চরম উত্তেজনার। ১লা এপ্রিলের সকালে জয়পরাজয় মীমাংসিত হবে। সেই যুদ্ধ হবে চূড়ান্ত। সমস্ত রাত ধরে ইংরেজরা শুনতে লাগল, ঝাঁসী শহরের মানুষের কথাবার্তা, গোলমাল। সমস্ত রাত কেল্লা ও শহরের ঘাঁটি থেকে গোলাগুলী এসে পড়তে লাগল ইংরেজ ব্যাটারীতে। ইংরেজরাও সাধ্যমতো জবাব দিতে লাগল।

রাণী অনেক আশ্বস্ত হলেন। দীর্ঘদিনের অবসানে রাতে তিনি স্নান করলেন। গণপতি-মন্দিরে ব্রাহ্মণদের দিয়ে খাবার

প্রস্তুত করে সর্বত্র সরবরাহ করলেন। আর তাঁর বিমাতা চিমাবাঈ শিশুপুত্রকে নিয়ে কেল্লাতে রইলেন।

তাঁতিয়া টোপী আসছিলেন বড়োয়াসাগরের দিক থেকে। হিউরোজ এগিয়ে গিয়েছিলেন ভূপোবা গ্রামের দিকে। রাতের নীরবতায় আফঘান সৈন্যদের একটি দল ইংরেজ শিবিরের একান্ত নিকটে এসে ছাউনি ফেলল। রাতে আফগান সৈন্যরা চেঁচিয়ে জানাতে লাগল, আমরা দলে অনেক, ফিরিঙ্গীরা কম, কাল সকালে দেখা যাবে কে জেতে কে হারে।

মাঝরাতে হিউরোজ খবর পেলেন, দলে দলে ভারতীয় সৈন্য বেতোয়া নদী ও রাজপুর নালা পার হয়ে ভূপোবা গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

তাঁতিয়া টোপীর একটি বাহিনী কোল্‌ওয়ার নালা পার হয়ে ঝাঁসীর দিকে আসতে পারে সে ভয় হিউরোজের ছিল। তাই তিনি ব্রিগেডিয়ার Stuartকে বড়াগঞ্জ গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। এই গ্রামটি ঝাঁসী থেকে আট মাইল দূরে বড়াগঞ্জ রোডের ওপর অবস্থিত। কোল্‌ওয়ার নালার দিকে ছিলেন মেজর স্কুডামোর।

সকালে দেখা গেল, বেতোয়া নদীর বিস্তৃত বেলাভূমি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে তাঁতিয়া টোপীর নেতৃত্বে হাজার হাজার সৈন্য। গোয়ালিয়ার কন্টিনজেণ্টের বাঘী সিপাহীদের লাল ও সাদায় নিশান উর্দি দেখা গেল। আর দেখা গেল বিভিন্ন রঙের পতাকা। এই বিশাল বাহিনীতে বান্দার নবাব, শাহ্‌গড় ও বাণপুরের রাজার সৈন্যদল, গোয়ালিয়ার কন্‌টিজেণ্ট, নওগঞ্জ ও কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা ছিল। হাজার হাজার বেয়নেট ঝলসে উঠছিল সকালের আলোয়। বিভিন্ন দলের গলা থেকে আওয়াজ উঠছিল ফিরিঙ্গী নিধনের। হাতী টানছিল বড় বড় কামান।

তুইদলের মধ্যে ব্যবধান যখন মাত্র ছয়শ' গজের তখন তাঁতিয়া টোপীর নির্দেশে ভারতীয় কামানগুলি গর্জন করে উঠল এবং বন্দুকগুলি অগ্নিবর্ষণ শুরু করল। তাঁতিয়া টোপীর পরিকল্পনা ছিল হিউরোজের সৈন্যবাহিনীর বাঁ দিকটিকে আগে যুদ্ধে টেনে নেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকটিকে আক্রমণ করবেন। হিউরোজ তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সতর্ক হলেন। তাঁতিয়া টোপীর

উদ্দেশ্য সফল হলে তাঁর সম্পূর্ণ বাহিনীটি (দুটি কামান ও ১১৮২ জন সৈন্য, সওয়ার ও গোলন্দাজ) যে একেবারে নিষ্পিষ্ট হয়ে যাবে এবং ঝাঁসী অবরোধকারী বাহিনীর অবস্থাও বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হবে, তা তিনি বুঝলেন।

সামরিক পরিকল্পনা, শৃঙ্খলা ও সতর্কতা বোধই হিউরোজকে সেদিন বাঁচিয়েছিল। বেতোয়ার যুদ্ধে যদি তাঁতিয়া টোপীর সামরিক নেতৃত্ব আশানুরূপ হত তাহলে মধ্যভারতে ১৮৫৮ সালের ইতিহাস অন্যরকম হয়ে যেত, একথা মনে করবার কারণ আছে।

তাঁতিয়া টোপীর সৈন্যবাহিনীর দুর্বল জায়গা কোনটি হিউরোজ তা এক পলকেই বুঝলেন। দেখলেন, মধ্যভাগে সৈন্য সমাবেশ পরমসুশৃঙ্খল, কিন্তু দুটি wingই দুর্বল। তাঁর নির্দেশে ক্যাপ্টেন প্রিটিজন (Prettijohn) ও ক্যাপ্টেন ম্যাকমোহন (Machmohan) তাঁতিয়া টোপীর দক্ষিণ বাহিনীটি আক্রমণ করলেন। হিউরোজ নিজে ক্যাপ্টেন নীড (Need)-এর বাহিনীর সঙ্গে আক্রমণ করলেন বাম দিকটি। তাঁতিয়া টোপীর সমগ্র বাহিনীর মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাঁতিয়ার নেতৃত্ব অকেজো হয়ে পড়ল। যুদ্ধ না করেই তাঁরা পশ্চাদপসরণ করতে লাগলেন।

যুদ্ধ না করে পশ্চাদপসরণ করতে হবে, সে ধারণা নিয়ে সিপাহীরা আসেননি। আদেশের জন্য তাঁরা উৎসুক অপেক্ষা করছেন, নেতারা পশ্চাদপসরণ করেছেন, এই সুযোগে হিউরোজের ফৌজ ভারতীয়দের তাড়া করল। ভারতীয় শিবিরে সামরিক নেতৃত্বের চরম ব্যর্থতার সুযোগ গ্রহণ করলেন হিউরোজ।

পশ্চাদপসরণ করতে করতেও অতুল বিক্রমে লড়তে লাগলেন আফঘান সৈন্যরা। ইংরেজ পক্ষের অশ্বারোহীরা অনুসরণ করে চললেন। খাল, নালা সর্বত্র ভীষণ লড়াই হতে লাগল। কোথাও কোথাও হাতাহাতি লড়াই পর্যন্ত হল।

সমস্ত গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে হিউরোজ তাড়া করে চললেন ভারতীয় সৈন্যদের। তাঁতিয়া টোপীর ব্যক্তিগত নেতৃত্বে একটি সুবিশাল বাহিনী প্রথম বাহিনী থেকে তিন মাইল দূরে অপেক্ষা করছিল। তাঁতিয়া টোপী হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি পেশোয়াশাহীর পতাকা বহন করছিলেন।

তাঁতিয়া টোপী প্রথম বাহিনীকে পরাজিত হতে দেখে তাঁর সমস্ত বাহিনীকে পশ্চাদপসরণের আদেশ দিলেন। পালাতে পালাতে তাঁর গোলন্দাজরা বার বার গোলা ছুঁড়তে লাগলো। তাঁতিয়া টোপী চললেন রাজপুর নালার দিকে। মাঝপথে যে জঙ্গলগুলি পড়ল সেগুলিতে ইংরেজ সৈন্যদের গতিরোধ করবার জন্য আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল।

তাঁতিয়া টোপীর তৃতীয় বাহিনীটি ছিল রাজপুর গ্রামে। রাজপুর গ্রামের সামনে বেতোয়া নদীর চড়ায় শেষ এবং চূড়ান্ত সংগ্রাম হল। তাঁতিয়া টোপী তাঁর সমস্ত কামান, বন্দুক, গোলাবারুদ ও হাতী ফেলে রেখে পালালেন। আঠারো হাজার ভারতীয় সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন দিকে পালাল।

এই যুদ্ধে হিউরোজ আঠারোটি কামান, অজস্র গোলাবারুদ পেলেন। ভারতীয় পক্ষে নিহত হলেন পনেরশ' জন। ইংরেজ পক্ষে কুড়িজন নিহত এবং একষট্টিজন আহত হয়েছিলেন।

বেতোয়ার যুদ্ধের পরাজয় সমগ্র মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ডের ১৮৫৮ সালের ইতিহাসে একটি মর্মন্তুদ ঘটনা। হিউরোজ ও অন্যান্য যে সব ইংরেজ অফিসার সেদিন বেতোয়াতে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বার বার ভারতীয় সৈন্যদের ব্যক্তিগত বীরত্বের প্রশংসা করে গিয়েছেন। বীর, স্বদেশ প্রেমিক ও মৃত্যুজয়ী বাইশ হাজার সৈন্য, আঠাশটি কামান, দশটি হাতী এবং শাহ্‌গড় ও বাণপুরের রাজার মতো বীর সহযোদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তাঁতিয়া টোপী সেদিন পরাজিত হয়েছিলেন। তার কারণ, সামরিক নেতা হিসাবে তাঁর ব্যর্থতা। নির্ভীক, স্বদেশ প্রেমিক, অক্লান্ত কর্মী তাঁতিয়া টোপী যদি ১লা এপ্রিলের যুদ্ধ ভালো করে পরিচালনা করতে পারতেন তাহলে মধ্যভারতে ইংরেজ অধিকার পুনর্স্থাপিত হবার সম্ভাবনা পিছিয়ে যেত সেদিন।

তাঁতিয়া টোপীর পরাজয় রাণীর মনে গভীর হতাশার সৃষ্টি করল। তিনি বুঝলেন এবার ঝাঁসীর পতন আসন্ন। তাঁর পঁয়ত্রিশটি কামান আছে, কিন্তু গোলাবারুদ ফুরিয়ে এসেছে। অবরুদ্ধ নগরীর খাদ্যভাণ্ডারের অবস্থাও শোচনীয়। তাঁর বাছাই করা যোদ্ধাদের মধ্যে অনেকেই মৃত বা আহত। নাগরিকদের মনেও

গভীর হতাশা সঞ্চারিত হয়েছে। তাঁর জন্য জীবনমৃত্যুর পরোয়া না রেখে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল যত সৈন্য সওয়ার নরনারী শিশু, তাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আজ তিনি দায়ী বোধ করলেন। ইংরেজ যখন প্রতিহিংসা নেবে তখন তাদের কি অবস্থা হবে তিনি ভেবে পেলেন না। ১লা এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে কেল্লায় এলেন।

রাণী তাঁর সর্দারদের এবং সিপাহীদের সমবেত করলেন। —"পেশবার সৈন্য—" এই কথা বলতে বলতে তাঁর নয়ন রক্তিম এবং অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল। তিনি কণ্ঠ পরিষ্কার করে উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন "আমার বাহাদুর সিপাহী, সর্দার, বন্ধুগণ, পেশবার সৈন্যের ভরসায় আমরা যুদ্ধে নামিনি। নিজেদের হিম্মতে আমরা এতদিন ঝাঁসীকে রক্ষা করেছি। আজ শত্রুসৈন্য সামনে, তবু আমাদের নিজের হিম্মতেই শেষ অবধি লড়তে হবে।"

১লা এপ্রিল সারারাত রাণী তাঁর সর্দারদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গোলন্দাজদের বখশীষ করলেন। দরওয়াজাগুলি সুরক্ষিত করলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদের উৎসাহিত করে নির্দেশ দিলেন স্ব স্ব স্থানে যেন তারা ঠিক থাকে। নগরীতে ঘুরে ঘুরে তিনি সমস্ত পরিদর্শন করতে লাগলেন। তাঁর নসীবের সঙ্গে নসীব মিলিয়ে যে সব নরনারী শিশু আজ আসন্ন মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েছে, তারা এখনও তাঁকে বিশ্বাস করে এবং এতটুকু অনুযোগ করে না, এই উপলব্ধি তাঁকে আঘাত করতে লাগল নিরন্তর।

সেইরাতে ইংরেজ শিবির থেকে গোলা পড়তে লাগল যেন বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টি হচ্ছে—

'লাল গোল্যাচাঁ বর্ষাঋতুতীল পর্জন্য প্রমাণে' বর্ষাব কেলা।'

আঠার

২রা এপ্রিল সকালে হিউরোজ দেখলেন দক্ষিণদিকের নগর প্রাচীরে বিশাল ফাটল হয়েছে। শহর আক্রমণের একটি পুরোপুরি নক্সা তৈরি করে তিনি ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের জানালেন।

আক্রমণকারী সৈন্যদের Right ও Left দুটি ভাগে ভাগ করা হল। Right attack, দক্ষিণের প্রাকার ও ফাটল-ধরা জায়গাটি, যার নাম হিউরোজ দিয়েছিলেন Breach, সেটি আক্রমণ করে শহরে ঢুকবে। Left attack, কেল্লার দক্ষিণদিকে নগর প্রাচীর শুরু হবার মুখের প্রথম বুরুজ, Rocket Tower দিয়ে শহরে ঢুকবে। আক্রমণের সঙ্কেতস্বরূপ আস্তে একবার মাত্র বন্দুকের শব্দ করা হবে।

১লা এপ্রিলের সন্ধ্যা থেকে রাণী, তাঁর পিতা মোরোপন্ত, বিমাতা চিমাবাঈ, পুত্র দামোদর ও অন্যান্য আত্মীয়পরিজনসহ কেল্লাতে ছিলেন।

২রা এপ্রিল রাত তিনটের সময় ইংরেজ বাহিনী সন্তর্পণে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সেদিন শুক্লানবমী, আকাশে চাঁদের আলো ঝলমল করছিল। মই ঘাড়ে করে নিয়ে sapper দল এগোচ্ছিল। সঙ্কেত শোনা মাত্র অন্য সৈন্যরাও তাদের অনুসরণ করল। চাঁদের আলোয় তাদের হাতের বেয়নেট ও তলোয়ার ঝকঝক করতে লাগল।

হিউরোজ যদি ভেবে থাকেন, রাণীকে তিনি অতর্কিতে আক্রমণ করবেন, তাহলে তিনি ভুল করেছেন। কেননা সেই রাত্রে ঝাঁসী নগরীর কোন ঘরে কারো চোখে ঘুম নেই। ঘরে ঘরে সকলে প্রতীক্ষা করছে। শিশু আজ কাঁদছে না, আহতও আর্তনাদ করছে না, কোন বাড়িতে জ্বলছে না আলো। কোন ঘরে রান্না হচ্ছে না। সন্ধ্যার আগেই জবাহির সিংহ ও রঘুনাথ সিংহ সমস্ত নগরী ঘুরে সকলকে জানিয়ে এসেছেন, আজকের রাত খুব সাবধানে থাকবে, আজকের রাতে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। প্রত্যেকটি বুরুজে, নগরীর প্রত্যেকটি দরোজায় সতর্ক প্রহরা জেগে আছে। রাজপুরোহিত যাগযজ্ঞ করে দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাণীর অনুমতি পাননি।

দুর্গের উত্তর বুরুজ থেকে অতন্দ্র দৃষ্টিতে রাণী দেখতে লাগলেন তাঁর ঝাঁসীকে। আজকের আকাশ কত নির্মল। চাঁদের জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে অবিরত দাক্ষিণ্যে। এমন রাতে ঝাঁসীর পথে পথে কেন মৃত্যু-দূতের নিঃশব্দ পদসঞ্চার? কালো কালো ছায়া ফেলে বাড়িগুলো নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে, কুকুরগুলো অবধি ডাকছে না। আজ রাতে তাঁর পতাকা উড়ছে বটে কেল্লার ওপর, কিন্তু কে জানে

আগামীকাল তার কী হবে! একদা যে নগরী তাঁকে বধূবরণ করেছিল আলোতে, বাজিতে, আনন্দে, উৎসবে তার সঙ্গে নিজেকে অনেক বন্ধনে বেঁধেছেন রাণী, সে বন্ধন শুধু তো বিবাহের গ্রন্থি-বন্ধন নয়। ঝাঁসী নগরী আজ চন্দ্রালোকে নিঃশব্দ জেগে আছে। অনেক ওপরে যে চাঁদটা চেয়ে আছে, তার মতো তিনিও আজ যেন নীরব এবং অতন্দ্র।

রাণী জানেন না, তিন মাস আগে, তাঁর কাছে কাশী যাবার পাথেয় সংগ্রহ করতে যে ব্রাহ্মণ এসেছিল সে ইংরেজের গুপ্তচর। তিনি আরও জানেন না যে, উৎকোচ নিয়ে সেই ব্রাহ্মণ অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়েছে যথা সময়ে ইংরেজকে দরজা খুলে দেবে বলে। আজ সে সাগর গেটের পাশে অপেক্ষা করছে।

সেই সন্ধ্যায় গুপ্তচর এসে খবর দিয়ে গিয়েছে তাঁতিয়া টোপী চিরখারীর পথে কাল্পি গিয়েছেন। কাল্পিতে রয়েছেন রাওসাহেব।

এদিকে মৃত্যু যেমন নিঃশব্দে আসে, তেমনই নীরবে ইংরেজরা দলে দলে এসে দুর্গ প্রাকারের তলায় দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর নির্দেশে বেজে উঠল বিউগল। অন্ধকার কেল্লা, নগর, বুরুজ সর্বত্র যেন মন্ত্র-বলে সহসা হাজার হাজার মশাল জ্বলে উঠল। গর্জে উঠল কামান, বন্দুক। Sapper বাহিনী মই নিয়ে লাগাল প্রাচীরের গায়ে। তখন মেয়েরা হাতে হাতে ওপর থেকে গাছ, পাথর, যা পেলেন ছুঁড়তে লাগলেন। মই বারবার পড়ে গেল। শেষকালে জোর করে উঠে পড়লেন লে: ডিক্ (Dick) ও লে: মেকলেজন (Meiklejohn)। তাঁরা রকেট টাওয়ার-এর ভেতরে লাফিয়ে পড়লেন। দিলীপ সিংহ পওয়ার ছিলেন সেখানে, ডিক্ ও মেকলেজনকে হত্যা করে তিনি নিজেও প্রাণ দিলেন ইংরেজের গুলীতে। এইভাবে অরছার এই রাজপুত সর্দার ঝাঁসীর প্রতি তাঁর শেষ ঋণ শোধ করলেন। দানবীয় উল্লাসে গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল অবশিষ্ট সৈন্য অফিসার ও সিপাহীরা। ওদিকে সাগর গেটও খুলে দিয়েছে সেই অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণ।

Left attack-এর দলটিও নগরীতে প্রবেশ করল এবং হিউরোজের নেতৃত্বে সমগ্র ইংরেজ বাহিনী প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হবার জন্য লড়তে লড়তে চলল। প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে রাইফেল

গর্জন করে উঠল। ইংরেজ সৈন্যরা তখন প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দিল। পাঁচ থেকে আশী বছরের প্রত্যেক পুরুষদের হিউরোজের সৈন্যরা হত্যা করতে লাগল। জ্বলতে লাগল শহরের শ্রেষ্ঠ পল্লী হালোয়াইপুরা। কাতর নরনারীর আর্তনাদ সমুদ্র কল্লোলের মতো উদ্বেলিত হয়ে দিকবিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

এই নিদারুণ দৃশ্যে রাণী আত্মহারা হয়ে তলোয়ার কোষমুক্ত করে ঘোড়া নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর হঠাৎ সবেগে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তখন তাঁর যেন কোন জ্ঞান নেই। অসিচালনা করতে করতে তিনি বিপদের কেন্দ্রস্থলে চলে যাচ্ছেন দেখে জনৈক বৃদ্ধ সর্দার নিজে আহত হয়েও তাঁর ঘোড়ার রাশ ধরে ঘুরিয়ে টেনে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে এল। বলল—"মহারাণী, ইংরেজের গুলীতেই যদি মরবেন তবে স্বামীর চিতায় সহমৃতা হওয়াই তো ভাল ছিল। এখন গোরা সৈন্য শহরে জলস্রোতের মতো ঢুকছে। নগরের প্রতিটি দ্বার উন্মুক্ত। এইভাবে মৃত্যু বরণ আপনার কি শোভা পায়? কেল্লায় চলে যান, দরোজা বন্ধ করে বন্ধুদের সঙ্গে যুক্তি করে কর্মপন্থা ঠিক করুন।"

রাণী তখন হৃত সম্বিৎ ফিরে পেলেন। স্বীয় আচরণের বার্থতা বুঝলেন। কেল্লায় এসে দরোজা বন্ধ করলেন।

জীবনমরণ সংগ্রাম করে তবে ইংরেজরা এক-এক পা অগ্রসর হতে পারল। শতশত ভারতীয় সংগ্রামী সৈনিকের শবদেহ অতিক্রম করে তারপর তারা প্রাসাদে প্রবেশ করল।

লেফটেনাণ্ট টার্নবুল (Turnbull) এই সময় নিহত হলেন।

Right ও Left attack-এর সমস্ত সৈন্যদল এই সময় প্রাসাদে সন্নিবেশিত হল। তারপর হিউরোজ নগরের অন্যান্য অংশ অধিকার করতে বেরোলেন। কোন ক্ষেত্রেই ভারতীয়রা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ছাড়া একচুল অধিকার ছাড়েননি। শতবর্ষ অতীত হয়ে গিয়েছে, সে-সংগ্রামের ভারতীয় ইতিবৃত্ত একটিও নেই। ইংরেজ সামরিক নেতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণী থেকেই বোঝা যায় যে, ব্রিটিশের নাগপাশ থেকে ক্ষণলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সেদিন ভারতীয়রা কতখানি মরিয়া হয়ে লড়েছিলেন। যাঁর নেতৃত্বের অধীনে তাঁরা সমবেত হয়েছিলেন, যাঁর আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যিনি

সেইদিনের সংগ্রাম সত্যিকারের স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সেই বীর তরুণীর কথা ভারতবাসীর মনে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

প্রত্যেকটি বাড়িতে নাগরিক ও সৈন্যরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন। প্রাসাদে রাণীর অশ্বশালা পাহারা দিচ্ছিলেন চল্লিশজন আফঘান রক্ষী। তাঁদের আক্রমণ করলেন দেড়শ' ইংরেজ। আফঘানরা অতুলবিক্রমে লড়তে লাগলেন। ঝাসীর বৃদ্ধ বাসিন্দারা বলেন, সেই আফঘানদের মধ্যে ছিলেন খুদাবক্সের সহকারী খুদাদাদ্! জনশ্রুতি এই যে, তিনি বলেছিলেন—

'কভি মর্ না হ্যায়, ভাই আজ মরুঙ্গা।
বাঈকে লিয়ে জান আবাদ করুঙ্গা॥
শম্‌সের সে কাট্‌কে মার তেলেঙ্গা।
জহাঁ মে আপনা নাম রাখুঙ্গা॥'

বন্দুকের গুলী যখন ফুরিয়ে গেল তখন সেই অবশিষ্ট আফঘানরা তলোয়ার নিয়ে লড়তে লাগলেন। আস্তাবলের পাশে ঘাসের গুদাম ছিল। ইংরেজরা চূড়ান্ত মজা করবার উদ্দেশ্যে সেই গুদামে আগুন লাগিয়ে দিলেন। তাতে তাদের কাপড়ে আগুন লেগে গিয়েছিল। দেহ অর্ধদগ্ধ, তবুও সেই আফঘান বীররা তলোয়ার ছাড়লেন না।

'They were half burnt. Their clothes in flames they rushed out, hacking at their assailants with their swords in both hands, till they were shot or bayoneted, struggling even when dying on the ground, to strike again.' (H. Rose's military despatch).

'তাদের দেহ অর্ধদগ্ধ। কাপড়ে আগুন জ্বলছে। তারা ছুটে বেরিয়ে এল। শত্রুদের ওপর তলোয়ার চালাতে লাগল, যতক্ষণ না তাদের গুলী বা বেঁয়নেট দিয়ে হত্যা করা হল।'

প্রাসাদের আশেপাশে রাণীর অশ্বারোহী সৈন্যদের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ হল ইংরেজদের। প্রাসাদ থেকে রাণীর তিনখানি লাল নিশান পাওয়া গেল, সেগুলি ছিঁড়ে ফেলল ইংরেজ সৈন্যরা। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের উপহার, ইউনিয়ন জ্যাকটি উড়ল প্রাসাদের ছাতে।

রাজপ্রাসাদে ঢুকে ইংরেজ সৈন্য ও অফিসাররা সমান তালে লুঠ করতে লাগলেন। সুবিখ্যাত কাঁচঘর, যার চারিপাশ মূল্যবান আয়না দিয়ে ঢাকা ছিল এবং রাজা গঙ্গাধর যেখানে বসে তাঁর

নাট্যশালার নর্তকীদের নাচ দেখতেন, তার প্রত্যেকটি কাঁচ গুঁড়ো করে ভাঙল তারা। একটি নর্তকী একটি বাতি জ্বেলে নাচতে শুরু করলে সেই ঘরে আর দেওয়ালের পাঁচশ' আয়নায় পাঁচশ' নর্তকীর প্রতিচ্ছবি পড়ত। সর্বক্ষণ ঝলমল করত সেই ঘর। গঙ্গাধরের সুবিখ্যাত "তাঞ্জাম", মৃত রাজপুত্র দামোদররাও-এর রূপার দোলনা, মূল্যবান গহনা, মণিমুক্তা, তৈজসপত্র, কাপড়-চোপড়, হাতী ঘোড়া, যত পারা গেল ব্রিটিশ শিবিরে বহন করে নিয়ে গেল সবাই। গ্রন্থাগারে ঢুকে ইংরেজরা তলোয়ার দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে রেশম, জরি, ইত্যাদি খুলে নিয়ে মূল্যবান বইগুলি ছিঁড়ে স্তূপাকার করলেন। তারপর অগ্নি সংযোগ করলেন সেই স্তূপে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল আর সেই আগুনে এসে পড়তে লাগল দর্শন, কাব্য, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষৎ, ময়ুখ, হেমাদ্রী ইত্যাদি। রঘুনাথ হরি একদা ইংরেজী থেকে মারাঠি ও সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ, সে সবও পুড়ে গেল। নদীয়া, কাশী আর তাঞ্জোর গিয়ে লিপিকাররা যে সব মূল্যবান গ্রন্থের অনুলিপি করে এনেছিলেন সেগুলিও পুড়ে গেল।

প্রভুদের লুণ্ঠনলীলার সময়ে অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল সৈনিকরা। তারপরে দেশীয় সিপাহীরা আরম্ভ করল লুণ্ঠন। বড়বড় তামা পেতলের বাসন থেকে শুরু করে যে যত পারল জিনিষপত্র নিয়ে গেল। তারপর প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানে পোষা হরিণ ময়ূর ইত্যাদি সেই আগুনে পুড়ে মরল। ঝাঁসীর সুবিখ্যাত রাজপ্রাসাদের প্রধান মহল সম্পূর্ণ পুড়ে গেল। বাকি রইল একপাশের কিছু অংশ মাত্র। তারপর প্রাসাদের আগুন সংক্রামিত হল শহরের অন্যান্য বাড়িতে। তখন বিজয়গৌরব সম্পূর্ণ করতে হিউরোজ "বিজন" ঘোষণা করলেন। "বিজন" মানে নির্বিচার নরহত্যা। ব্রিটিশরা নিজেদের সভ্যতার গৌরব করে কিন্তু হিউরোজের এই ঘোষণা সেই গৌরবকে চিরকালের মতো মসীলিপ্ত করল। তখন ঝাঁসী শহরে যা চলল তাকে প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার লো (Thomas Lowe) বলেছেন—

'Death was flying from house to house with mercurial speed, not a single man was spared. The streets began to run with blood.'

মৃত্যু ফিরতে লাগল ঘর থেকে ঘরে উল্কাগতিতে। একটি মানুষকেও ছেড়ে দেওয়া হল না। রাস্তাগুলিতে রক্তস্রোত বইতে শুরু করল।

ইতিহাস কি? কোন কথাকে আমরা ইতিহাস বলব? মানুষের কথা যদি ইতিহাস হয়, তবে বলব, ঝাঁসীর রাজপথে সেদিন যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তার বুঝি তুলনা নেই। ঘন সন্নিবিষ্ট বাড়িগুলির মাঝখানে পাথর বাঁধানো পথ ও গলি। কিশোর বালক থেকে শুরু করে পাঠান, আফঘান, বুন্দেলা, মরাঠা সৈন্য প্রত্যেকে সেখানে দাঁড়িয়ে শেষ অবধি লড়েছে। রক্তে পিছল হয়ে গিয়েছে পথ। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে শিশুরা আর্তক্রন্দন করেছে। জ্বলন্ত বাড়ির ইটপাথর এসে পড়েছে পথে। কিন্তু আজ তার কোনও চিহ্ন নেই। কত বাড়ি আজও দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলি ভাঙা-চোরা, তাদের কার্নিস খিলানে বুন্দেলখণ্ডী ছাঁচের কাজ। তাদের ঘরে ঘরে অনেক কথা, অনেক হাসি আর কান্না আজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ধুলো আর জঞ্জালভরা পথ। যেখানে রোদ পড়ে না সেখানে পাথরের রাস্তা ঠাণ্ডা। সেখানে যে-ইতিহাস রচনা করেছিল বহু হাজার ভারতীয় সেই ইতিহাসই ভারতের প্রকৃত ইতিহাস। দু'শ' বছরে ইংরেজ আমাদের কি কি করেছে আর কি কি দিয়েছে সে-ইতিহাস ঐ তুলনায় অনেক নগণ্য। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি ইংরেজের সেদিনের কলঙ্ক তার সমস্ত কীর্তিকে ম্লান করে দিয়েছে।

জওহরলাল নেহরু বলছেন—

> '...the memory of it still persists in town and villages. One would like to forget all this for it is a ghastly and horrible picture showing man at his worst, even according to the new standards of barbarity set up by nazism and modern war......The days of Nadir Shah and Timur were remembered, but their exploits were eclipsed by the new Terror, both in extent and the length of time it lasted. Looting was officially allowed for a week, but it actually lasted for a month, and it was accompanied by wholesale massacre. (*Discovery of India, p. 280*).

শুধু ঝাঁসীতে নয়, যেখানে যেখানে ইংরেজ ফৌজ গিয়েছিল সেখানেই তারা এইরূপ নৃসংশ অত্যাচার ও আচরণ করেছে। কানপুর ও ঝাঁসীতে ইংরেজ নরনারী হত্যা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু ইংরেজ নরনারীদের প্রত্যেকের মাথাপিছু বোধহয় বিশ হাজার করে ভারতীয়কে সেদিন হত্যা করেছিল ইংরেজ। সেইকথা বিজয়গর্বে তারা লিপিবদ্ধ করে রেখে গিয়েছে। এলাহাবাদ থেকে আর্মস্ট্রং (Armstrong) লিখছেন—

> 'কানপুরে যে detachment যাচ্ছে, আমি তার সঙ্গে যাব। এখন হচ্ছে চমৎকার সময়। বেনারসে, এখানে সেখানে, সর্বত্র প্রতিদিন ১০।১২ জন করে লোককে এক-এক বারে ফাঁসী দেওয়া হচ্ছে। নেটিভদের মধ্যে ভীষণ ভয় দেখা দিয়েছে। আসলে সিপাহীদের লেখা পড়া শিখিয়েই অনিষ্ট করেছি আমরা। আমার কথা শোন, educate a Sepoy, and he becomes a thorough-paced scoundrel.'

আর একজন, এলাহাবাদের কেল্লায় কর্নেল নীল (Col. Neill) এসে পড়লে কি হল তাই বলছেন—

> 'শিখরা শুধু লুঠ করছে আর মদ খাচ্ছে। তাদের দোষ দেওয়া যায় না। স্বভাবে তারা ভারি ফূর্তিবাজ কি না! আমরা কেল্লা থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বেরোই আর দু'পাশে নেটিভদের কাটতে থাকি। ভারি মজা লাগে আমার—নেটিভদের কেটে নামাতে যে কী ফূর্তি! স্টিমার করে গাঁয়ে গিয়ে আমরা দলে দলে Nigger-দের গুলী করলাম একদিন, সে আনন্দের কথা ভুলব না। রোজই আমরা বেরিয়ে গ্রাম পোড়াই আর নেটিভ মারি। নেটিভদের বিচার করার জন্য যে কমিশন বসেছে, আমাকে তার কর্তা করা হয়েছে। এখন আমি মানুষের জীবনমরণের কর্তা। একজনকেও ছেড়ে দিই না। রোজ অন্ততঃ বারোজনকে ফাঁসী দিচ্ছি। গরুর গাড়িতে চড়িয়ে এনে গাছের ডালে ঝোলাই আর গাড়িটা টেনে নিই—।'

সাধারণ ইংরেজ ফৌজের মধ্যেও সেদিন যে বিকৃত বর্ণ-বিদ্বেষ দেখা গিয়েছিল, তার তুলনা নেই। নেহরু বলছেন—

> 'Imperialism and domination of one people over another is bad and so is racialism. But Imperialism

plus racialism can only lead to horror and ultimately to the degradation of all concernd with them.

...The English were an Imperial Race, we were told, with the god given right to govern us and keep us in subjection ; if we protested we were reminded of the 'Tiger qualities of an Imperial Race.......It is on the records of British Parliament, that 'the aged women, and children are sacrificed as well.' They were not deliberately hanged, but burnt to death,... accidentally shot.' (*Discovery of India, p. 280*).

আরও অনেক ভয়াবহ হত্যালীলার কথা লিখে গিয়েছেন অন্যান্য সামরিক স্টেশনের অফিসাররা। এই নির্বিচার নরহত্যা চলেছিল দুই বছর ধরে। উত্তর ভারতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুইপাশের গাছগুলির বোধহয় একটি ডালও খালি ছিল না।

এইরূপ বিচার যদি নিরপরাধ গ্রামবাসীদেরই মিলে থাকে, তাহলে ঝাঁসীতে যে অত্যাচার আরো অনেক বেশি হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

কেল্লা থেকে রাণী দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। আর্ত নরনারী শিশু ছুটে বেড়াচ্ছে আর পৈশাচিক উল্লাসে ইংরেজ তাদের হত্যা করছে। জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে ঝাঁপ দিচ্ছে কতজন। দেখতে লাগলেন প্রভাতের আকাশ ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন করে ঝাঁসী শহর জ্বলছে।

এমনি সময় আড়াই বছরের শিশু চিন্তামণিকে কোলে নিয়ে মোরোপন্ত তাম্বের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী চিমাবাঈ। তিনি বললেন—"আমি কি করব বল।" মোরোপন্ত বললেন—"তোমার ও আমার পথ ভিন্ন। তুমি যদি পার আমার বংশধরকে বাঁচাও।" চিমাবাঈ মনস্থির করে রাণীর কাছে বিদায় চাইতে গেলেন। ঝাঁসীর ধ্বংসলীলার দিকে চেয়ে পাষাণ প্রতিমার মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছেন রাণী। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। রাণীকে সেই অবস্থায় দেখে চিমাবাঈ মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারলেন না যে, তিনি চলে যাচ্ছেন। বললেন—"আমি সাত আটদিন বাড়ি যাইনি। আজ একটু বাড়ি যেতে চাই।" রাণী বললেন—"আমাকে ছলনা কর না। আজ যদি যাও তবে জেনো এই আমাদের শেষ

সাক্ষাৎ।” চিমাবাঈ বললেন—“শেষ সাক্ষাৎ হবে কেন, আবার আমাদের দেখা হবে।” রাণী বললেন—“তুমি কেন আমাকে মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছ ? এ যে আমাদের শেষ সাক্ষাৎ তা কি নিজেই বুঝতে পারছ না ?” বলে সাশ্রুলোচনে তাঁর আজীবন সঙ্গিনী জননী, বান্ধবী, শুভার্থিনী এই মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। শিশু ভ্রাতাকে আদর করলেন। তারপর বললেন—“আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। বহু টাকার চেয়ে একখানি গহনা মূল্যবান। অর্থ ছাড়া বিপদের সময়ে চলে না। কিন্তু অলঙ্কার দেহে থাকার চেয়ে গোপনে থাকাই ভাল।” রাণীর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে চিমাবাঈ তাঁর ও চিন্তামণির প্রায় পনের হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি বেঁধে নিলেন। শিশুপুত্রকে কোলে নিলেন এবং আর একজন আত্মীয়া কাকুবাঈ-এর সঙ্গে কেল্লা থেকে বেরোলেন। ঝাঁসীর পথে যেতে যেতে দেখলেন রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে। অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত ও নির্জন পথ দিয়ে চিমাবাঈ মুরলীধর মন্দিরসংলগ্ন বাড়িতে গেলেন। দেখলেন, তাঁর বাড়ি সম্পূর্ণ লুঠ হয়ে গিয়েছে। লুণ্ঠিত এলাকাগুলি পরিত্যাগ করে হত্যাকারী সৈন্যরা অপর এলাকায় চলে গিয়েছিল বলে তাঁদের সঙ্গে কারো দেখা হল না। চিমাবাঈ ভাটে পরিবারের কাছে তাঁর সমস্ত গহনা গাঁটি গচ্ছিত রাখলেন এবং ছেলেকে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। অতি কষ্টে নগর প্রাচীর টপকে শুষ্ক পরিখার ভেতর নেমে মাথা নিচু করে অনেকদূর চলার পর তিনি মাথা তুলে তাকাতে সাহস করলেন। ভাগ্যক্রমে তখন ইংরেজদের ছাউনি ফাঁকা ছিল। শহর থেকে বেরিয়ে চিমাবাঈ, কাকুবাঈ-এর সঙ্গে গুরসরাইয়ে তাঁর পিতার নিকট যাবার জন্য রওনা হলেন। কি করে তাঁরা গুরসরাই পৌঁছলেন সে কথা পরে বলা যাবে।

এই সময় কেল্লাতে অবরুদ্ধ রাণী পরাজয় নিশ্চিত জেনেও হাত পা গুটিয়ে বসেছিলেন না। সন্ধ্যার সময় ঝাঁসী নগরীর বাড়িগুলি ভস্ম করে লেলিহান অগ্নিশিখা ওপরে উঠছে। তাই দেখে দুঃখে ক্ষোভে, মর্মান্তিক বেদনায় তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। তার পরেই হঠাৎ মনে হল, ইংরেজের হাতে ধরা পড়লে তাঁর কপালেও অশেষ লাঞ্ছনা, অসহ্য অপমান আছে। বালক দামোদরকে তিনি

তার পূর্বনাম আনন্দ বলেই ডাকতেন। আনন্দের নিরাপত্তার কথাই সবচেয়ে তাঁর আগে মনে এল। একবার ভাবলেন, কেল্লায় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে লড়তে লড়তেই প্রাণ দিই। তারপর ভাবলেন, এত সহজে হার স্বীকার করব না। কেল্লা ছেড়ে পালাব। কাল্পিতে যোগ দেব রাওসাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর সঙ্গে। তারপর ইংরেজের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রাম করব।

অস্ত্রশস্ত্র বেশি বহন করা সম্ভব নয় বলে, অবশিষ্ট গোলাবারুদে অগ্নি সংযোগ করলেন রাণী। ইংরেজ শিবিরে খবর গেল, রাণী পুড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

কেল্লাতে তখন অবশিষ্ট ছিল বারোশ' আফঘানী ও মকরাণী মুসলমান সওয়ার। তাদের জাতভাইরা রাণীর জন্যে লড়তে লড়তে প্রাণ দিয়েছে ঝাঁসীতে, তারাও শেষ অবধি রাণীর সঙ্গেই থাকবে। রাণী তাঁর সৈন্যদের তিনভাগে ভাগ করলেন। নিজের নেতৃত্বাধীনে চারশ' এবং পিতা মোরোপন্ত তাম্বের অধীনে রাখলেন চারশ' জন। আর তাঁর নিজের সঙ্গে রইলেন দামোদররাও, রামচন্দ্ররাও দেশমুখ, জবাহির সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, গুলমুহাম্মদ, কাশী ও মান্দার। দামোদরের দুধ খাবার জন্য একটি রূপোর গেলাশ নিলেন। সঙ্গে রাখলেন প্রভূত অর্থ। পরিকল্পনা হল ৪ঠা এপ্রিল মাঝরাতে চাঁদ উঠবার আগেই তাঁরা বেরিয়ে যাবেন ভাণ্ডীরের পথে কাল্পির উদ্দেশে।

ঝাঁসী ছেড়ে যাবার পরিকল্পনা স্থির হলে পর লালাভাও বক্সী জানালেন, ঝাঁসীর কেল্লাতে যে দু'জন বন্দী রয়েছেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হবে। ঝাঁসীর কেল্লাতে তখন মালহরি ও সদাশিবরাও এই দুইজন মাত্র বন্দী ছিলেন। রাণী জানালেন, সদাশিবরাও যেমন আছেন তেমনই থাকুন। হাজার হলেও সদাশিব নেবালকর বংশীয়। তিনি রাণীর কোন অনিষ্ট করবেন না। মালহরিকে তখনই গুলী করে মেরে ফেলা হোক। লালাভাও বক্সীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির উত্তরে তিনি বললেন, "মালহরির আমার বা ঝাঁসীর প্রতি কোন আনুগত্য নেই। সুযোগ পেলেই সে আমার আত্মীয়, স্বজন, সহযোগী প্রত্যেককে ইংরেজের কাছে ধরিয়ে দেবে। বহুজনের হিতার্থে তাকে এখনই প্রাণদণ্ড দেওয়া প্রয়োজন।" তাঁর আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হল।

৪ঠা এপ্রিল বিকালে অরছা ও দতিয়া থেকে সৈন্য বাহিনী এল ব্রিটিশের সাহায্যার্থে। নগরীর প্রত্যেকটি দরোজার বাইরে চল্লিশ গজ ব্যবধানে তিন সারি করে পাহারা রাখা হল। রাণী কেল্লায় আছেন। তিনি অথবা অপর কেহ যাতে ঝাঁসী থেকে অলক্ষিতে বেরিয়ে যেতে না পারেন সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

স্থির হল প্রথমে রাণী বেরিয়ে যাবেন। তাঁর দিকে যাতে ইংরেজরা লক্ষ্য করতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে লালাভাও বক্সী পূর্বদিকের বুরুজ থেকে কড়কবিজলী ছুঁড়ে প্রাসাদের নিকটস্থ ইংরেজদের বিপর্যস্ত করবেন।

সেদিন চাঁদ উঠবে মাঝরাতে। চাঁদ ওঠবার কিছু আগে নিঃশব্দে রাণীর সুবিখ্যাত সারংগী ঘোড়ীকে আনা হল কেল্লার উত্তরদিকে। উত্তরদিকে কেল্লার প্রাচীরের নিচে ছিল হাতীশালা ও আস্তাবল। সেইদিককার দরোজা দিয়ে রাণী, তাঁর সহচরী মান্দার, কাশী, রঘুনাথ সিংহ, গুলমুহাম্মদ এবং চারশ' আফঘান সৈন্য নিয়ে নিঃশব্দে বেরোলেন। জনশ্রুতি এই যে, রাণী কেল্লার পশ্চিমদিকে সারংগীকে আনিয়ে খিড়কী থেকে দড়ি দিয়ে ঝুলে নেমে এসেছিলেন। তার পিঠে দামোদররাও বাঁধা ছিলেন। উৎসুক দর্শককে আজও ঝাসীবাসী পশ্চিমদিকে কেল্লার গায়ের পাহাড়টি দেখিয়ে বলে, এখান থেকেই 'বাঈ কুঁদ্ রহে থে, উনকী লেড়কা ভি গোদ মে থা। ঔর ও ঘোড়ী কুঁদ্‌কে আয়া, মর ভি গয়া।' এই কথা একান্তই গল্প। কেননা, সেভাবে একজনের নেমে আসা সম্ভব হলেও চারশ' জনের সেভাবে আসা সম্ভবপর বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, কোনমতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা রাণীর ইচ্ছা ছিল না। ইংরেজরা জানতে পারলে তাঁর সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যেত। দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না বলেই তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দামোদররাও-এর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণরাও তাঁর পিতার কাছে (দামোদরের বয়স তখন দশ বছর) কেল্লা ত্যাগের বিষয় যেমন শুনেছিলেন সেই অনুযায়ী দামোদরের বিষয় লিখিত হল :

রাণী দামোদরকে নিজের ঘোড়ার পিঠে বেঁধে নিলেন। সমস্ত ঝাঁসী শহর তখন জ্বলছে। মৃত্যুহাহাকার ও অগ্নিতাণ্ডবের

মধ্যে ইংরেজ সৈন্যরা মূর্তিমান যমদূতের মতো বিচরমান। তাদের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেলেন রাণী। পশ্চিমে ভাণ্ডীর ফটকে অপেক্ষা করছিল জনৈক কোরি। সে ফটক খুলে দিল। রাণী বেরিয়ে এলেন। সামনে পর পর তিন সারি ইংরেজ প্রহরা। অরছার কিছু সৈন্যও সেখানে ছিল। তারা জানতে চাইল—কে যায়? অকম্পিত গলায় বুন্দেলখণ্ডী ভাষায় রাণী জবাব দিলেন, আমরা অরছা থেকে আসছি—অরছার ফৌজ! তাঁর কণ্ঠস্বর ঈষৎ ভারী ছিল।

তারপর কোনরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে ধীরে ধীরে তাঁরা বেরিয়ে গেলেন। ইংরেজ ছাউনির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে স্বাভাবিক-ভাবে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে গেলেন, যাতে তাঁদের প্রতি কিছু মাত্র সন্দেহের উদ্রেক না হয়। যাবার সময়ে তাঁদের তিনসারি ইংরেজ প্রহরা ভেদ করে যেতে হল। নিরাপদ জায়গায় এসে ঝাঁসী-কাল্পি রোড ধরে ছুটে চললেন রাণী। সঙ্গে চলল তাঁর পরম অনুগত আফঘানী সওয়াররা।

মোরোপন্ত তাম্বে ও লালাভাও বক্সী বেরোলেন কেল্লা ছেড়ে, কিন্তু ততক্ষণ চাঁদ উঠে পড়েছে। কাজেই তাঁদের পক্ষে আর বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। ও-দিকে জবাহির সিং চারশ' সৈন্য নিয়ে ঝাঁসী নগরীর পথে আটক পড়লেন এবং ইতস্ততঃ যুদ্ধ করতে করতে তিনি সমুদয় সৈন্যসহ নিহত হলেন।

পাঁচই এপ্রিল সকালে মোরোপন্ত তাম্বে ও লালাভাও বক্সী কেল্লা থেকে পশ্চিমে একটি নাতিউচ্চ টিলা অধিকার করলেন। লালাভাও বক্সীর পত্নী বক্সীনজ্ ২৮শে মার্চ কেল্লাতে ইংরেজের গোলার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। লালাভাও বক্সীর বাড়ি যদিও আজ ভিন্ন লোকের অধিকারে, কিন্তু বক্সীর হাবেলী নামে তাহা বিখ্যাত হয়ে আছে।

লালাভাও এবং মোরোপন্তের নেতৃত্বে চারশ' সৈন্য সেই টিলাতে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে, চতুর্দিকে তাঁদের ইংরেজ সৈন্য। বুঝলেন এই যুদ্ধই সম্ভবতঃ শেষ যুদ্ধ। ইতিমধ্যে মেজর গল্ (Gall) তাঁদের ঘিরে ফেলেছেন। কিন্তু ভারতীয়দের কাছে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি কাতরভাবে হিউরোজের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। অবশেষে ছয়শ' অশ্বারোহী ও পদাতিক দিয়ে ঘিরে ফেলে ভয়াবহ

সংগ্রামের পর ইংরেজের পক্ষে সেই পাহাড় অধিকার করা সম্ভব হল। মোরোপন্ত তাম্বে ও লালাভাও বক্সী পালাতে সক্ষম হলেন। মোরোপন্ত তাম্বের পায়ে চোট লেগেছিল। পাহাড় অধিকার করার পর ইংরেজরা একজন ভারতীয়কেও জীবিত দেখতে পেলেন না। অবশ্য যে কুড়িজন ভারতীয়কে তাঁরা অর্ধমৃত অবস্থায় পেয়েছিলেন তাদের বারুদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হল।

মোরোপন্ত ও লালাভাও ঘোড়া চড়ে কাল্পি পালিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু মোরোপন্তের ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে ওঠবার ফলে তাঁরা দতিয়া রাজ্যের আকোলা গ্রামে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হলেন। সেই সময় রবার্ট হ্যামিল্টন দতিয়াতে গিয়েছিলেন। দতিয়ার পক্ষ থেকে ইংরেজ-আনুগত্য দেখাবার একটি চমৎকার সুযোগ মিলল। আহত মোরোপন্ত ও শুশ্রূষাপরায়ণ লালাভাও বক্সীকে ধরিয়ে দিল আকোলা গ্রামের তালুকদার। দতিয়ার দরবারে রবার্ট হ্যামিল্টনকে সেই দু'জন মূল্যবান বন্দী উপহার দেওয়া হল।

মোরোপন্ত ও লালাভাও বক্সীকে বন্দী করে আনা হল ঝাঁসীতে। ততদিনে ঝাঁসীতে বিচার নামক একটি বিরাট প্রহসন নিত্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিত্যই পঞ্চাশ, ষাট, একশ' করে লোককে ধরে আনা হয়। বড় বড় অফিসারদের সামনে তাদের বিচার হয় এবং রাণীকে সাহায্যের অপরাধে তাদের ফাঁসী হয়।

মোরোপন্তকেও বিচারসভায় আনা হল। মোরোপন্ত সংক্ষেপে বললেন—১৮৫৭ সালের জুন মাসে আমি ঝাঁসীতে উপস্থিত ছিলাম। কেল্লাতে অবরুদ্ধ ইংরেজদের আমি কোন সাহায্য করিনি। ইংরেজদের হত্যার সময়ে আমি রাণীর সঙ্গে প্রাসাদে ছিলাম। ৫ই এপ্রিল ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত আমি একদিনের জন্যও ঝাঁসী ত্যাগ করিনি। লালাভাও বক্সী একটি কথারও জবাব দিলেন না। দু'জনেরই ফাঁসীর হুকুম হল। ১৯শে এপ্রিল জোকানবাগ উদ্যানে তাঁদের ফাঁসী দেওয়া হল।

৪ঠা এপ্রিল রাত দুটোর সময় কেল্লার নীরবতা দেখে হিউরোজ চিন্তিত হলেন। তারপর আসল খবর জানতে পেরে তাঁর চিন্তা চরম ক্ষোভ ও বিরক্তিতে পরিণত হল। এ পর্যন্ত তাঁর অফিসাররা তাঁর মেজাজ দেখেননি। হিউরোজ প্রত্যেককে অপদার্থ ও অকর্মণ্য বলে

অভিযোগ করলেন। তাঁর এতজন সুযোগ্য কর্মচারী থাকতে ভাণ্ডীর ফটক দিয়ে চারশ' সৈন্য নিয়ে রাণী বেরিয়ে গিয়েছেন অথচ কেউ জানতে পারেননি! রাণীর পলায়নের খবর হিউরোজকে দিয়েছিল একটি মরণোন্মুখ সওয়ার। সে সগর্বে বলেছিল, "আমাকে মারলে বটে সাহেব কিন্তু বাঈসাহেবকে তোমরা ধরতে পারলে না।"

ক্রোধোন্মত্ত হিউরোজ টেলিগ্রাফ হিলের অবজারভেটরী পোস্ট (Ovservatory Post) থেকেও খবর পেলেন যে, একদল ভারতীয়কে উত্তর-পূর্বদিকে পালাতে দেখা গিয়েছে।

হিউরোজ তৎক্ষণাৎ রাণীর অনুসরণে মেজর Forbes ও ক্যাপ্টেন Robinson-এর নেতৃত্বে তিনটি অশ্বারোহীদল ও কামান পাঠালেন।

রাণী সমস্তরাত একভাবে চলে ভোর রাতে ঝাঁসী থেকে একশ' মাইল দূরে ভাণ্ডীরে পৌঁছলেন। ৫ই এপ্রিল ছিল শুক্রবার। রাণী সচরাচর সেদিন উপবাস করতেন। ঝাঁসী ত্যাগ করে তাঁর মন এতই ভারাক্রান্ত হয়েছিল যে, ভাণ্ডীরে পৌঁছে সঙ্গীদের বারবার অনুরোধেও তিনি কিছু খেতে রাজী হলেন না। দামোদররাও ক্ষুধার্ত, সঙ্গীরাও পরিশ্রান্ত। রাণী ভাণ্ডীরের সর্দারকে ডেকে দামোদরের জন্য দুধ, কিছু খাবার এবং তাঁর অনুচরদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে বললেন। জলযোগ তখনও শেষ হয়নি এমন সময় জানা গেল দ্রুতগতিতে তিনটি অশ্বারোহী দল অগ্রসর হচ্ছে ভাণ্ডীরের দিকে। সঙ্গে তাদের কামানও রয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে সকলে প্রস্তুত হল। দামোদররাওকে জনৈক সওয়ার তুলে নিলেন। এই সময় রাণীকে তাঁর বিশ্বস্ত আফঘান সেনা দলের সর্দার জানালেন যে, তাঁরা এগিয়ে গিয়ে মেজর রবিন্সনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। আটকে ফেলবেন ইংরেজ সৈন্যদের বৃহত্তর অংশটিকে। তাতে রাণীর পক্ষে ভাণ্ডীর হতে কাল্পি যাবার সুবিধা হবে।

ভাণ্ডীরের উপকণ্ঠে আফঘান সৈন্যরা মেজর রবিন্সনকে প্রতিরোধ করলেন। রাণী, মান্দার, কাশী, রঘুনাথ সিংহ ও গুলমুহাম্মদ সমভিব্যাহারে ভাণ্ডীর পরিত্যাগ করলেন। তাঁর সঙ্গে আরো দশজন আফঘান ছিলেন। আফঘান সৈন্যদের আনুগত্য ব্যতীত সেদিন রাণীর পক্ষে কাল্পি যাওয়া দুরূহ ছিল।

লেফটেনান্ট ডাওকর (Dowker) মেজর ফর্বসের দলে ছিলেন।

তিনি দু'শ' অশ্বারোহী নিয়ে রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ভাণ্ডীর ছাড়িয়ে কাল্পি রোডের ওপর তাঁর সঙ্গে রাণীর যুদ্ধ হল। সেইসময় যা ঘটেছিল সে সম্বন্ধে হিউরোজ এবং ঐতিহাসিকগণ অল্প কথায় আসল ঘটনা এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু সামরিক অফিসারদের জন্য Revolt In Central India নামে যে একখানি বই লেখা হয়েছিল, সেই বই-এর লেখককে Dowker নিজে বলেছিলেন যে, ভাণ্ডীরে প্রবেশের পথে আফঘানরা বিভিন্ন দল গঠন করে জায়গায় জায়গায় ইংরেজদের বাধা দেন। মেজর Forbs ও মেজর Robinson সেখানে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং Dowker নিজে দুইশত অশ্বারোহী নিয়ে ভাণ্ডীরে প্রবেশ করেন। তাঁবুতে খাদ্য দ্রব্য এমনভাবে পড়ে ছিল যে, দেখে মনে হয় যেন সেইমাত্র খেতে খেতে উঠে গিয়েছেন রাণী। দেখা গেল রাণী ভাণ্ডীর ছাড়িয়ে দ্রুতবেগে চলেছেন, সঙ্গে চারজন পুরুষ (মান্দার ও কাশী পুরুষবেশে ছিলেন), পেছনে দশজন আফঘান। Dowker-এর সঙ্গে সেই ছোট দলটির ভয়াবহ যুদ্ধ হল। Dowker-এর সৈন্যরা কোনমতেই সেই দশজন আফঘানকে তাড়িয়ে অগ্রসর হতে পারল না। Dowker-এর সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করলেন রাণী স্বয়ং। তলোয়ার দিয়ে রাণী Dowker-এর কোমরে আঘাত করেন। কিন্তু Dowker এর কোমরে চামড়ার খাপে রিভলবার থাকার দরুন শেষ পর্যন্ত তিনি বেঁচে যান। উপরোক্ত বই-এর লেখক বলেছেন—"Brigadier General Sir H. Dowker, K. C. B. told the author that he would have been cut into two had not that stroke been parried by the revolver that he carried on his hip."

Dowker ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। সেই সুযোগে রাণী পালিয়ে গেলেন। তাঁর চারশ' আফঘান সৈন্যের মধ্যে একশ' পঞ্চাশজন ছাড়া সকলেই ভাণ্ডীরের যুদ্ধে নিহত হলেন।

রাণী চলে গেলেন কাল্পির পথে। আহত Dowker-কে নিয়ে ইংরেজ সৈন্য ও অফিসাররা ফিরে এলেন ঝাঁসীতে।

আপন বিফলতায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হিউরোজ আদেশ দিলেন, ইংরেজের কর্তব্য শৈথিল্যের নিদর্শন ঐ ভাণ্ডীর দ্বার অবিলম্বে বন্ধ

করে দেওয়া হোক। ৬ই এপ্রিল ভাণ্ডীর দরোজা বন্ধ করে লোহার গজাল দিয়ে এঁটে দেওয়া হল। ১৮৫৮ সাল থেকে পঁচাত্তর বছর অবধি সেই দরোজা বন্ধ ছিল। ১৯৩৩ সালে ভাণ্ডীর দরোজা পুনঃ খুলে দেওয়া হয়।

ভাণ্ডীর দরোজা বন্ধ করে ইউরোজ তারপর অভিশপ্ত নগরী ঝাঁসীতে নির্বিচার নরহত্যা চালাতে হুকুম দিলেন। তখন সেখানে যা শুরু হল, তা হিউরোজের ভাষাতেই বলা যাক :

> 'প্রাসাদ অধিকৃত হবার পর থেকে বিদ্রোহীরা শহর ছেড়ে চলে যেতে শুরু করল। নগর অবরোধের সাফল্য এই একটি কথাতেই বোঝা যায় যে, একজনকেও জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। নগরীর আশেপাশের বন, বাগান, রাস্তা, বিদ্রোহীদের শবদেহে পরিপূর্ণ হল। রাণীর পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই সকলের ঝাঁসী ত্যাগের তাড়াহুড়ো পড়ে গেল। পাঁচই এপ্রিল ভোরে আমি সমস্ত নগরী বেষ্টন করে দুই সারি সেনা সন্নিবেশিত করেছিলাম।
>
> বিদ্রোহী সৈন্যরা জাতিতে সাধারণতঃ আফঘান ও পাঠান। নিহতদের সংখ্যা সম্বন্ধে ছোট্ট একটু উদাহরণ দেওয়া যাক। 14th Light Dragoon, ৫ই এপ্রিল দুপুরে একসঙ্গে দু'শ' জনকে হত্যা করেছে।
>
> চল্লিশজন আফঘান শুধু মাত্র তলোয়ার নিয়ে একটি বাড়ি অধিকার করে তার গলি ও চোরাঘরে লুকিয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন Hare ও ক্যাপ্টেন Sinclair, Hyderabad Cavalry নিয়ে তাদের আক্রমণ করেন। তারা ক্যাপ্টেন Sinclair-কে হত্যা করে। ক্যাপ্টেন Hare-কে সম্পূর্ণ পরাজিত করে। অবশেষে মেজর Orr দশটি কামান এনে বাড়িটি গোলাদ্বারা বিধ্বস্ত করে ফেলেন। সেই চল্লিশজন আফঘান অসাধারণ জেদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়তে লড়তে প্রাণ দেয়। আফঘানরা সর্বত্রই মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সাহস ও কৌশলের সঙ্গে লড়েছে।'

ঝাঁসীতে সেইসময় উপস্থিত ছিলেন কেশবভাস্কর তাম্বে। তিনি নেবালকরদের পারোলাস্থিত জায়গীরের গঙ্গাধররাও-এর অংশের তত্ত্বাবধায়ক। কেশবভাস্কর তাম্বের পৌত্র অধুনা বরোদা নিবাসী রাজরত্ন শ্রীগঙ্গাধরমাধব তাম্বের কাছ থেকে তাঁর প্রপিতামহের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণটি পাওয়া গিয়েছে :

কেশবভাস্কর তাম্বে ছ'মাস আগেই ঝাঁসীতে এসেছিলেন।

চতুঃপার্শ্বের অনিশ্চিত অবস্থার জন্য তিনি সুদূর খান্দেশে ফিরে যেতে পারেননি।" রাজপ্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দেবার ফলে চারতলাটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছিল। আশেপাশে যে সব অসংখ্য ঘর ও অলিগলি ছিল, তারই মধ্যে একটি ছোট্ট শৌচাগারে তিনি ৭ঠা এপ্রিল থেকে সাতদিন লুকিয়ে ছিলেন।

রাণী প্রাসাদ ত্যাগ করে কেল্লায় যাবার আগে সমস্ত অন্তঃপুরিকাদের ডেকে প্রাসাদ ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে বললেন। সরে যাবার জায়গা অবশ্য বিশেষ ছিল না, তাই অনেক মেয়ে তখনও প্রাসাদেই ছিলেন।

হিউরোজের 'বিজন' ঘোষণা করবার সময় ঝাঁসীতে উপস্থিত ছিলেন পরিব্রাজক বিষ্ণুভট্ট গোড্‌সে। তাঁর লেখাতে যে-বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে সেই ভয়ঙ্কর হত্যালীলার সত্যরূপ প্রকট হয়েছে। গোড্‌সে বলেছেন: সমস্ত শহরকে প্রেতভূমি ও মহাশ্মশান বলে বোধ হল। জ্বলন্ত বাড়িগুলি থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উঠে রাত্রির আকাশ ভয়াল করে তুলল। আগুন ও বাতাসের কান্না ছাপিয়ে আর্ত নরনারীর ক্রন্দনের রোল উঠল। প্রিয়জনের মৃতদেহের পাশে বসে রমণী কাঁদছেন, আর তাঁর সামনে বেয়নেট ঠুকে গোরা সিপাহী অলঙ্কার খুলে দিতে বলছে। দীনদরিদ্র, ধনীর ঘরনী, শ্রেষ্ঠীর শিশুপুত্র, সবাই একসঙ্গে একমুষ্টি অন্ন চেয়ে কাতর কণ্ঠে কেঁদে কেঁদে ফিরছে। কোথাও বালকপুত্রের নিহত দেহ নিয়ে মা শোকে বিহ্বল। কোথাও পিতার দেহের পাশে বসে শিশুপুত্র ছোট ছোট হাতে পিতাকে আঘাত করে ডাকছে। হালোয়াইপুরার জ্বলন্ত অট্টালিকাগুলি দেখে সিপাহীদের আপসোসের আর সীমা নেই। তাদের আপসোস আগুনে ধ্বংস হবার আগে তারা কেন সমস্ত লুঠ করে নিলে না। দারুণ গ্রীষ্মে শুকনো কাঠের বরগাগুলি দাউ দাউ করে জ্বলছে। বাতাসে উড়ছে ছাই, আর গলিত শবদেহের তীব্র গন্ধ।

বিষ্ণুভট্ট ও কেশবরাওকে দেখে যখন ইংরেজ সৈন্য বন্দুক তুলল, তখন বিষ্ণুভট্টের মনে সহসা যে-বুদ্ধির উদয় হল, তা একমাত্র ভগবৎ কৃপায়ই বলা চলে। "ত্যা সময়ে পরমেশ্বরানেং চ আম্হাস বুদ্ধি দিলী য়ান্ত সংশয় নাহী।" তিনি

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে করুণ কণ্ঠে হিন্দীতে বললেন—"হে সাহেব, আমরা দরিদ্র পিতাপুত্র। আমাদের বাস বোম্বাইয়ে। যাত্রাপথে এখানে এসে পড়েছি। আমাদের মের না।" গোরা সিপাহীরা বলল—"তবে টাকা দাও!" তাঁর কাছে যে আড়াইশ' টাকা ছিল, তাই দিয়ে তিনি মুক্তি পেলেন। পথে দেখলেন ইংরেজরা প্রাণ ভয়ে ভীত দরিদ্র মানুষদের টেনে টেনে বের করে গুলী করছে। তৃষ্ণার্ত হয়ে বহু মানুষ মারা গিয়েছে। জলাধার থেকে জল খাবার সময়ে ইংরেজরা তাদের ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখিয়েছে। বৈশাখের দুরন্ত গ্রীষ্মে তৃষ্ণার্ত বিষ্ণুভট্ট পানীয় জল সংগ্রহ করতে বিশেষ বেগ পেলেন।

নিহত নরনারী বালকবালিকার অন্তিম সংকার হওয়া তখন সম্ভব নয়। করকরে নামক কোন ব্রাহ্মণ ও তাঁর পুত্রের সংকার করবার জন্য করকরের পত্নী বিষ্ণুভট্টকে অনুরোধ করলেন। যথাবিধি প্রেতশুদ্ধি কার্য করে স্বগৃহ প্রাঙ্গণে খাট, আলমারি, দরজার কপাট ও জানলা জ্বালিয়ে মৃতের সংকার হল। তখন পথে পথে মৃতদেহ। সংকার বা অশৌচ, এ সব কথা তখন অর্থহীন।

তিনদিন ধরে ইংরেজরা শহরের সোনা, রূপো, পেতল, তামা সব নিশ্চিহ্ন করে লুঠ করল। রাজপ্রাসাদ থেকে প্রথমে সমস্ত মূল্যবান জিনিষপত্র, তারপর তাঁবু, গদী, শতরঞ্জি, তাকিয়া, গালিচা প্রভৃতি লুঠ হল। মহালক্ষ্মী মন্দির লুঠ করে দেবীর অঙ্গ থেকে অলঙ্কার খুলে নিল গোরা সিপাহীরা।

আটদিন ধরে ভয়ঙ্কর হত্যালীলা চলবার পর নগরীর পথঘাট যখন শবদেহে পূর্ণ তখন হিউরোজ দতিয়া এবং অরছা থেকে ভাঙ্গী আনিয়ে পথঘাট পরিষ্কার করালেন।

হিউরোজ "বিজন" ঘোষণা করবার সঙ্গে সঙ্গে যে তাণ্ডবলীলা শুরু হল তাতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ধর্মহানির ভয়ে মেয়েরা শিশুদের কোলে নিয়ে প্রাসাদের কূয়োতে লাফিয়ে পড়তে বাধ্য হলেন। প্রাসাদে সাত আটটি বড় কূয়ো ছিল। ঘোড়া স্নান করাবার জন্য যে বিশাল কূয়োটি ছিল, তার প্রশস্ত পরিসরের জন্য তাকে কূয়ো না বলে সবাই গজতালাও বলত। যখন প্রাসাদে আগুন লাগল তখন আতঙ্কিতা মহিলারা কাতর আর্তনাদ করতে

করতে গজ্‌তালাও-এ লাফিয়ে পড়লেন। কেশবভাস্করের সামনে কতজন যে এইভাবে প্রাণ হারালেন তা বলা যায় না।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা বলেছেন যে, ইংরেজ বা দেশী সৈন্যরা মেয়েদের গায়ে হাত দেয়নি। কিন্তু কেশবভাস্কর বলছেন, সৈন্যরা মেয়েদের হাত, কান, গলা, নাক থেকে গহনা ছিঁড়ে নিচ্ছিল এবং বেয়নেট উঁচিয়ে তাড়া করছিল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে গজ্‌তালাও শবদেহে পূর্ণ হয়ে গেল এবং তার ওপর ধ্বসে পড়ল প্রাসাদের কড়িবরগা ইট পাথরের একটি বিশাল জ্বলন্ত স্তূপ। ইংরেজরা মেয়েদের সম্মান রক্ষা করেছে বলে গর্ব করে থাকে। ঝাঁসী ও অন্যত্র তারা যে মেয়ে ও শিশুদের যথেচ্ছ হত্যা করেছিল, তার প্রমাণ আছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাগজে। ইতিহাসে সে কথা কিন্তু তারা লেখেনি।

বারো বছর থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স অবধি সমস্ত পুরুষ ও বালকদের প্রত্যহ হাজারে হাজারে ধরে এনে রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে দাঁড় করিয়ে মাথা কেটে ফেলা হত।

তখনকার দিনে ব্যাঙ্কে টাকা রাখবার নিয়ম ছিল না। প্রত্যেক বাড়িতেই গৃহস্থরা মূল্যবান অলঙ্কার ও অর্থ দেয়ালে চোরকুঠরি বানিয়ে পুঁতে রাখতেন। ৭ই এপ্রিল পর্যন্ত পাঁচদিন ধরে অপ্রতিহত হত্যাকাণ্ড চালাবার পর বাড়িঘর ভেঙে সেই সব মূল্যবান অলঙ্কারের খোঁজ করতে লাগল সৈন্যরা।

ঝাঁসী শহরে রাণীর সমস্ত সৈন্য এবং নাগরিকরাও বহুলাংশে নিহত হল। সমস্ত নগরীর পথে কর্দমাক্ত রক্ত জমে রইল। শকুনি উড়তে লাগল সমৃদ্ধ নগরীর আকাশে। হিউরোজের কঠোর নিষেধ ছিল কোনমতেই যেন ভারতীয়েরা তাঁদের শবদেহের সৎকার করতে না পারেন। ৭ই এপ্রিলের পর সমস্ত নগরী যখন পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ হল, গলিত শবদেহের লোভে দিনে শৃগাল ও শকুনি বিচরণ করতে লাগল, তখন হিউরোজ আদেশ দিলেন, এবার শবদেহের সৎকার করা যেতে পারে। ইংরেজপক্ষের দেশীয় সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনরা মৃতদেহ সৎকার করতে লাগলেন। বহুক্ষেত্রেই দেহগুলি গলিত ও নষ্ট

হয়ে গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে মুখাগ্নি মাত্র করে দেহ সরিয়ে ফেলা হল। লছমীতাল হ্রদের উত্তরাংশের বিস্তীর্ণ চড়াতে মৃতদেহগুলি ভারে ভারে বহন করে নিয়ে চিতা জ্বালান হল।

তারপর শুরু হল লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহের প্রকাশ্য নীলাম। ইতিমধ্যে হিউরোজ ও রবার্ট হ্যামিল্টনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আশপাশের মিত্ররাজ্যগুলির প্রতিভূরা। এই নীলামে বিক্রি হয়ে গেল ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদের বহুমূল্য আসবাবপত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজস, বাসন, সুবিখ্যাত তাঞ্জাম, রূপার দোলনা। গঙ্গাধররাও-এর প্রিয় হাতী সিদ্ধবক্সকে কিনলেন ইন্দোরের বিখ্যাত ধনী সর্দার বোলিয়া। সিদ্ধবক্সের জীবনের সঙ্গে ঝাঁসীর স্মৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ঝাঁসী থেকে ইন্দোরে যাবার পথে সিদ্ধবক্স আহার ও পানীয় পরিত্যাগ করল। পথেই মৃত্যু হয়েছিল তার।

সেই সময় রবার্ট হ্যামিল্টন শুরু করেছিলেন তাঁর বিচার।

ফাঁসীমঞ্চে ভারতীয় যোদ্ধা।

ঝাঁসীর আশপাশের গ্রামবাসীরাও যে রাণীকে প্রতিরোধ সংগ্রামে সাহায্য করেছিল, তা হ্যামিল্টন ও হিউরোজ ভাল করেই জানতেন। নিত্য তাদের বন্দী করা হত।

নিত্য তাদের ধরে আনা হত ঝাঁসীর কেল্লার বাইরের মাঠে। বিচারের পর ফাঁসী হত তাদের। ফাঁসী দিতে দিতে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল ঘাতকদের। দিবারাত্রি বন্দীরা আসছে, বিচার হচ্ছে এবং হুকুম আসছে---লট্‌কাও, লট্‌কাও!

এই লট্‌কাও লট্‌কাও ধ্বনি শুনে শুনে বহুজনের স্নায়বিক দৌর্বল্য এসেছিল। রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখে তাঁরা চমকে উঠত আর আর্তনাদ করত—লট্‌কাও, লট্‌কাও!

ঝাঁসীতে সবশুদ্ধ কত লোক নিহত হয়েছিল সে সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন হিসাব। হিউরোজ, টমাস লো, ফরেস্ট, সিল্‌ভেস্টার ও অন্যান্য ঐতিহাসিকদের মতে ঝাঁসীতে কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

কিন্তু সে সংখ্যার যাথার্থ্য নিরূপণ করবার উপায় কি? যদি ধরে নেওয়া যায় যুদ্ধের প্রারম্ভে ঝাঁসীতে সর্বসাকুল্যে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য এবং ষাট হাজার বাসিন্দা ছিল, তাহলে একথা কোনমতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে ঝাঁসীতে মাত্র পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়েছিল। রাণীর সঙ্গে পালাতে সক্ষম হয়েছিল মাত্র চারশ' জন সওয়ার। হিউরোজ নিজেই বলেছেন, ঝাঁসী অধিকৃত হবার পর অতি নগণ্য সংখ্যা ছাড়া কেউই ঝাঁসী ত্যাগে সক্ষম হয়নি। সমস্ত নগরীতে সর্বদাই কড়া পাহারা ছিল। শুধু ঝাঁসী নয়, ঝাঁসীর আশে পাশের সমস্ত রাস্তা, গ্রাম, জঙ্গল ও বাগানের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছিল। যতজন পালাতে চেষ্টা করেছিল তারা সকলেই নিহত হয়েছিল। আর ঝাঁসী ছেড়ে পালাতে সক্ষম হলেও একটু দূরে গিয়েই ধরা পড়েছিল তারা। একান্ত নিরপেক্ষ নগরবাসী ছাড়া আর কেউই ঝাঁসী ছেড়ে নিরাপদে পালাতে পারেনি। কাজেই মনে হয় ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে ঝাঁসীতে সবসুদ্ধ কমপক্ষে দশ থেকে এগার হাজার লোক নিহত হয়েছিল।

১৮৫৭ সালের জুন মাসে নিহত ইংরেজ নরনারীর সংখ্যা ছিল একশ'র কম। সেই শোচনীয় ঘটনার জন্য ঝাঁসীকে হিউরোজ বলেছিলেন Bloody City. ইংরেজদের জীবন ১৮৫৮ সালে যে

কতখানি মূল্যবান বিবেচনা করা হত, তা দুইপক্ষের নিহতদের আনুপাতিক সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়। সবশুদ্ধ ছেষট্টিজন ইংরেজ নরনারী ও শিশুর হত্যার জন্য হাজার হাজার ভারতীয়কে পাল্টা হত্যা করলন হিউরোজ। বুন্দেলখণ্ডের সমৃদ্ধতম নগরী ঝাঁসীকে পরিণত করলেন শ্মশানে।

৩রা থেকে ৫ই এপ্রিলের মধ্যে ঝাসীতে ইংরেজ পক্ষে ৫৮ জন নিহত ও ১৩১ জন গুরুতররূপে আহত হয়েছিল।

অকথ্য অত্যাচার দ্বারা জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করাই ছিল হিউরোজের উদ্দেশ্য। কোথাও কোথাও তিনি সফল হয়েছিলেন, আবার অনেক জায়গায় সমস্ত অত্যাচার ও নিপীড়নকে তুচ্ছ করে জনসাধারণ নির্ভীকভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল। তিনি এ কথাও সে দিন বুঝেছিলেন যে, তরবারির শাসনে আনুগত্য অর্জন করা যায় না।

ঝলকারি কোরিনের কথা আজও ঝাসী ও বুন্দেলখণ্ডের ঘরে ঘরে শোনা যায়। পুরণ কোরির স্ত্রী বুন্দেলখণ্ডী কিষাণ ঘরের মেয়ে ঝলকারি শ্যামবর্ণা ও সুশ্রী ছিল। যুদ্ধের সময়ে রাণীর ব্যক্তিগত সাহচর্যে এসে সে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ঝাসী যখন ইংরেজের হাতে গেল, ঝলকারি রাণীর পশ্চাদনুসরণ থেকে ইংরেজদের নিবৃত্ত করবার জন্য মহারাষ্ট্রীয় রমণীর পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে তলোয়ার হাতে হিউরোজের সঙ্গে দেখা করতে যায়। বলে, আমিই ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ। আমাকে ধরলে যদি তোমরা ঝাঁসী নগরীর বাসিন্দাদের ক্ষমা কর, তাই আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। কিন্তু গোপালরাও সিরস্তাদার তাঁকে দেখে জানাল, এ রাণী নয়, ঝলকারি কোরিন। হিউরোজ জানালেন, তাকে এখনি প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। ঝলকারি জানাল—মার দৈ, মৈঁ কা মরবে খোঁ ডরাত হোঁ ? জৈসে ইত্তে সিপাই মর্ ভৈসে এক মৈঁ সই।

স্তম্ভিত Steuart বললেন—She is mad. মেয়েটি পাগল।

হিউরোজ বললেন—"If one percent of Indian women become as mad as this girl is, we will have to leave all that we have in this country."

"শতকরা একজন ভারতীয় মেয়েও যদি এই মেয়েটির মতো

পাগল হয়ে ওঠে, তা হলে এ দেশে আমাদের যা কিছু আছে, সব ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

হিউরোজ ঝলকারিকে অগত্যা ছেড়ে দিলেন।

এমনি ধারা আরও একক বীরত্বে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে মৌরাণীপুরের তহশীলদার আনন্দরাও-এর দৃষ্টান্ত। রাণী তখন পরাজিত হয়ে ঝাঁসী ছেড়ে চলে গিয়েছেন কাল্পিতে। অরছা রাজ্যের টিকমগড় হয়ে ইংরেজ ফৌজ আসছে ঝাঁসীর পথে। মৌরাণীপুরে আনন্দরাও রুখে দাঁড়ালেন। বললেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, বিনা বাধায় ইংরেজ ফৌজকে যেতে দেব না ঝাঁসীতে।

বিস্মিত সেনাপতি যখন জানতে চাইলেন, ব্যর্থ সংগ্রামের জন্য যুদ্ধ করবার অর্থ কি? আনন্দরাও সগর্বে জবাব দিলেন—"রাণী হার গেই হোউনী, আনন্দরাও তো জীন্দা হ্যায়!"

ত্রিশজন সৈন্য নিয়ে মৌরাণীপুরে মাটির কেল্লায় লড়লেন আনন্দরাও। ইংরেজের গুলীতে প্রাণ দিলেন।

এই সমস্ত প্রতিরোধকে যিনি উদ্‌বুদ্ধ করেছেন সেই রাণী ততদিনে কাল্পিতে যোগ দিয়েছেন অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে। তাঁকে পরাজিত করবার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে হিউরোজ ঝাঁসীর কেল্লায় চড়ালেন ইউনিয়ন জ্যাক। জোকানবাগ উদ্যানে নিহত স্বদেশবাসীদের উদ্দেশে প্রার্থনা করে জানালেন তাঁদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে। মাথাপিছু একজন ইংরেজের জীবনের বিনিময়ে নিহত করা হয়েছে হাজার ভারতীয়। ঝাঁসীর কেল্লায় ব্রিটিশ পতাকা উড়ছে। ঝাঁসী নগরী শ্মশানে পরিণত, মহালক্ষ্মীর মন্দির লুণ্ঠিত, লছমীতাল হ্রদের তীরে শবদেহের স্তূপে শৃগাল-শকুনির ভোজ জমেছে। অতএব হে অশান্ত আত্মারা, তোমরা আজ শান্ত হও।

ফাঁসীর দড়ি গলায় পরতে পরতে তখন এক বৃদ্ধ কৃষাণ চেঁচিয়ে বলল—

'মুল্‌ক শয়তানকা, অম্মল শয়তানকা, ঝাঁসী লক্ষ্মীবাঈকা!'

জোকানবাগে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করলেন হিউরোজ। প্রার্থনায় ব্যাঘাত হল।

উনিশ

ঝাঁসী থেকে কাল্পি একশ' দুই মাইল রাস্তা। ভাণ্ডীর ছেড়ে রাণী কাল্পি পৌঁছলেন রাত দুটোর সময়ে। সেদিন পাঁচই এপ্রিল। বেতোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁতিয়া টোপীও চিরখারী ঘুরে সন্ধ্যায় কাল্পি এসে পৌঁছলেন।

নানাসাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেব উত্তর ভারতের বাগী সিপাহীদের নিয়ে কাল্পিতে অপেক্ষা করছিলেন। রাণীর আগমন সংবাদ পেয়ে রাওসাহেব তৎক্ষণাৎ তাঁর বিশ্রাম ও আরামের সুবন্দোবস্ত করলেন। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসে রাণী সর্বাগ্রে তাঁর ঘোড়ার আরাম ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। মান্দার ও কাশী সমভিব্যাহারে তিনি রইলেন দামোদররাওকে নিয়ে একটি তাঁবুতে। তাঁর অবশিষ্ট আফঘান সৈন্যদের তাঁবু দেওয়া হল এবং রঘুনাথ সিংহ, গুলমুহাম্মদ, রামচন্দ্ররাও দেশমুখ প্রভৃতি সঙ্গী সর্দারদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হল।

ঝাঁসীকে নিরাশ্রয় করে ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে এসে রাণীর মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। মোরোপন্ত, লালাভাও, জবাহির সিং তাঁদের ভাগ্যে কি ঘটল, তাও জানতে পারলেন না। চিমাবাঈ কি ভাবে আত্মরক্ষা করে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবেন, তাও জানা যায়নি। ঝাঁসীর নরনারী বালকবালিকাদের ভাগ্যে কি হয়েছে তাও তাঁর অজানা। কাজেই বিশ্রাম বা আহার তাঁর কাছে একান্ত অরুচিকর বলে মনে হল। সমস্ত রাত তিনি নিদ্রাহীন চোখে ভাবতে লাগলেন, এখন কি কর্তব্য।

তাঁর সৈন্য নেই, তাঁর অর্থবল নেই, অতএব রাওসাহেব ও তাঁতিয়া টোপীর শরণার্থী তাঁকে হতেই হবে। স্বভাবতঃ অভিমানিনী রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর কাছে সে-প্রসঙ্গ একান্ত অপমানজনক বলে বোধ হল। চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বেশি পার্থক্য রাখা তাঁর কাছে চিরদিনই অপ্রীতিকর। কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ধারণা রেখে

কাজ করলে সফল হওয়া যায় না, তা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁতিয়া টোপী কি বিশাল সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার নিয়ে বেতোয়াতে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন এবং কি সুবিপুল রণসম্ভার ইংরেজের হাতে তুলে দিয়ে এসেছেন, তা যতবারই তাঁর মনে হল ততবারই তাঁতিয়া টোপীর ওপর ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। তবে ব্যক্তিগত মান অভিমানের সময় সেটা নয়। তখন তাঁর একমাত্র কর্তব্য ইংরেজকে পরাজিত করে ঝাঁসীর সহস্র সহস্র বীর শহীদের মৃত্যুর ঋণ শোধ করা। সেই বৃহৎ ও মহত্তর দায়িত্বের কাছে অতি সহজে তিনি ব্যক্তিগত অভিমান বিসর্জন দিলেন। সক্রিয় সংগ্রামে বিশ্বাসী রাণী কেবল সংগ্রামের কথাই ভাবলেন।

পরিশ্রান্ত অনুচরবর্গ ও বালক দামোদরের পূর্ণ বিশ্রামের পর, প্রভাতে তিনি স্নান করলেন। তাঁর প্রয়োজন হবে জেনে সকালেই তাঁতিয়া টোপী উপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্র, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার, পাচক, ভৃত্য, দাস দাসী সমস্ত কিছু সরবরাহ করলেন। স্নানান্তে রাণী রাওসাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন।

কাল্পিতে নানাসাহেবের যে ঘাটি ছিল সেখানে রাওসাহেব কেবল পেশওয়ে নামে পরিচিত ছিলেন। রাণী তাঁর সম্মুখে আপন পদমর্যাদা অনুযায়ী গাম্ভীর্য ও সম্মানের সঙ্গে মাধবরাও পেশোয়া কর্তৃক রঘুনাথহরি নেবালকরকে প্রদত্ত রত্নখচিত তরবারি দুই হাতে ধরে ভূমিতে রাখলেন এবং বিষাদগম্ভীর স্বরে বললেন—

> 'তুমচ্যা পূর্ব জাংনী হী তরওয়ার, আহ্মাস দিলী আহে। ত্যাঞ্চা পুণ্য প্রতাপে করুন আজ পর্যন্ত তিচা আহ্মী যোগ্য উপযোগ কেলা। আতাঁ তুমচেঁ আহ্মাস সাহ্য রাহিলেঁ নাহীঁ, ঝাকরিতা হী আপন পরত ধ্যাবী!'
>
> '—তোমার পূর্বপুরুষ এই তরবারি আমার পূর্বপুরুষদের দিয়েছিলেন। তাঁদের পুণ্যবলে আজ পর্যন্ত আমি তার যোগ্য মর্যাদা রক্ষা করেছি। আজ আমার দ্বারা তোমার আর কোন সাহায্য হবে না। অতএব তুমি এই তরবারি ফিরে নাও।'

রাণীর কথাগুলি সবিশেষ চাতুর্যপূর্ণ। রাওসাহেবকে সরাসরি এই কথা বলবার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বিফল হল না। রাওসাহেব গভীর লজ্জায় নীরব হলেন। লজ্জার সঙ্গে তিনি মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, এই তরুণী একাকিনী ইংরেজের বিরুদ্ধে যে

ভাবে সংগ্রাম করেছেন, তিনি তাঁর সুবিপুল বাহিনী নিয়ে সেই তুলনায় কিছুই করতে পারেননি। তাঁতিয়া টোপীর বেতোয়া যুদ্ধে পরাজয়ের কথা আবার তাঁর স্মরণ হল। বেতোয়ার যুদ্ধে তাঁতিয়া পরাজিত না হলে রাণী আজকে তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াতেন না। মধ্যভারতে সম্মিলিত মরাঠা ও বুন্দেলা শক্তি ইংরেজ অধিকারকে নিঃসন্দেহে নাকচ করে দিত, সে কথা বারবার তাঁর মনে কশাঘাত করল। ব্যক্তিত্ববিহীন রাওসাহেব মর্মাহত ও অভিভূত হলেন। আর তার পরেই পেশোয়া পদসুলভ দাক্ষিণ্য দেখিয়ে রাণীকে বললেন,

> 'তুমি তোমার পূর্বপুরুষদের সম্মান রক্ষা করেছ। তোমার অসাধারণ যুদ্ধ কৌশলে ইংরেজদের দীর্ঘদিন ধরে প্রতিহত করেছ। আমাদের সঙ্গে তুমি যোগ না দিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। একদা সিন্ধিয়া, গাইকোয়াড়, হোলকার প্রভৃতি সমস্ত শক্তি আমার পূর্বপুরুষদের অধীনে ছিল। তুমি তোমার তরবারি গ্রহণ কর। আমাকে সাহায্য কর। পেশোয়াশাহী পুরাতন গৌরবে আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করুক।'

আরও জানালেন, বান্দার নবাব, বাণপুরের রাজা, শাহগড়ের রাজা যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করছেন। রাণী স্বয়ং এসেছেন খবর পেলে তাঁরা সত্বর এসে কাল্পিতে যোগ দেবেন।

কাল্পিতে রাওসাহেব রাণীকে সৈন্যাধ্যক্ষ নির্বাচিত করলেন। তাঁতিয়া টোপীকে রাণীর অধীনে যুদ্ধ করতে হবে সে কথাও জানালেন।

যোগ্যতম নেতা হলেও তিনি রমণী। তাঁর কর্তৃত্ব সকলে দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নেবেন কি না, এমন সংশয় রাণীর মনে এলেও তিনি তার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না।

রাণীর নেতৃত্বে গোয়ালিয়ার কন্টিনজেন্ট, অন্যান্য বাগী সিপাহী, রিসালদার, সওয়ার, গোলন্দাজ সকলে নতুন উৎসাহে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল।

সেদিন কাল্পির সামরিক গুরুত্ব খুব বেশি। কানপুরের দক্ষিণে ঝাঁসী-কানপুর রোডের ওপরে অবস্থিত কাল্পিতে ১৮৫৭ সালের আগে একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি ছিল। যমুনার দক্ষিণ তীরে কাল্পির

অবস্থিতি এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, সেখান থেকে সমগ্র উত্তর ও মধ্য-ভারতের সামরিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ১৮৫৭ সালে তাঁতিয়া টোপী, গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের বাঘী সিপাহীদের নিয়ে কাল্পিতে তাঁর প্রধান সামরিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেই থেকে এ পর্যন্ত কাল্পি একবারও ভারতীয়দের হাতছাড়া হয়নি। কাল্পি ভারতীয়দের শেষ আশ্রয়স্থল বলে কাল্পিতে গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্ট, কোটাহ্ কন্টিন্‌জেণ্ট, 52nd Bengal Native Infantry, 5th Bengal Irregular Cavalry প্রভৃতির সমাবেশে একটি বিশাল ভারতীয় বাহিনী অপেক্ষমান ছিল। এবার কাল্পিতে রাণী ও তাঁতিয়া টোপী চোদ্দটি কামান, একটি আঠার পাউণ্ডার কামান, দুটি নয় পাউণ্ডের Mortar সংগ্রহ করলেন। সামরিক শক্তি সংগঠনে তাঁতিয়া টোপীর অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। কাল্পিতে তাঁর উদ্যোগে মাটির তলায় একটি magazine-এ পিপে বোঝাই করে দশ হাজার পাউণ্ড ইংলিশ পাউডার (বারুদ), নয় হাজার পাউণ্ড গুলী ও ফাঁকা গুলার খাপ, সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, অসংখ্য কামানের গোলা, বন্দুক, চার হাজার তাঁবু ইত্যাদি রাখা হল। শহরে চারটি কামান ঢালাই করবার কেন্দ্র স্থাপিত হল। তাতে কামানের চাকা ও কামান টানবার গাড়ি রাখবার সম্পূর্ণ উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি ছিল। কাল্পির আশপাশের গ্রামবাসীদের মনেও উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার হল। কাল্পি কানপুর ও বিঠুরের অতি সন্নিকটে। সেখানে নানা-সাহেবের নাম করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করা হল। কাল্পির দুর্গ যদিও শক্তির দিক থেকে একান্ত নগণ্য, তবু তাকে অভেদ্য বলা চলে। তার কারণ যমুনার বুক থেকে যে খাড়া পাহাড় উঠেছে, তার ওপরে কাল্পির দুর্গ। তার সামনে পর পর পাঁচটি দুর্ভেদ্য বাধা। প্রথমে অজস্র গিরিগহ্বর খানার মতো তাকে ঘিরে আছে। তারপরে কাল্পি শহর, যেখানে সামরিক প্রতিরোধের সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। তারপরে আরো একটি গিরিখাত (Ravine) ঘিরে রেখেছে শহরকে। তারপরে রয়েছে সুবিখ্যাত চুরাশগম্বুজ বা চুরাশীটি মন্দির। তারপরে গভীর পরিখা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। পুবে ও পশ্চিমে কাল্পি গিরিগহ্বর দিয়ে ঘেরা। ঝাঁসী-কাল্পি রোডের ওপর দিয়ে ইংরেজদের আসবার

সম্ভাবনা রয়েছে, অতএব সেখানেও প্রতিরোধের সুবন্দোবস্ত হল।

এদিকে, রাণী কাল্পি রওনা হয়ে গিয়েছেন জেনেও হিউরোজ ২৫শে এপ্রিলের আগে ঝাঁসী ত্যাগ করতে পারলেন না। কোটাহ্ ও বুন্দেলখণ্ডের অন্যান্য ভারতীয়রা ঝাঁসী পুনরাক্রমণ করতে পারেন এই আশঙ্কায় ঝাঁসীর নিরাপত্তার জন্য H. M.'s 86th Regiment-এর লে: কর্নেল লোথ্ (Lowth)-কে ঝাঁসী-গুণাহ্ রোডের ওপর উক্ত রেজিমেণ্টের একটি Column-সহ রাখা হল।

ব্রিগেডিয়ার স্মিথ রাজপুতানা ফিল্ড ফোর্সের একটি ব্রিগেডসহ গুণাহ্ পৌঁছলে পর হিউরোজ ঝাঁসীর নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। লে: কর্নেল লোথ্-এর নেতৃত্বে 71st Regiment ও 3rd Bombay Light Cavalry ঝাঁসী-গুণাহ্ রোডের ওপর নজর রাখছিল। ব্রিগেডিয়ার স্মিথ ঝাঁসী পৌঁছলেই 71st Regiment ও 3rd Bombay Light Cavalry ঝাঁসীতে অপেক্ষমান ব্রি: Steuart-এর নেতৃত্বাধীন 2nd Brigade-এর অবশিষ্ট সৈন্যদের সঙ্গে কুঁচ-এ এসে যোগ দেবে, এই নির্দেশ দিয়ে হিউরোজ ২৫শে এপ্রিল কাল্পির পথে পুঁচ-এ পৌঁছলেন। মেজর অর (Orr)-কে হিউরোজ পাঠিয়েছিলেন ঝাঁসীর কাছে বেতোয়ার ওপর নজর রাখতে। বাণপুরের রাজা ও শাহগড়ের রাজা যাতে কোনমতেই বেতোয়া পার হয়ে ঝাঁসীর পথে না আসতে পারেন সেই জন্য প্রয়োজন ছিল এই ব্যবস্থার। বাণপুরের রাজা ও শাহগড়ের রাজা সেই উদ্দেশ্যেই কাল্পি থেকে চলে এলেন। গুরসরাই-এর রাজার সৈন্যদল বেতোয়াতীরে কোটরা গ্রামে ইংরেজদের সাহায্য করবে বলে অপেক্ষা করছিল। তাঁরা তাদের তাড়িয়ে দিয়ে কোটরা অধিকার করলেন। ঝাঁসী পুনরাধিকারের দুরাশায় তাঁদের সেই অভিযান।

মেজর অর কোটরাতে যুদ্ধ করলেন বাণপুরের ও শাহগড়ের রাজার সঙ্গে। বাণপুরের রাজার কোটরাতে আটকে থাকবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। তিনি ও শাহগড়ের বখ্‌তব্ আলী বেতোয়া পার হয়ে পলায়ন করলেন। জিগ্‌নীর রাজা নামে মাত্র ব্রিটিশের বন্ধু ছিলেন। তিনিই লুকিয়ে ঠাকুরমর্দন সিং ও বখ্‌তব্ আলীকে গাড়ি,

ঘোড়া, খাদ্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। মেজর অর হিউরোজের সাহায্যার্থে চললেন।

মেজর গল্ ও রবার্ট হ্যামিল্টনকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঝাঁসী-কাল্পি রোডের ওপর নজর রাখতে। হিউরোজ পুঁচ-এ পৌঁছলে তাঁরা খবর দিলেন যে, ঝাঁসীর রাণী ও তাঁতিয়া টোপীর নেতৃত্বে পাঁচশ' বিলায়েতী, আফ্‌ঘান, কোটাহ্ অশ্বারোহী, কামান ও বন্দুকধারী পদাতিক কাল্পির পথে কুঁচ-এ অপেক্ষা করছেন। হিউরোজকে কাল্পির পথে অগ্রসর হতে দেবেন না এই তাঁদের উদ্দেশ্য।

কুঁচ জায়গা হিসাবে নগণ্য কিন্তু সমস্ত জনপদটি ঘিরে রয়েছে অসংখ্য মন্দির, বাগান ও জঙ্গল। মন্দির ও বাগানগুলি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। জনপদের ভেতরে রয়েছে একটি ছোট্ট মাটির কেল্লা। রাণী ও তাঁতিয়া টোপীর অধীনে ভারতীয় বাহিনী, বাগানে, মন্দিরে আত্মগোপন করে অপেক্ষা করতে লাগল।

হিউরোজ পুঁচ-এ পৌঁছেছিলেন ১লা মে। তখন গরমের মাত্রা একশ' কুড়ি থেকে পঁচিশ ডিগ্রী। পথে কোথাও এতটুকু সবুজের চিহ্নমাত্র মেলে না। দুর্দান্ত তাপে সমস্ত মধ্যভারত তখন খাঁ খাঁ করছে। ব্রিটিশ সৈন্যের পক্ষে গরমে যুদ্ধ করা কতখানি কষ্টকর হবে তা জেনেই রাণী আদেশ দিলেন, বেলা দশটার আগে কখনই যুদ্ধ শুরু করা চলবে না। কাল্পিতে পৌঁছবার আগেই ব্রিটিশফৌজ গরমে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, এই ছিল তাঁর ধারণা।

ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার স্মিথ রাজপুতানা থেকে গুণাহ্ হয়ে ঝাঁসীতে এসেছেন। ব্রিগেডিয়ার Steuart এসেছেন পুঁচ-এ। মেজর অর বাণপুর ও শাহগড়ের রাজাদের সঙ্গে সজ্ঘর্ষ হবার পর হিউরোজের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছেন। কাজেই হিউরোজের অধীনে তখন তিন দলে প্রচুর সৈন্য।

৬ই মে প্রত্যূষে হিউরোজ প্রথম ব্রিগেড নিয়ে কুঁচ-এর পথে রওনা হলেন। কুঁচ জনপদটির চারিদিক ঘিরে রাণী পরিখা কাটিয়েছিলেন। সেই পরিখাতে লুকিয়েছিল কোটাহ রেজিমেণ্টের বন্দুকধারী বাঘী সিপাহীর দল। কুঁচ-এর উত্তর পশ্চিমে কাল্পি যাবার পথ। সেইদিকটি একমাত্র অরক্ষিত রেখেছিলেন তিনি।

হিউরোজ ঠিক করলেন সেইদিক থেকেই আক্রমণ শুরু করতে হবে।

প্রথম ব্রিগেড নিয়ে চৌদ্দ মাইল পথ পেরিয়ে হিউরোজ ৬ই মে মধ্যাহ্নে পৌঁছলেন নাগুপুরা গ্রামে। তার আগের দিনই দ্বিতীয় ব্রিগেডসহ পৌঁছেছেন মেজর অর ও ব্রিগেডিয়ার Steuart। মেজর অর ছিলেন উম্‌রী গ্রামে। Steuart ছিলেন চোমাইর গ্রামে। প্রথম ব্রিগেড অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল বলে হিউরোজ তাদের বিশ্রাম গ্রহণ ও স্নানাহার করতে নির্দেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে হিউরোজের নির্দেশে শহরের প্রাচীরের গায়ে গোলাবর্ষণ শুরু হল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একদল ভারতীয় গোলন্দাজ পাল্টা কামান ছুঁড়তে লাগলেন। বাকী দল শহরের ভেতরে আশ্রয় নিলেন।

হিউরোজ ঠিক করলেন কুঁচের বহিসীমানাকে বিপদমুক্ত করবার জন্য কুঁচ পরিবেষ্টনকারী মন্দির, বাগান ও জঙ্গলগুলি থেকে সমস্ত ভারতীয়দের বিতাড়ন করে শহরের ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। তিনি মেজর Steuart-এর অধীনে H. M. 86th Regiment-এর একটি বাহিনী ও 25th Bombay Native Infantry-কে লেঃ কর্নেল রবিন্সনের অধীনে ডান ও বাঁ দিক দিয়ে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। এই দুটি বাহিনীর পেছনে রইল Horse Artillery-র অর্ধেক Troop, H. M. 14th Light Dragoon-এর তিনটি Troop এবং ক্যাপ্টেন ওমমানী (Ommaney)-র অধীনে একটি ব্যাটারী।

এই সমস্ত দলগুলি যুক্তভাবে কুঁচ আক্রমণ করলেন দক্ষিণ দিক থেকে। প্রতি পদে পদে অতীব সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর বন্দুকধারী পদাতিক ও সওয়াররা যুদ্ধ করলেন।

ইতিমধ্যে রাণীর ব্যক্তিগত নেতৃত্বে পাঁচশ' বিলায়েতী ও গুলমুহাম্মদের নেতৃত্বে সহস্রাধিক পদাতিক কুঁচ-এর পশ্চিমে কৃষি-ক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার Steuart-এর প্রথম ব্রিগেডের সঙ্গে যুদ্ধ করল। 2nd Brigade নিয়ে ব্রিঃ Steuart অন্যদিক থেকে এসে তাঁদের ঘিরে ফেলবার উপক্রম করাতে রাণী প্রশংসনীয় নৈপুণ্যে তাঁর সমগ্র বাহিনীকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে, তাঁতিয়া টোপী কুঁচ শহর থেকে বেরিয়ে কাউকে এমনকি রাণীকে পর্যন্ত না জানিয়ে চিরখারীর পথে চলে গেলেন। তাঁর এই রহস্যময় আচরণের ফলে সহসা তাঁর অধীনস্থ সৈন্যরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। রাণীর উপস্থিত বুদ্ধি ও অপূর্ব সমর কৌশলের জন্য কুঁচ-এ অবশিষ্ট ভারতীয় সৈন্যরা আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বার হাত থেকে বেঁচে গেল। বিশৃঙ্খলভাবে ভারতীয় সৈন্যরা কুঁচ থেকে বেরিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে কৃষিক্ষেত্রের ওপর দিয়ে পালাচ্ছে দেখে তিনি জানতে চাইলেন, তাঁতিয়া কোথায় আর কুঁচ শহরে যে নয়টি কামান ও অজস্র গোলাবারুদ ছিল, তারই বা কি অবস্থা! জানতে পারলেন, তাঁতিয়া এই চরম মুহূর্তে চিরখারী চলে গিয়েছেন। নয়টি কামানই ইংরেজের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে জানলেন ক্যাপ্টেন ম্যাকমোহন, মেজর অর, ব্রিঃ Steuart, ব্রিঃ Stuart, ক্যাপ্টেন ফিল্ড (Field) ও ক্যাপ্টেন ব্লিদ্ (Blyth)-এর নেতৃত্বে চার হাজার পদাতিক সওয়ার ও গোলন্দাজ চারটি কামান নিয়ে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করতে আসছে।

এমন অবস্থায় দীর্ঘ চিন্তার অবকাশ বা সময় নেই। সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। গুলমুহাম্মদ ও রঘুনাথ সিংহের সঙ্গে তিনি নিজে গিয়ে ছত্রভঙ্গ তাঁতিয়ার সৈন্যদের যথাসম্ভব একত্র সন্নিবেশিত করে নিজের সৈন্যদের সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ পশ্চাদপসরণ-কারী বাহিনী গঠন করে উরাই-এর পথে কাল্পি চললেন। ক্ষণকাল মধ্যে ভারতীয় বাহিনীর এইরূপ সুশৃঙ্খলা দেখে ইংরেজ নায়করা বিস্মিত হলেন। আরো বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁদের পশ্চাদনুসরণ সত্ত্বেও এতটুকু বিভ্রান্ত না হয়ে সুশৃঙ্খলে, সুকৌশলে সমগ্র বাহিনী কাল্পির পথে চলেছে। ইংরেজরা যখন আক্রমণ করলেন তখন দেখলেন রাণীর সুদীর্ঘ বাহিনীর পেছনের পদাতিক ও সওয়াররা দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে আর সেই অবসরে অবশিষ্ট বাহিনী নিরাপত্তার খাতিরে পশ্চাদপসরণে ব্যাপৃত রয়েছে।

হিউরোজ বলেছেন—

'If on the one hand the enemey had retired from Koonch with too great precipitation, on the other, it is fair to say that they commenced their

retreat across the plain with resolution and intelligence. The line of Skirmishers fought well to protect the retreat of the main body, observing the rules of Light Infantry drill. When charged they threw their maskets, and fought desperately with their swords.' (H. Rose. Military despatch).

'একদিকে যেমন শত্রুরা কুঁচ থেকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল, অপরদিকে স্বীকার করাই উচিত যে, তাদের পশ্চাদপসরণে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তা দেখা গিয়েছিল। প্রধান বাহিনীর পশ্চাদপসরণের নিরাপত্তার জন্য পশ্চাৎবর্তীরা যথেষ্ট চেষ্টা করছিল। আক্রান্ত হওয়ার পর তারা বন্দুক ফেলে দিয়ে তরবারি নিয়ে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছিল।'

কে ও ম্যালেসন বলেছেন—

'Then was witnessed action on the part of the rebels, which impelled admiration from the enemies. The manner in which they conducted their retreat could not be surpassed. There was no hurry, no disorder, no rushing to the rear. All was orderly. The line two mile long, never wavered in a single point. Their movement was so threatening, that Rose ordered Prettijohn to charge.'

'তখন বিদ্রোহীদের তৎপরতা দেখে তাদের শত্রুরাও শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হল। তারা যেভাবে পশ্চাদপসরণ পরিচালনা করেছিল, তার তুলনা হয় না। কোন রকম তাড়াহুড়ো ছিল না, কোন বিশৃঙ্খলা ছিল না, পেছনে চলে যাবার জন্য কোন অহেতুক ব্যস্ততা ছিল না। সমস্তই অতীব সুশৃঙ্খলায় পরিচালিত হয়েছিল। দুই মাইল দীর্ঘ সেই সেনাবাহিনীর মিছিলে কোথাও বিন্দুমাত্র শৈথিল্যের চিহ্ন নজরে পড়েনি।'

ক্যাপ্টেন ম্যাকমোহন রাণীর অনুসরণ করতে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে আসেন। ব্রিটিশ পক্ষের বিশাল বাহিনী তাড়া করতে এসে অত্যধিক গরমে শেষ পর্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে যায়।

সেদিনের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন রাণীর পার্শ্বযোদ্ধা গঙ্গা। রাণীর Retreat লাইনের পেছনের দিকে ছিলেন তিনি। ক্যাপ্টেন ম্যাকমোহনের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে তিনি নিহত হন। গঙ্গা মরণাহত

হয়ে পড়ে গেলেন দেখেও রাণীর পক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁকে তুলে নেওয়া সম্ভব হয়নি। স্বল্প বয়সে তিনি এসেছিলেন ঝাঁসীর রাজপুরীতে। রাণীর আবাল্য সহচরী ও সেবিকা ছিলেন তিনি। বিপদের দিনে তিনি রাণীর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, কামান ছুঁড়েছেন, বন্দুক চালিয়েছেন, যুদ্ধের সবটুকু দুঃখ কষ্ট সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। এমন প্রিয়সহচরীর পতনেও রাণীর তখন শোকার্ত হবার সময় ছিল না। কারণ তখন একজনের চেয়ে বহুজনের কথা আগে চিন্তনীয়। স্বদেশের বুক থেকে বিদেশী শত্রুকে উচ্ছেদের জন্য প্রাণ দিলেন গঙ্গা। মৃত্যুতেও তাঁর অনিন্দ্য দেহকান্তি মলিন হয়নি। তাঁকে দেখে ইংরেজরা বলাবলি করলেন, এই কি সেই ঝাঁসীর রাণী?

কুঁচের যুদ্ধের অবসানে একটি ব্যর্থ সংগ্রামের ওপর তপ্ত সন্ধ্যার যবনিকা নামল। ১২০° ডিগ্রী গরমে যুদ্ধ করে ভারতীয় এবং ইংরেজরা উভয়ই বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। দুরন্ত সূর্যতাপে হিউরোজ নিজে পাঁচবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। পাঁচবারই মাথায় জল ঢেলে ও স্নান করে তিনি আবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। সামরিক হাসপাতালের তাঁবুতে ডুলির পর ডুলি ভরতি করে সর্দিগর্মিতে আক্রান্ত লোকদের বয়ে আনা হচ্ছিল। কেউ হাসছিল, কেউ কাঁদছিল, কেউ আবোল তাবোল বকছিল। ছেচল্লিশজন ইংরেজ সেদিন গরমে মারা গিয়েছিল। ভারতীয় সিপাহীরাও তৃষ্ণায় পাগল হয়ে ইংরেজদের উপস্থিতি তুচ্ছ করে কূয়ো থেকে জল পান করছিল। রাণী তাঁর ফৌজদের মধ্যে লেবুর টুকরো বিতরণ করছিলেন।

ঘোড়া, উট, গরু মরে রাস্তার দু'পাশে শুকিয়ে উঠতে লাগল। বাধ্য হয়ে হিউরোজ কাল্পি রওনা হবার আগে কুঁচ-এ ক'দিন বিশ্রাম নেবার জন্য এলেন।

ঝাঁসী পরিত্যাগ করে বিষ্ণুভট্ট সেদিন কাল্পিতে পৌঁছলেন। কাল্পির প্রান্তে তিনি একটি কূয়োর পাশে দাঁড়িয়ে জলপান করছিলেন। সেই সময় চার পাঁচজন সওয়ার সমভিব্যাহারে রাণী সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরনে পাঠানী পোষাক। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, মুখ আরক্ত, নয়ন উদাস। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি জল খেতে এলেন। তাঁতিয়ার ব্যবহারে এবং তাঁকে এইভাবে বিপদের মুখে ফেলে যাওয়াতে রাণী অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। মনের অবস্থা তাঁর

তখন এরকম যে, তিনি বিষ্ণুভট্টকে চিনতেই পারলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি কে?' দুঃখে ও করুণায়, কাতর-হৃদয় বিষ্ণুভট্ট কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন—'আমি ব্রাহ্মণ, আপনি তৃষ্ণার্ত, আপনাকে আমি জল দিই, অনুমতি দিন।'বলেই তিনি কুয়ো থেকে জল তুলতে উদ্যোগী হলেন। তখন রাণী কাছে এসে বললেন—'তুমি বিদ্বান ব্রাহ্মণ, তুমি কেন আমাকে জল দেবে?' তারপর নিজেই জল তুলে অঞ্জলি ভরে পান করলেন। তাঁর মুখে নিরাশার বেদনা। নিরাশকণ্ঠে বললেন—'আমি রাজার ঘরনী হয়ে, হিন্দুধর্মানুযায়ী বিধবার ধর্ম পালন করলাম না, আমার পরলোকের কথা ভাবলাম না। যে কর্মে প্রবৃত্ত হলাম, তাতেও জীবিতকালে সাফল্যের আশা দেখছি না। যশের প্রত্যাশায় কর্মে উদ্যোগী হইনি সত্য, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে প্রাপ্য যশও দিলেন না। এই যে জীবন পণ রেখে যুদ্ধ করলাম, তাতে কি হল?' তারপর লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসলেন। নিরুদ্যম পরিহার করে কাল্পি অভিমুখে আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

কাল্পি পৌঁছে ভারতীয় ফৌজের সমস্ত সিপাহীরা তাঁতিয়া টোপীকে দোষ দিতে লাগলেন। তাঁতিয়া টোপীকে অব্যবস্থিত-চিত্ত দেখে রাণী একান্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। সেজন্য তিনি বারবার রাওসাহেবকে সামরিক শৃঙ্খলা ও সুপরিকল্পিত সৈন্য সমাবেশের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে লাগলেন। কুঁচ-এর পরাজয়ে তখন তাঁরা একান্ত বিপর্যস্ত।

এই বিপর্যস্ত অবস্থা থাকতে থাকতে হিউরোজ কাল্পি আক্রমণ করবেন বলে রাতের অন্ধকারে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু সমগ্র যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল বান্দার নবাবের আগমনে। খবর পাওয়া গেল বান্দার নবাব তাঁর দুঃসাহসী নয় হাজার সৈন্য নিয়ে কাল্পিতে আসছেন। নতুন উৎসাহ সঞ্চারিত হল সৈন্যদের মধ্যে। রাণী আশান্বিত চিত্তে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ধুলোর ঝড় উড়িয়ে পাঁচহাজার অশ্বারোহী এবং চারহাজার পদাতিক নিয়ে বান্দার নবাব এসে যোগ দিলেন কাল্পিতে। ঝাঁসীর রাণীর উপস্থিতিই তাঁকে কাল্পিতে আসতে প্রভাবান্বিত করেছিল। মাঝরাতে ধূলিধূসরিত দেহে তিনি বাঈসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে অস্পষ্ট আলোয়

সাক্ষাৎ হল তাঁদের। একই আদর্শে অনুপ্রাণিত মুসলমান নবাব ও হিন্দু রাণী, পারস্পরিক সাহায্য ও মিত্রতার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হলেন।

দীর্ঘদিন পর নিশ্চিন্তে ঘুমোলেন রাণী।

বান্দার নবাবের কাল্পিতে আগমনের প্রধান কারণ হচ্ছে হুইট্‌লক (Whitelock)-এর সঙ্গে তাঁর সঙ্ঘর্ষ। ১৭ই ফেব্রুয়ারী হুইট্‌লক জব্বলপুর থেকে রওনা হয়েছিলেন। ১৭ই মার্চ অবধি তিনি দামোহ্‌তে ছিলেন। ২২শে মার্চ তিনি বান্দা অভিমুখে রওনা হন। ১৯শে এপ্রিল তিনি বান্দার সামনে পৌঁছলেন। বান্দার সামনে রাস্তার ধারে পরিখায় অপেক্ষা করে ছিল বান্দার নবাবের বন্দুকধারী পদাতিকরা। হুইট্‌লকের বাহিনী যখন পেছনে তখন কর্নেল এ্যাপথ্রপ (Apthrop) অগ্রবর্তী একটি Brigade নিয়ে বান্দা আক্রমণ করবার জন্য এগিয়ে আসেন। সেখানে বান্দার নবাবের বন্দুকধারী পদাতিকদের সঙ্গে তাঁর যে সঙ্ঘর্ষ হয় তাতে তিনি পরাজিত হন। হুইট্‌লক এসে সাহায্য না করলে সেদিন কর্নেল এ্যাপথ্রপ জীবন নিয়ে ফিরতে পারতেন কি না সন্দেহ। হুইট্‌লকের সঙ্গে বান্দার নবাব সাতঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করেন। পরাজিত হবার উপক্রম দেখে বৃথা সৈন্যক্ষয় না করে তাঁর নয় হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি কাল্পি অভিমুখে যাত্রা করলেন। এমন সময় রাণীর কাল্পিতে আগমনের খবর পেয়ে তিনি আরও উৎসাহিত হলেন। বান্দার নবাব নিজে সাহসী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর আগমনের ফলে কাল্পিতে নতুন উৎসাহের সঞ্চার হল অন্যান্য সৈন্যদের মধ্যে। তাঁতিয়া টোপী তখন সেখানে ছিলেন না। ঝাঁসীর রাণী ও বান্দার নবাব নবোদ্যমে সমরায়োজন করতে লাগলেন।

কাল্পির যুদ্ধের প্রারম্ভে ঝাঁসীর রাণী ও বান্দার নবাব দু'জনেই সৈন্যদের মধ্যে অদম্য উৎসাহ সঞ্চার করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সৈন্যদের এবং আশেপাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে রাণীর এই ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন রাওসাহেবের পছন্দ হল না। তিনি এজন্য রাণীকে অনুযোগ করলেন। রাণী সর্বদা অপরের পরামর্শ গ্রহণ করলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন নিজে। নিজের মতানুযায়ী চলে তিনি রাওসাহেবের মনে অমূলক বিরক্তি সঞ্চার করছেন বুঝেও তিনি বিচলিত হননি।

কাল্পিতে প্রচুর সমরায়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রথমদিকে সৈন্যদের এরূপভাবে রাখা হয়েছিল যেন তারা পুরনো আমলের বেতনভোগী সৈন্য মাত্র। 50th Bengal Native Infantry ও 52nd N. I., রোহিলখণ্ড, অযোধ্যা ও কোটাহ'র রেজিমেণ্ট সমূহ, আর ভারতবর্ষের সবচেয়ে সুশিক্ষিত ও সামরিক শৃঙ্খলায় অভিজ্ঞ গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্ট, আফঘানী, পাঠান সওয়ার ও পদাতিক, যারাই কাল্পিতে সমবেত হয়েছিল, তারা সকলেই ছিল ইংরেজ বিরোধিতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ। তাদের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে তারা যে একদিন ইংরেজের কাছে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন বিচার পাবে না, তা জেনেও তারা তাঁতিয়া টোপীর নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করতে এসেছিল। বেতনভোগী সৈন্যদের নিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির সংগ্রামের সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামের যে বিস্তর প্রভেদ তা তাঁতিয়া বুঝতেন। কিন্তু সেই বিক্ষুব্ধ অবস্থার হাল ধরবার মতো যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য তাঁর তখন ছিল না। কুঁচ ও কাল্পির শোচনীয় পরাজয় এবং মধ্যভারতে স্বাধীনতা সমরের ব্যর্থ পরিণতির জন্য উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবই শুধু দায়ী।

রাণী বুঝেছিলেন, যেখানে বহুকে নিয়ে কাজ সেখানে সকলের আস্থা অর্জন করতে হলে তাদের সঙ্গে এক হয়ে সাফল্য ও ব্যর্থতা সমানভাবে ভাগ করে নিতে হয়। যুদ্ধ শুধু তরবারির সাথে তরবারির নয়, আদর্শের সাথে আদর্শেরও। ইংরেজ ভারতবর্ষে উপনিবেশ কায়েম করে রাখতে চায়। সে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র এবং অতীব সুনিপুণ সমরকৌশলে সজ্জিত হয়ে লড়তে এসেছে। তিনি আরও বুঝেছিলেন তাকে রুখবার মতো শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান তাঁর নেই। একমাত্র ভরসা তাঁর ফৌজী সিপাহীদের মনে যদি স্বাধীনতার আদর্শ সত্যই দৃঢ়মূল হয়ে থাকে তবে তাদের নৈতিক প্রতিরোধের সম্মুখে ইংরেজের উন্নত ও সুশিক্ষিত সমরকৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁরা যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন সে সম্বন্ধে রাণী বা তাঁর সহযোগীদের মনে কোন দ্বিধা ছিল না। সেই পরিচয়ই পাওয়া গিয়েছে ঝাঁসীর প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়ে। কোন মহান আদর্শের প্রেরণা ব্যতীত পনেরদিন ধরে কেবলমাত্র বুন্দেলখণ্ডী, মারাঠি, ও পাঠান নরনারীকে

নিয়ে হিউরোজের মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রতিরোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না।

১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের ফলে রাণীর মধ্যে চারিত্রগত যে ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটেছিল, পরম দুঃখের বিষয়, রাওসাহেব বা তাঁতিয়া টোপীর মধ্যে প্রথম দিকে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

কাল্পিতে ৭ই মে থেকে ২০শে মে পর্যন্ত রাণী অক্লান্ত পরিশ্রমে সৈন্যদের প্যারেড করালেন। ইংরেজী কানুনে সুশিক্ষিত সিপাহী, সুবেদার ও জমাদারদের উপর সৈন্যদের ড্রিল ও প্যারেড করাবার ভার দিলেন। যথাযোগ্যভাবে কামান সন্নিবেশ করলেন। কাল্পির দক্ষিণ, পুব ও পশ্চিম দিকগুলি সুরক্ষিত করবার বন্দোবস্ত করলেন। বিঠুরের নিকটবর্তী কাল্পিতে নির্বাসিত পেশবা দ্বিতীয় বাজীরাও ও তাঁর পুত্র নানাধুন্ধুপন্থের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য ছিল। সেই আনুগত্যের উল্লেখ করে গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচার কার্য চালান হল। ঝাঁসী-কাল্পি রোডের ধারে বড় বড় নিম, তেঁতুল ও বটগাছগুলি কেটে ফেলা হল।

'পেঁড় গিরবাও কহত রাণী ঝাঁসী।
ন তেলেঙ্গা দেব হামৈ সিপাহীক ফাঁসী॥
বে-হিম্মৎ সে ন কহ পাওয়ে লটকাও।
ন ধুপ অধুপ মেলি মিলবত ছাঁব॥'

'ঝাঁসীর রাণী বললেন,—গাছ কেটে ফেল, যাতে তেলেঙ্গা আমার সিপাহীদের ফাঁসী দিতে না পারে। বে-হিম্মৎ (ইংরেজ) যেন "লটকাও, লটকাও" বলতে না পারে। প্রখর রোদে যেন তার ছায়া না মেলে।'

ভারতীয় সিপাহীদের কাছে প্রখর গ্রীষ্মে ইংরেজদের হয়রানি সর্বদাই পরম কৌতুকের বিষয় ছিল।

'আঁখসে আঁসুয়া বীচি বোলী হিউরোজ মানী।
বিনতি করোঁ মাঙ্গো এক লোটা পানী।
এক লোটামে পিয়াস তরসাঁও। ঔর মাঙ্গো ফির।
লৌটকে রাখো তোফা গোলী, লৌট শমসীর॥'

'কেঁদে কেঁদে হিউরোজ বললেন,—এক লোটা জল নিয়ে এস। তৃষ্ণা মেটাও। আবার ফিরে এক লোটা জল আন। কামান, গোলী ও তরবারি ফেরত দিয়ে দাও।'

কাল্পির সমরায়োজন সম্পূর্ণ হওয়ার পর পুনর্বার মত পরিবর্তন করলেন রাওসাহেব। জানালেন, পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী রাণীকে সৈন্যাধক্ষ্য রাখবার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি নিজে থাকবেন সর্বসৈন্যাধক্ষ্য। বান্দার নবাব তাঁর দুই হাজার সওয়ার নিয়ে রইলেন দক্ষিণে। অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বাঘী সিপাহী ও 50th ও 52nd Bengal Native Infantry-র বাঘী সিপাহীদের রাখলেন শহর ও কেল্লা সংরক্ষণার্থ। বাণপুরের রাজা ঠাকুরমর্দন সিং ও শাহ্‌গড়ের রাজা বখ্‌তব্‌ আলী তাঁদের সৈন্যদলের অবশিষ্ট বুন্দেলা ও ঠাকুর ফৌজসহ রইলেন পশ্চিমে। রাণীকে মাত্র 5th Irregular Cavalry-র লালকুর্তাধারী আড়াইশ' সওয়ার দিয়ে কাল্পির উত্তরপ্রান্ত রক্ষা করতে দিলেন। রাওসাহেবের নিজের অধীনে রাখলেন গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের পুরো ফৌজটি।

এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায় ভারতীয় নেতাদের মধ্যে মতানৈক্যই সমুদয় সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ। নেতাদের পারস্পরিক মনান্তর দেখে সৈন্যরাও অনেকাংশে তাঁদের উপর আস্থা হারিয়েছিল। রাওসাহেবের এই ব্যবহারে বান্দার নবাব, বাণপুরের ও শাহ্‌গড়ের রাজা মর্মাহত হলেন। নিজেকে নিয়ে কোনরকম বিবাদ বিদ্বেষ সৃষ্টি করে আসল উদ্দেশ্যের পথে ব্যাঘাত ঘটান রাণীর নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁর সামরিক যোগ্যতা জেনেও যে রাওসাহেব তাঁর বর্তমান হৃতবল অবস্থার সুযোগ নিয়ে এইরকম অপমানজনক ব্যবহার করলেন তা বুঝলেন তিনি। তবুও অন্তরের ক্ষোভ অন্তরে চেপে রাখতে বাধ্য হলেন।

অথচ আসল যুদ্ধের সময়ে কেবল রাণীই এই আড়াইশ' অশ্বারোহী নিয়ে ভারতীয়দের মান রক্ষা করেছিলেন।

১১৮° ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যে হিউরোজ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। তৃষ্ণায় ও প্রখর রৌদ্রতাপে ক্রমান্বয়ে অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল ইংরেজ ফৌজ ও অফিসাররা। যে পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন হিউরোজ, সেখানে একটিও নদী বা পাহাড়ী ঝরনা ছিল না। একমাত্র জলাধার কূয়ো। কূয়ো থেকে জল তুলে অসুস্থদের চিকিৎসা করা, তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়া, ঘোড়া,

হাতী, উট ও অন্যান্য পশুদের জল পান করানোর দুরূহ পরিশ্রম সাধারণ সিপাহীদের দিয়েই চালান হচ্ছিল। ক্রমে রাইফেল বহন করাও Enfield Rifle-ধারীদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। প্রখর সূর্যকিরণে দৃষ্টিশক্তি তাঁদের ক্ষীণ হয়ে এল। হাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কেঁপে গেল বারবার।

গ্রীষ্মের অসহ্যতাকে অসহ্যতর করল গ্রামবাসীদের অসহযোগিতা। ক্রুদ্ধ এবং বিস্মিত হিউরোজ দেখলেন যে, অভ্যুত্থানের প্রথম থেকেই কাল্পি বরাবর ভারতীয় অধিকারে ছিল বলে প্রতিবেশী গ্রামবাসীদের মনে এতটুকু ইংরেজের প্রতি আনুগত্য নেই। তারা অবহেলে জানাতে লাগল সেখানে টাটকা দুধ পাওয়া যায় না। তরিতরকারি মেলা অসম্ভব। হাঁস, মুরগী বা পাঁঠা নাকি সে গাঁয়ে কোনদিনই নেই। ঘি, মধু বা লেবুর নামই তারা শোনেনি। ঘোড়ার জন্য ঘাস? কি আশ্চর্য, আগুন লেগে গঞ্জীকে গঞ্জী গিয়েছে পুড়ে। কাজে কাজেই তাদের শত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা ইংরেজ মেজর সাহেবকে একটাও আশার কথা শোনাতে পারল না।

এই সমস্ত বাধাবিপত্তির ভেতর দিয়ে হিউরোজ চললেন। যারা তাঁকে "Dandy" বলত, তারা সে-সময়ে সেখানে থাকলে দেখতে পেত রোদে যেন তার রং ঝল্‌সে গিয়েছে। ভারতবর্ষের মাটিতে হেঁটে পা হয়েছে ক্ষতবিক্ষত। গায়ে একটা সাদা জামা রাখতেই গরমে প্রাণ যাচ্ছে বেরিয়ে। কাল্পির যুদ্ধটা জিততে পারলে তিনি চলে যাবেন পুণা। মহাবালেশ্বরের পাহাড়ে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা সারাবেন। কিন্তু কাল্পি জেতা কি সম্ভব হবে?

তাঁর সম্মুখে রয়েছে হাজারটা বাধা। ওদিকে শোনা যাচ্ছে কাল্পিতে সমবেত হয়ে অপেক্ষা করছেন বান্দার নবাব, ঝাঁসীর রাণী। ঝাঁসীর রাণীকে যদি একবার বন্দী করা যায়! কিন্তু হিউরোজের চোখের সামনে দিয়েই তো ঝাঁসী থেকে চারশ' সওয়ার নিয়ে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কুঁচ-এ তাঁরই সামনে দিয়ে রাণী বের করে নিয়ে গেলেন তাঁর সৈন্যবাহিনী। রাণীই তাঁকে জ্বালাচ্ছেন বেশি। রাণীর সহজাত আভিজাত্য, সৈন্য ও সহচরদের প্রতি তাঁর অসীম দাক্ষিণ্য এবং যে কোন প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর

অবিচল দৃঢ়তা, সবগুলি মিলিয়ে দেখলে তিনিই হচ্ছেন হিউরোজের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী ও বিপজ্জনক শত্রু।

আর তাছাড়া, ঠিক এই সময়ই কিনা তাঁর দ্বিতীয় ব্রিগেডকে যতরকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে!

কুঁচ-এর যুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনীর অবস্থা বিশৃঙ্খল থাকতে থাকতেই কাল্পি আক্রমণ করবার ইচ্ছা ছিল হিউরোজের। কুঁচ ছেড়ে তিনি যখন প্রথম ব্রিগেড নিয়ে রওনা হলেন, তখন পথের জল-কষ্ট দেখে, দ্বিতীয় ব্রিগেডকেও সেই সঙ্গে এনে অসুবিধার সৃষ্টি করা আর যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। অতএব, তিনি Brigadier Steuart-কে হুকুম দিলেন, দ্বিতীয় ব্রিগেড যেন একদিনে পিছিয়ে তাঁর অনুসরণ করে।

পথে নানাসাহেবের বিশ্বস্ত সর্দার চতুরা সিংহকে পরাজিত করে হরদোইয়ের কেল্লায় ইউনিয়ন জ্যাক ওড়ালেন হিউরোজ।

ইতিমধ্যে হতাশ হয়ে ব্রিঃ Steuart জানালেন, ঝড়বৃষ্টি হয়ে কুঁচ-এ তাঁর তাঁবুসহ সমস্ত সাজসরঞ্জাম ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছে। কাজেই ভাল মতো রোদ পেয়ে সেগুলি না শুকোলে তিনি আসতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত ১১ই মে'র আগে Steuart কুঁচ ছেড়ে বেরোতেই পারলেন না।

এদিকে কোলিন ক্যাম্পবেল Bengal Army-র একটি Column-সহ লেঃ কর্নেল ম্যাক্সওয়েল (Maxwell)-কে হিউরোজের সাহায্যে পাঠিয়েছেন। যমুনার দক্ষিণে এসে তাঁবু ফেলে হিউরোজের জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন। চন্দেরী ও ঝাঁসীর যুদ্ধে হিউরোজের সমস্ত গোলাবারুদ গিয়েছে ফুরিয়ে। ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে সামরিক সাজ-সরঞ্জামের একটি ভাণ্ডার আসছে। হিউরোজ গুপ্তচরের হাতে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, ১৪ই মে কাল্পি থেকে দূরে যমুনার তীরে কোন জায়গায় তিনি ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু গুপ্তচররা গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়েছে আর চিঠি গিয়েছে লোপাট হয়ে। "হিন্দুস্থানের মানুষ হয়ে হিন্দুস্থানীর বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছিস?" বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে একদিকের কান ফুটো করে মাকড়ি বিঁধিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তাদের। এই অপমানকর অবস্থার জন্য গুপ্তচর মেলাও তখন মুস্কিল হয়ে উঠেছে।

হিউরোজ ঠিক করলেন তাঁর সমস্ত বাহিনী নিয়ে কাল্পি থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে গোলাওলী গ্রামে গিয়ে ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। ম্যাক্সওয়েল যমুনার অপর তীর থেকে কাল্পির কেল্লায় গোলাবর্ষণ করতে করতে গোলাওলীর কাছে এসে যমুনা পার হয়ে ডানদিকে হিউরোজের বাহিনীর সঙ্গে মিলবেন এবং যুগপৎ তাঁরা কাল্পির দুর্গ ও শহর অধিকার করবেন।

ভারতীয়দের বিভ্রান্ত করবার উদ্দেশ্যে হিউরোজ দ্বিতীয় ব্রিগেডকে হুকুম দিলেন, কুঁচ থেকে সোজা ওরাই যেতে। ওরাই থেকে বান্দা গ্রামে গিয়ে ব্রিঃ Steuart অপেক্ষা করবেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিঃ Steuart পথ হারিয়ে ফেলে ঘুরতে ঘুরতে বান্দার বদলে হিউরোজের কাছে সুকালী গ্রামে চলে গেলেন। অত্যধিক রৌদ্রতাপে ব্রিঃ Steuart নিজেও অন্যদের সঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

একশ' বছর আগে ইংরেজ সামরিকমহলে হাত-দেখা ও ভাগ্য-গণনার খুব প্রচলন ছিল। সেদিন তাঁরা জানতেন বাঘ, সাপ, দস্যু, যোগী, সন্ন্যাসী, ভূত, প্রেত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর একটি লীলাভূমি হচ্ছে ভারতবর্ষ। সেই কারণেই এখানে এসেই তাদের মধ্যে ভাগ্য-গণনার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। ঝাঁসীর পথে বরোদিয়া দুর্গে সংঘর্ষের সময় ক্যাপ্টেন নেভিল (Neville) নিহত হয়েছিলেন। মৃত্যুর আগের দিনই নাকি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবার তাঁর শেষদিন আসন্ন এবং সেই মর্মে চিঠিও লিখেছিলেন তাঁর মাকে। ব্রিঃ Steuart-ও কুঁচ ছাড়াবার পর থেকে তাঁর যা যা বিপদ ঘটেছে তাকে একান্ত ভাগ্যের পরিহাস ভিন্ন কিছুই ভাবতে পারলেন না। হিউরোজ অবশ্য ভাগ্যবাদী Steuart-কে পথ ভুল করবার জন্য যথেষ্ট অনুযোগ করলেন।

ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দেখা করা তখন হিউরোজের বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্রিগেডকে রৌদ্রাহত ও অসুস্থ রেখে চলে যাওয়াও সমীচীন বোধ হল না তাঁর। প্রথম ব্রিগেডের কিছু সৈন্য নিয়ে দ্বিতীয় ব্রিগেডের সাহায্যার্থে রাখলেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় ব্রিগেডের তৎকালীন অবস্থা জানতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে বান্দার নবাব ও ঝাঁসীর রাণী, কাল্পির চারিপাশে তাঁদের পদাতিক সৈন্য ও কামান

গিরিবর্ত্ম ও খাতগুলির ভেতর থেকে ভারতীয়দের কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল তাঁর ছাউনিতে।

১৬ই ও ১৭ই মে ভারতীয় সৈন্যরা খণ্ড খণ্ড আক্রমণ শুরু করল। গোলাওলীতে প্রথম ব্রিগেড, তেহ্‌রীতে ক্যাপ্টেন হেয়ার এবং দিয়াপুরাতে ছিল দ্বিতীয় ব্রিগেড। ভারতীয় সৈন্যদের এই সব আক্রমণে তিন দলই প্রচণ্ডভাবে বিধ্বস্ত হল।

১৭ই মে যমুনা পার হয়ে কর্নেল ম্যাক্সওয়েল এসে হিউরোজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। যুক্ত পরামর্শে ঠিক হল যে, কর্নেল ম্যাক্সওয়েল যমুনার উত্তর তীরে কাল্পির কেল্লা ও শহরের একাংশের ঠিক মুখোমুখি Mortar Battery বসাবেন। কাল্পি ও গিরিবর্ত্মগুলির মাঝামাঝি তেহ্‌রী গ্রাম ভারতীয়দের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। তেহ্‌রীর মুখোমুখি ম্যাক্সওয়েল অপর একটি ব্যাটারী বসাবেন। কাল্পি আক্রমণের ২০ ঘণ্টা আগে থেকে এই ব্যাটারীগুলি গোলাবর্ষণ করে কাল্পির কেল্লা, শহর ও তেহ্‌রীকে দুর্বল করে ফেলবে। আর তাতে হিউরোজের পক্ষে কাল্পি আক্রমণ করা সহজ হবে।

প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে ভারতীয় পক্ষের খণ্ড খণ্ড আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে হিউরোজের সমগ্র বাহিনী অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তার আর্নট (Arnott) জানালেন ফৌজের মধ্যে এইবার মহামারী দেখা দেবে। কূয়োগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। ঘাস না পেয়ে ঘোড়া যাচ্ছে মরে। বেগতিক অবস্থা দেখে হিউরোজ ২০শে মে রাতারাতি ম্যাক্সওয়েলের বাহিনী থেকে সাতশ' উট-সওয়ার ফৌজ ও সাতশ' সিপাহী আমদানী করলেন।

২৩শে মে কাল্পি আক্রমণের দিন ধার্য হল। ২০শে মে ২৫০ জন ভারতীয় সওয়ার গোলাওলী আক্রমণ করল। ফলে ব্রিটিশ পক্ষে চারজন অফিসারসহ চল্লিশজন সিপাহী নিহত হল। কিন্তু ২১শে মে কাল্পিতে রাণীর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে হঠাৎ এক গোলযোগ দেখা দিল। সওয়ার, গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী—কেউই রাওসাহেবের নেতৃত্ব মানতে চায় না। বিপদ দেখে ঝাঁসীর রাণী ও বান্দার নবাব সৈন্যদের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। পাঠানী পোষাকে সজ্জিতা রাণী গলায় মুক্তোর কণ্ঠী

পরে তাঁর অপর প্রিয় ঘোড়া 'রাজরত্নের' পিঠে চড়ে কাল্পির ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করতে লাগলেন। বললেন, কাল্পি আমাদের চূড়ান্ত সংগ্রাম ক্ষেত্র! কাল্পিকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের আমৃত্যু লড়তে হবে। যমুনার জল এনে একটি সুবৃহৎ তাম্রকুণ্ডে রক্ষিত হল। সেই জল অঞ্জলিপূর্ণ করে সামরিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ ফৌজ শপথ গ্রহণ করলেন—

'জান্‌সে কাল্পি নহী ছোড়েঙ্গে।
আজাদ শাহীকো মিট্টি (কবর) নহী ডালেঙ্গে।।'

শপথ গ্রহণ করবার পর ২২শে মে তাঁরা সকলে স্থির করলেন যে, কাল্পি থেকে তাঁরা গোলাওলী ধ্বংস করতে যাবেন।

'কঁহা চলে গোলী, চলি গোলাওলী, গোলে গোলীসে মারু
ফিরঙ্গা ফৌজ—।
কঁহা হিম্মৎ অধুর, কঁহা তেলঙ্গা শূর, কঁহা চোট্‌সে ভাগ্‌রহে
হিউরোজ।।'

এদিকে ভারতীয় ছাউনির বিস্তারিত খবর সংগ্রহ করে ২১শে মে রাত্রেই হিউরোজ সমগ্র যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন। তিনি সেনাবাহিনীর Right Flank-কে কাল্পির দক্ষিণ-পূর্বে অর্থাৎ কাল্পি ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী গিরিবর্ত্ম অঞ্চলে সংস্থাপন করলেন। এই গিরিবর্ত্ম ও খাতগুলির মধ্যে সুরাওলী ও গোলাওলী গ্রাম অবস্থিত।

ইংরেজ পক্ষের Right Flank-এর কিছু সৈন্য গিরিখাতমালার মুখোমুখি রাখা হল। তাতে বামভাগ থেকে কাল্পি আক্রমণের পথ খোলা রইল।

ইংরেজ পক্ষে Right Flank প্রথম ব্রিগেডের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। প্রথম ব্রিগেডের অবশিষ্ট, দ্বিতীয় ব্রিগেড এবং Hyderabad Field Force-এর সেনাবাহিনী গোলাওলী থেকে কাল্পি-জালালপুর রোডের উপর অবস্থিত মালভূমি জুড়ে আটটি ব্যাটারীতে বিভক্ত হয়ে রইল। অগ্রবর্তী শান্ত্রীদের মধ্যে যে পিকেট সৈন্যদলকে গিরিখাতে সন্নিবেশ করা হয়েছিল তারা গোটা প্রাঙ্গনটি পাহারা দিতে লাগল।

সমগ্র Left Flank-এ Siege gun ১৭ পাউণ্ডার ও ২৪

পাউণ্ডার কামান, হাউইট্‌জার, উষ্ট্রবাহিনী এবং অবশিষ্ট সেনাদল রাখা হল।

ভারতীয় পক্ষে গতরাত্রের মতদ্বৈধতার পর ঝাঁসীর রাণী সমগ্র সওয়ার বাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যুক্ত সম্মতিক্রমে বান্দার নবাবও তাঁর স্বীয় নয় হাজার সৈন্যের ভার নেন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় রাওসাহেবের ব্যক্তিগত আপত্তি থাকার দরুন গভীর রাত অবধি তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। বান্দার নবাবের সৈন্যদলের মধ্যে যথাক্রমে সওয়ার পদাতিক গোলন্দাজ ইত্যাদি নানা বিভাগ ছিল। প্রত্যেকটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সর্দার ও অধিনায়কের পদে বিভিন্ন যোগ্যব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। তুইদিনের মধ্যে সেই ব্যবস্থা ওলটপালট করে দিয়ে বান্দার নবাবের সৈন্যকে রাওসাহেবের অধীনে বা গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের ভার রাওসাহেব ব্যতীত অন্য কাহারও ওপর অর্পণ করার যুক্তিহীনতা সম্বন্ধে একমত হয়ে রাত বারটার সময় সভাভঙ্গ করলেন রাণী। নয়া পরিকল্পনার বিবরণ সেই রাতেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু যুদ্ধের প্রাক্কালে নেতৃবৃন্দের মধ্যে এইরূপ মতদ্বৈধতার জন্য যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে রাণী বিশেষ সংশয়াপন্ন হলেন।

২২শে মে'র যুদ্ধে গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের বিভিন্ন সৈন্যদলের নায়করা নিজ নিজ দলের নেতৃত্ব করেছিলেন। কিন্তু বিলিতি সামরিক প্রথায় সুশিক্ষিত এই সৈন্য দলটিকে দীর্ঘদিন কাল্পিতে বসিয়ে না রেখে নিয়মিত সামরিক ড্রিল ও প্যারেড করালে উপকার হত,—বান্দার নবাবের এই মন্তব্যে আবার মনক্ষুণ্ণ হলেন রাওসাহেব।

যা হোক, হিউরোজের Right Flank-এর পার্শ্ববর্তী গিরিখাত-গুলির মধ্যে নিজের অধীনস্থ চার হাজার সওয়ার ও তুই হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে রাণী আত্মগোপন করে রইলেন। প্রথম সারিতে বন্দুকধারী পদাতিক সৈন্য দ্বিতীয় সারিতে বন্দুকধারী সওয়ার, তৃতীয় সারিতে তলোয়ারধারী পদাতিক ও চতুর্থ সারিতে তলোয়ারধারী সওয়ার শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখা হল। রাণী নিজে যদিও বন্দুক চালাতেন তবু যুদ্ধকালে তিনি তলোয়ারই

ব্যবহার করতেন। কোমরে একটি পাস্‌খুব ও পিস্তল সর্বদাই সঙ্গে থাকত তাঁর।

বাণপুর ও শাহ্‌গড়ের রাজা রাণীর অধীনে থেকে যুদ্ধ করা অধিকতর সম্মানজনক বলে মনে করলেন। রঘুনাথসিং, গুলমুহাম্মদ, কাশী এবং রাণীকে সর্বপ্রথম যাদের ভার দেওয়া হয়েছিল, সেই 5th Bengal Irregular Cavalry-র লালকুর্তাধারী আফঘানী আড়াইশ' সওয়ার রাণীর সঙ্গে রইল।

পরিকল্পনা হল, বান্দার নবাব ও রাওসাহেব সমগ্র বাহিনীটিকে দুইভাগে ভাগ করে হিউরোজের Right Flank-এর বামদিকে ও Left Centre (তেহ্‌রী গ্রামের সামনে) আক্রমণ করবেন। যুক্তি এই যে, Left Centre আক্রান্ত হলেই Right Centre তার সাহায্যার্থে আসবে এবং Right Flank-এর বাম দিক আক্রান্ত হলে স্বভাবতঃই দক্ষিণদিক থেকে ব্রিগেডিয়ার Steuart তাঁর সমস্ত পিকেট সৈন্য বামদিকে সরিয়ে নেবেন। ইত্যবসরে গিরিখাতগুলির ভেতর থেকে রাণীর অধীনস্থ সমগ্র বাহিনী অতর্কিতে ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করবে। যুগপৎ দুইদিক থেকে আক্রান্ত হলে হিউরোজ বিপর্যস্ত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হবেন।

সুষ্ঠু সামরিক পরিকল্পনার দিক থেকে সেদিনকার দেশীয় সামরিক নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

প্রথম বাজীরাও পেশবার রূপসী মুসলমানী পত্নী মস্তানীর পুত্র শমশের বাহাদুরের বংশোদ্ভূত নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা বান্দার নবাব ২২শে মে সকালে উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী জালালপুর-কাল্পি রোডের ওপর দিয়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর Right Flank-এর বামদিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তাঁর সৈন্য পরিচালনার পদ্ধতি দেখে শঙ্কিত হলেন হিউরোজ। তাঁর Right Flank-এর দক্ষিণ পার্শ্বের গিরিখাতগুলির নীরবতা দেখে সকাল ৮-৪৫ মিনিটে ব্রিগেডিয়ার Steuart হিউরোজকে জানালেন—

> 'Right no longer threatened. Proceed with operations.'

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর Right Flankটি পরিচালনা করছিলেন

বান্দার নবাব। ৬টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন ও Horse Artillery সমেত তিনি জালালপুর-কাল্পি রোড ধরে তেহ্‌রী গ্রামের সামনে এসে পৌঁছলেন। তখন দেখা গেল তেহ্‌রী গ্রামে হিউরোজের Centre-এর মুখোমুখি গিরিগুহা ও খাতগুলির ভেতর থেকে সাদা ও লাল উর্দি পরিহিত গোয়ালিয়ার কন্টিনজেন্টের সওয়াররা বেরিয়ে আসছে।

হিউরোজ লেঃ কর্নেল গল ও ক্যাপ্টেন এ্যাবটকে 14th Light Dragoon ও 3rd Hyderabad Cavalry নিয়ে তৎক্ষণাৎ এই ভারতীয় বাহিনীকে আক্রমণ করতে হুকুম দিলেন।

হিউরোজের ধারণা বদ্ধমূল হল যে, তার দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করাই হচ্ছে শত্রু সৈন্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

> 'I felt the conviction, that the enemy's real object of attack was my right; and that this ostentatious display of force against my left and the perfect stillness in the deep ravines on my right, were *ruses* to mislead me.' (Military Despatch—H. Rose).

গল ও এ্যাবটকে নির্দেশ দেবার উদ্দেশ্য সার্থক হল। সহসা Siege gun, Heavy gun, ও Horse Artillery দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে বান্দার নবাবের ফৌজ প্রথম খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। এই ক্ষণস্থায়ী বিভ্রান্তির সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ ফৌজ জোর আক্রমণ চালায়। ফলে ভারতীয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হল। বান্দার নবাব অতঃপর সেই অবস্থা সামলে নিয়ে ব্রিটিশ ফৌজের বন্দুকের পাল্লা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সেই যুদ্ধে নিহত হলেন 5th Bengal Irregular Cavalry-র Commanding Officer। উক্ত Cavalry তখন ঝাঁসীর রাণীর অধীনে থাকার দরুন তিনি নিজে বান্দার নবাবের একটি Cavalry Troop পরিচালনা করছিলেন। প্রথমে তাঁর ঘোড়ার পায়ে গুলী লাগে। ঘোড়া পড়ে গেলে তাঁর কপালে গুলী লাগে।

হিউরোজের প্রথম নির্দেশটি দেবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, Right Flank-এর পাশের গিরিখাতগুলিতে শত্রুসৈন্য মোতায়েন আছে কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া। তাঁর নিজের ভাষায়,—

'শত্রু আমার Right Flank-এর সামনে গিরিখাতে আত্মগোপন করে রয়েছে বলে আমি নিশ্চিত হলাম। আমি 3rd European-দের একটি Company-কে আমার Out post-এর সামনে কয়েকশ' গজ এগিয়ে গিয়ে তাদের মোর্চার মধ্যে পড়তে আদেশ দিলাম। 3rd European সৈন্যদল আমার নির্দেশ মতো কিছুদূর এগোতেই দেখতে পেল বিদ্রোহীরা গিরিখাতের মধ্যে ওঁত পেতে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল—যমুনার তীর থেকে তেহ্‌রী পর্যন্ত। গোলাগুলী, সুরাগুলী কিছুই বাদ গেল না। সমস্ত গিরিখাতগুলি যেন আগুন, ধোঁয়া, আওয়াজ ও বিস্ফোরণে ফেটে পড়ল। সিপাহী সওয়াররা তাদের গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে দলে দলে সুশৃঙ্খলভাবে গুলী করতে করতে অগ্রসর হতে লাগল।

তাদের পেছনে যতদূর চোখ যায় দেখা গেল শুধু বিদ্রোহী আর বিদ্রোহী।

আমি যখন আমার Centre-এর ওপর এই দৃঢ়সঙ্কল্প আক্রমণের পদ্ধতি লক্ষ্য করছি, এমন সময় মনে হল আমার ডানদিকে গোলার আওয়াজ ও গুলীর "খট্‌খট্" শব্দ যেন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে, আর শত্রু পক্ষের গোলাগুলীর শব্দগুলি ক্রমশঃ পর্দায় পর্দায় বেড়ে চলেছে। তৎক্ষণাৎ ব্রিঃ Steuart-কে আমি খবর পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কি গোটা Camel Corps-এর কিংবা তার অর্ধেক বাহিনীর সাহায্য চান? Steuart উত্তরে জানালেন, সামরিক সাহায্য পেলে তিনি অত্যন্ত আশ্বস্ত বোধ করবেন। আমার দক্ষিণভাগ অর্থাৎ আমার প্রধান বাহিনীর অবস্থা বিপন্ন জেনেও আমি নিজে মেজর রস্ (Ross)-এর অধীনস্থ উষ্ট্রবাহিনী নিয়ে Steuart-এর সাহায্যে চললাম। পথে দেখি ব্রিঃ Steuart-এর আর্দালি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমার কাছে সাহায্যের জন্য আসছে। ততক্ষণে কিন্তু শত্রুপক্ষের কামানের আওয়াজ আমাদের মোর্চার ভেতর থেকে ফেটে পড়ছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখলাম ব্রিঃ Steuart-এর অবস্থা একান্ত সঙ্কটাপন্ন। সুশৃঙ্খল শত্রুবাহিনী বন্দুক থেকে বারিধারাসম গুলী বর্ষণ করতে করতে গিরিখাতগুলিতে ঢুকবার গলিপথ থেকে আমাদের কামান ব্যাটারীর প্রায় ভেতরে এসে পড়েছে। তখন আমার পক্ষের সমস্তগুলি ঘোড়াই হয় নিহত, নয় গুরুতররূপে আহত। ব্রিঃ Steuart-এর ঘোড়ার পাত্তা নেই। তিনি মাটিতে

দাঁড়িয়ে। অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ গোলন্দাজদের নির্দেশ দিচ্ছেন আর নিজে তলোয়ার বের করে আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হচ্ছেন। তাঁর সমস্ত ফৌজই প্রায় ধরাশায়ী। কামানগুলি একেবারে নীরব। ভারতীয় সিপাহীরা উল্লাসের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলছে, 'ঝাঁসী লুঠ করে আবার কাল্পি লুঠতে এসেছ? এস, এইবার দেখে নেব।' সেই সময় আমি Camel Corps-এর সাতশ' সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহীদের তাড়া করলাম।'

সেদিন ব্রিঃ Steuart বনাম ঝাঁসীর রাণীর ব্যক্তিগত পরিচালনাধীন এই যুদ্ধের সম্বন্ধে পরে Thomas Lowe লিখেছিলেন, "The Camel Corps had saved the British Prestige on that day."

বান্দার নবাবের ও রাওসাহেবের সেনাদল যখন রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ল এবং রাণী যখন গিরিখাত থেকে সসৈন্যে বেরিয়ে এলেন, তখন ছত্রভঙ্গ ভারতীয় বাহিনীর কিছু কিছু অংশ রাণীর সঙ্গে যোগ দিল। রাণীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি ভারতীয় ফৌজের মনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করল। ব্রিঃ Steuart-এর সমস্ত Right Flankটিকে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত করলেন এবং তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত লড়াইয়ে ব্রিঃ Stuart-এর ঘোড়া নিহত হল। রাণী অসমসাহসের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে সাদা ঘোড়ার পিঠে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। নীল চন্দেরীর পাগড়ী কখন যে পড়ে গিয়েছে খেয়াল নেই। রাণীর মাথায় লোহার জালের শিরস্ত্রাণ ঝল্‌মল্ করছে। গলার মুক্তোর কণ্ঠী দোল খেয়ে উঠছে নামছে এবং বারবার অসীম উৎসাহ সঞ্চার করে তিনি ভারতীয় ফৌজদের বরাভয় দিচ্ছেন "হর হর মহাদেব"। তাঁর সেই রণচণ্ডী মূর্তি দেখে বিস্ময়ে ব্রিটিশ গোলন্দাজরা গোলাবর্ষণ করতে ভুলে গেল। তাঁর মনের উদ্দীপনা বিদ্যুতের মতো সঞ্চারিত হল সমগ্র ভারতীয় ফৌজের মধ্যে। এমন সময় হিউরোজ দ্রুতবেগে সেখানে উষ্ট্রবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন। ধরে নেওয়া যায় মাত্র একশ' গজের তফাতে রাণীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। নিজের অজ্ঞাতে হিউরোজের চোখে সেদিন নিশ্চয় প্রশংসা ফুটে উঠেছিল। দু'জনের ভাষা দু'জনের কাছে দুর্বোধ্য, কিন্তু দু'খানি তলোয়ারই ইস্পাতের,—যোগ্য হাতে পড়লে

তারা এক ভাষাতেই কথা কয়। ততক্ষণে মেজর রস রাণীকে চতুর্দিক থেকে সুকৌশলে পরিবেষ্টন করে এনেছেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ 'আড়াইশ' আফঘান সওয়ার রাণীকে সেই বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। হিউরোজের ব্যক্তিগত নেতৃত্বে উষ্ট্রবাহিনী রাণীর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করল। ফলে গিরিখাতের মধ্যে পলায়নপর বহু ভারতীয় সৈন্য ও সওয়ার নিহত ও আহত হলেন। সেদিন আহত ভারতীয় সৈন্যকে বেয়নেট দিয়ে হত্যা করে নাম কিনলেন লেঃ বাক্‌লি (Buckley)।

ওদিকে বান্দার নবাব হিউরোজের Right Centre-কে আক্রমণ করতে গিয়ে লেঃ এডওয়ার্ডস্'-এর (Edwards) সৈন্যদল কর্তৃক পরাজিত হলেন।

লেঃ কর্নেল রবার্টসন, 25th Bombay Native Infantry নিয়ে Left Centre-এ ছিলেন। বান্দার নবাবের সৈন্যরা এডওয়ার্ডস-এর কাছে প্রতিহত হয়ে এইখানে ফিরে এল। তারা বম্বের পদাতিক বাহিনীকে ইংরেজ আনুগত্যের জন্য ধিক্কার দিতে লাগল। জবাবে জোরদার সংঘর্ষ বেধে গেল। রাণীর পরাজয়ের পর বান্দার নবাব যুদ্ধে রবার্টসনকে প্রায় কাবু করে এনেছিলেন। অতএব তিনি রাওসাহেবের আগমন অপেক্ষায় সাহসের সঙ্গে লড়ে যেতে লাগলেন। এদিকে রাওসাহেব কিন্তু তাঁর গোয়ালিয়ার কন্টিনজেন্ট ও অন্যান্য সৈন্যসামন্ত নিয়ে সকাল দশটার পরই পশ্চিম দিকে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। নবাবসাহেব নিরাশ হলেন। ঝাঁসীর রাণী ও বান্দার নবাব বিপৎকালে কোন সশস্ত্র ফৌজের সাহায্য পাননি। সুতরাং বান্দার নবাবও রণে ভঙ্গ দিয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলেন।

২২শে মে'র মলিন সন্ধ্যা সেদিন কাল্পির বিপর্যস্ত সংগ্রামের ওপর কালো যবনিকা টেনে দিল। যমুনার জলে সোনালী ও লাল ছায়া ফেলে সূর্য যখন অস্তাচলে গেল তখন বিজয়ী হিউরোজ দেখতে পেলেন পশ্চিমদিকে জালৌনের পথে ভারতীয় সৈন্যরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছে।

২২শে মে'র যুদ্ধ চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়াতে ভগ্ন হৃদয় ঝাঁসীর রাণী আর কাল্পিতে ফিরলেন না। পশ্চিমদিকে

অগ্রসর হয়ে তিনি পরস্পর বিবদমান রাওসাহেব ও তাঁর সর্দারদের সন্ধান পেলেন। রাওসাহেবের নেতৃত্বের চূড়ান্ত ব্যর্থতা যে রাণীর ও নবাবসাহেবের পরাজয়ের অন্যতম কারণ সে কথা নিয়েও তাঁদের মধ্যে বাক বিনিময় হল। রাণী শুধু বললেন, "নিজের হাতে ব্রিটিশকে কাল্পি ছেড়ে দিয়ে এলাম।" শোনা যায় কাল্পিতে এমন করে সব ফেলে দিয়ে নিঃসম্বল হয়ে ফিরেছিলেন রাণী যে, সেদিন তাঁকে গাছের তলায় রাত কাটাতে হয়েছিল। বাণপুরের রাজা ও শাহগড়ের রাজার সম্বন্ধে কাল্পির যুদ্ধের পর আর কিছু জানা যায়নি। হয় তাঁরা পলাতক বা নিহত কিংবা বন্দী হয়েছিলেন। এই দু'জন বুন্দেলা সামন্ত সর্দারের সংগ্রামী জীবনের পরবর্তী অধ্যায় অজ্ঞাত আঁধারে বিলুপ্ত।

বান্দার নবাব পূর্বের মতো এবারও দুঃসাহসের পরিচয় দিলেন। ২২শে মে'র সন্ধ্যায় তিনি আবার কাল্পি ফিরে গেলেন এবং সমস্ত ভারতীয় সেনাদের রাতারাতি পশ্চিমদিকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। কাল্পির সুবিপুল সামরিক ভাণ্ডার অব্যবহৃত পড়ে রইল।

অবশিষ্ট সওয়ার ও পদাতিকদের নিয়ে কাল্পি পরিত্যাগ করে যেতে যেতে ভোর হয়ে গেল নবাব সাহেবের।

হিউরোজ ২২শে মে চিন্তা করে দেখলেন রণনীতি ও আক্রমণের কলাকৌশলে কৃতিত্ব দেখিয়েছে ভারতীয়রা। তবুও আজকের যুদ্ধই হবে চূড়ান্ত যুদ্ধ। পরাজিত করতে হবে ভারতীয়দের। অতএব ২৩শে মে অতি প্রত্যূষে কাল্পি আক্রমণ করা সবদিক থেকে শ্রেয় বিবেচনা করলেন হিউরোজ।

২৩শে মে প্রত্যূষে সূর্য ওঠবার অনেক আগে হিউরোজ একটি বাহিনী নিয়ে জালালপুর-কাল্পি রোড দিয়ে অগ্রসর হলেন। ব্রিগেডিয়ার Steuart যমুনার উপকূলস্থ গিরিখাতগুলির পাশ দিয়ে অপর একটি বাহিনী নিয়ে চললেন কাল্পি অভিমুখে। হঠাৎ তাঁদের দৃষ্টিগোচর হল, কাল্পির উত্তর-পশ্চিম পথে হাতী, ঘোড়া ও পদাতিক সৈন্য সম্বলিত একটি ভারতীয় বাহিনী এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে H. M. S' 14th Light Dragoon নিয়ে মেজর গল্ বান্দার নবাবকে আক্রমণ করলেন। বান্দার নবাবের সঙ্গে ছিল দশটি কামান। সেগুলি পরিত্যাগ করে তিনি

সদলবলে পলায়ন করলেন। ছয়টি হাতী এবং কামানগুলি মেজর গলের হস্তগত হল।

২৩শে মে বেলা দশটার সময় হিউরোজ তাঁর উভয় ব্রিগেড-সহ বিজয়গর্বে কাল্পিতে প্রবেশ করলেন।

কাল্পিতে পথে পথে কুকুর ও শেয়াল নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সমগ্র শহর জনশূন্য ও নীরব। সেই নীরবতা দেখে প্রথমে হিউরোজ সন্দিহান হলেন। তারপরে বুঝলেন ভারতীয় বাহিনী গত রাত্রিতে কাল্পি পরিত্যাগ করেছে। কাল্পির সুবিপুল সামরিক ভাণ্ডার হিউরোজের হস্তগত হল। গত এক বছর ধরে তাঁতিয়া টোপী এই ভাণ্ডারে নানাবিধ সামরিক সরঞ্জাম মজুত করেছিলেন। অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তেইশটি কামানও পেলেন হিউরোজ। এই বিপুল রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, তাঁবু ও গোলাবারুদ পেয়ে পরম লাভবান হল ব্রিটিশ ফৌজ।

ক্যানিং মধ্যভারত অভিযানের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কাল্পি অধিকারের পর তা সম্পূর্ণ হয়েছে বলে এতদিনে হিউরোজ নিশ্চিন্ত বোধ করলেন। দীর্ঘ পাঁচমাস ধরে ভারতবর্ষের অন্যতম উষ্ণ অঞ্চলে অবিশ্রান্ত অভিযান চালিয়ে তাঁর বাহিনীর অবস্থা একান্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেও ক্লান্ত। পাহাড়ের ঠাণ্ডায় ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনায় হিউরোজ তাঁর চিকিৎসকের পরামর্শ মতো ছুটির দরখাস্ত দাখিল করলেন। ১৮৫৮ সালের ১লা জুন, তিনি তাঁর সমগ্র ফৌজের প্রতি বিদায়বাণী প্রচার করলেন। জানালেন, ব্রিটিশ এলাকা ভারতীয় বিদ্রোহীদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য তারা যে বীরত্ব দেখিয়েছে, যে কষ্ট স্বীকার করেছে তার তুলনা নেই। ভাল ভাল কথায় বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেন হিউরোজ।

মধ্যভারতে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়েছে, বিদ্রোহী নেতারা বিপর্যস্ত, ভগ্নোদ্যম। অর্থ, সামর্থ্য, সৈন্য, ঘোড়া, কামান, সামরিক সরঞ্জাম, সব দিকেই তাঁরা নিঃস্ব। অতএব এবার স্বচ্ছন্দে ছুটি নেওয়া যেতে পারে।

পুণাতে সমস্ত দিন বিশ্রাম, সন্ধ্যায় ক্লাবে বিলিয়র্ড খেলা ও ইংরেজী বাজনা শোনার সুখকল্পনায় যখন হিউরোজ বিভোর তখন

প্রতিকারে পন্থাও বিপজ্জনক হতে বাধ্য। তা প্রথম অবস্থায়, এ পন্থা যতই বিপজ্জনক মনে হোক তাদের মধ্যে কেবলমাত্র একজনের উর্বর মস্তিষ্ক থেকেই এর উদ্ভব হয়েছিল। কিন্তু নেতৃবৃন্দের পূর্ববর্তী কার্যকলাপ থেকে বিচার করে আমরা রাওসাহেব ও বান্দার নবাবকে এককথাতেই বাদ দিতে পারি। অমন বৃহৎ ও দুঃসাহসী পরিকল্পনা গঠন করবার মতো মানসিক সংগঠন বা প্রতিভা কিছুই তাঁদের ছিল না। বাকী দু'জনের মধ্যে তাঁতিয়া টোপীকেও বাদ দেওয়া চলে। তিনি যে পরিকল্পনা প্রণয়নে অক্ষম ছিলেন তা নয়। তাঁর যে জবানবন্দী আমরা পাই তা থেকেই জানতে পারি যে, তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত সবচেয়ে সার্থক ও গৌরবময় এই কাজটির জন্য তিনি নিজে কোন কৃতিত্বই দাবি করেননি। মহৎ কীর্তি স্থাপনের পক্ষে যে প্রতিভা, শৌর্য ও দুঃসাহস অপরিহার্য তা কেবলমাত্র চতুর্থ ব্যক্তিরই ছিল। তিনি ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহা আর যথা সময়ে প্রচণ্ড আঘাত করবার দৃঢ় সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তার সম্মুখে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি আশা করেছিলেন প্রথম আঘাতটি সার্থক হলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গিয়ে ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে। রাওসাহেবের ওপর তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, গোপালপুরে বিদ্রোহীরা যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং যে পন্থা গ্রহণ করে তাকে কার্যকরী করতে স্থিরসঙ্কল্প হয়েছিলেন তার উদ্ভাবক ঝাঁসীর রাণী। তিনিই তাঁর সঙ্গীদের ওপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন।'

কার্যকালে বান্দার নবাব একদিন বাদে গোপালপুরে উপস্থিত হলেন। আহত সৈন্যদের রক্ষণাবেক্ষণ করে অবশিষ্ট বাহিনীকে গ্রাম-বাসীদের সহায়তায় বিপদের এলাকা পেরিয়ে নিরাপদ অঞ্চলে নিয়ে আসতে তাঁর একদিন দেরি হয়।

তাঁতিয়া টোপী আত্মধিক্কারের লজ্জায় অধোবদন হয়ে বসে রইলেন। কিছু বলবার মুখ তাঁর ছিল না। রাওসাহেব, রাণী এবং বান্দার নবাবের ওপর কাল্পির ভার ছেড়ে চলে আসার দরুন নিজ দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়েছেন, সে কথা তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে না বললেও তিনি অনুভব করতে পারলেন। ঝাঁসীর রাণীর নিকট তিনি নিজেকে সবচেয়ে অপরাধী বোধ করলেন। অথচ অপরাধ

স্বীকার করতে তাঁর অহমিকায় বাধল। সঙ্গীদের নী[illegible]
তিনি তিরস্কার বলে মানলেন এবং চুপ করে রইলেন।

রাণীর অবস্থা তখন সবচেয়ে সঙ্গীন। ধরা পড়লে সপুত্র তাঁর অবস্থা যে কি হবে তা তিনি ভাল করেই বুঝেছিলেন। সেই শোচনীয় পরিণতির জন্য নিশ্চেষ্টভাবে অপেক্ষা করবার চেয়ে যুদ্ধই তিনি শ্রেয় বলে মনে করলেন। কিন্তু যুদ্ধ তিনি কোন ভরসায় করবেন? কাল্পির পর সমরায়োজনে সুসজ্জিত অন্য ঘাঁটি আর কোথায়? সৈন্য, অর্থ, রসদ, কেল্লা কিছুই তো নেই। সহসা এক অসম্ভব আশায় উদ্দীপিত হল তাঁর মন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভূমিতে দৃষ্টি নিবিষ্ট করে তিনি ক্ষণকাল ভাবলেন। তারপর সঙ্গীদের কাছে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, মধ্যভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহারাষ্ট্রীয় নগরী গোয়ালিয়ার অধিকার করতে হবে। এই প্রস্তাব করা মাত্র রাওসাহেব ও বান্দার নবাব বললেন,—তা হতে পারে না। এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁতিয়ার কাছে রাণীর প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত অর্থ নিমেষেই উদ্ঘাটিত হল। তিনি বুঝলেন, সিন্ধিয়া জয়াজীরাওকে দলে টানা সম্ভব হোক বা না হোক, ফৌজী ছাউনিকে হাত করে গোয়ালিয়ার থেকে সৈন্য-সামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, হাতি ঘোড়া, অর্থ সংগ্রহ করে যদি দক্ষিণদিকে চলে যাওয়া যায়, তাহলে মহারাষ্ট্রে ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান গড়ে তোলা সম্ভবপর। সামনে বর্ষা সমাগত। পার্বত্য নদীগুলি দুরতিক্রম্য হয়ে ব্রিটিশ ফৌজকে বাধা দেবে। বর্ষার দুই মাস ব্রিটিশ ফৌজ যখন অপেক্ষা করতে বাধ্য হবে, তখন মহারাষ্ট্রের দুর্গম পর্বত ও জঙ্গলে তাঁদের বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে। মহারাষ্ট্রের পর্বতের ঝরনা ও নদীগুলি উত্তাল হয়ে তাঁদের প্রহরীর কাজ করবে। তাঁতিয়া রাণীর প্রস্তাবে রাজী হলেন।

রাণী দীপ্তনেত্রে নেতাদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। সিদ্ধান্ত হল বৃথা কালক্ষয় না করে অনতিবিলম্বে তাঁরা গোয়ালিয়ার যাত্রা করবেন। খবর চলে গেল তাঁদের ভগ্নাবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে। মাঝ-রাতে সিপাহীরা তখন কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে রুটি সেঁকছিল। এই খবর পেয়ে তারাও উল্লসিত হল। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে রাতের আঁধার কাটতে না কাটতে ঝড়ের গতিতে ভারতীয় বাহিনী

গোয়ালিয়ারের পথে রওনা দিল। ভোরবেলা মধু, দুধ, আটা, কাঠ আর গুড় যোগান দিতে এসেছিল যে গ্রামবাসীরা তারা দেখল পোড়া কাঠের গুঁড়ি আর ছাই পড়ে রয়েছে। স্থানটি জনশূন্য ও নীরব। তারা অবাক মানল মনে মনে। ওদিকে ভারতীয় বাহিনী তখন নতুন উদ্যমে ঘোড়ার খুরে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে ছুটে চলেছে। যে বুড়ো সিপাহীর এক পায়ে চোট লেগেছে, সেও পিছিয়ে নেই।

কাল্পি অধিকারের পর লেঃ কর্নেল রবার্টসনকে ভারতীয় সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবনকারী বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল।

তিনি প্রথমে হিউরোজকে জানান যে, ভারতীয়রা চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় তাঁবু, কামান, সব ফেলে রেখে শেরঘাটির দিকে চলে যাচ্ছে। কাল্পির চল্লিশ মাইল উত্তর পূর্বে জালৌনের পথে যমুনার ওপর শেরঘাটি। তারপরে হঠাৎ সংবাদ এল ভারতীয়রা জালৌন ছেড়ে আরও পশ্চিম দিকে হটে যাচ্ছে। রবার্ট হ্যামিল্টন এই খবরে বিস্মিত হলেন। কেননা তিনি ধরে নিয়েছিলেন শেরঘাটি বা তারও পশ্চিমে জগরমানপুরের ঘাট পেরিয়ে যমুনার ও-পারে অযোধ্যায় যাবেন ভারতীয় নেতারা।

হিউরোজ শঙ্কিত হয়ে রবার্টসনের নিকট H. M.'s 86th Regiment-এর একটি Wing ও H. M's 14th Light Dragoons-এর দুটি Squadron পাঠিয়ে দিলেন। রবার্টসন সাধ্যমতো ভারতীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে বেরিলীর রহিম আলী নারুত-এর নেতৃত্বে ৮০০ Oudh Cavalry ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। রবার্টসন জানালেন যে, ভারতীয়রা অবিরাম পশ্চিম দিকেই এগিয়ে চলেছেন।

জালৌন থেকে পাহুজ ও সিন্ধিয়া নদী পর্যন্ত গিয়ে রবার্টসন রামপুরার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয়দের গতিবিধি জেনে শঙ্কিত হয়ে হিউরোজকে এক্সপ্রেস্-এ জানালেন যে, ভারতীয়রা গোয়ালিয়ার রোড ধরে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে। তাঁদের সৈন্যসংখ্যাও বেড়ে গিয়েছে। পথের কোন গ্রামে খাবার মিলছে না। ভারতীয় বাহিনী সব খাবার কিনে নিয়ে গিয়েছে। আর গ্রামবাসীরা ভারতীয়দের সম্বন্ধে একটি কথাও বলছে না।

রবার্টসন প্রেরিত এই সংবাদ কর্তাব্যক্তিরা কেউ বিশ্বাসই

করলেন না। কিন্তু ইতিমধ্যে রবার্ট হ্যামিল্টনের নিকটও যখন একই মর্মে খবর পৌঁছল তখন হিউরোজ ব্রিগেডিয়ার Stuart-কে সম্পূর্ণ প্রথম ব্রিগেডসহ ভারতীয়দের অনুসরণ করতে আদেশ দিলেন। রবার্টসনের সঙ্গে যোগ দিয়ে গোয়ালিয়ারের পথে অগ্রসর হবেন ব্রিঃ স্টুয়ার্ট। অজানিত আশঙ্কায় চঞ্চল হল হিউরোজের চিত্ত। একেবারে ভেঙেচুরে নিঃশেষ হয়ে গিয়েও আবার কি করে সংগঠিত হল ভারতীয় বাহিনী সেই হল তাঁর একমাত্র প্রশ্ন।

সেদিন অর্থ ও প্রতিপত্তিতে হায়দ্রাবাদের নিজামের পরেই গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়ার স্থান। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মাঝখানে মধ্যভারতের মধ্যমণি গোয়ালিয়ার। সেদিন গোয়ালিয়ার ছিল আগ্রার পঁয়ষট্টি মাইল দক্ষিণে ও ঝাঁসীর আশী মাইল উত্তরে (আজ রেলপথ অনুসারে গোয়ালিয়ার ও আগ্রার দূরত্ব বাহাত্তর মাইল ও ঝাঁসী-গোয়ালিয়ারের দূরত্ব বাষট্টি মাইল)। অসমতল ভূ-পৃষ্ঠের ওপর তিনশ' ফিট উঁচু একটি নাতিউচ্চ সমপৃষ্ঠ পাহাড়ের ওপর গোয়ালিয়ারের কেল্লা সেদিন বহুদূর থেকে স্বপ্নপুরীর মতো মনে হত।

জৈন ও হিন্দু ভাস্কর্যে সুশোভিত সুন্দর গোয়ালিয়ার দুর্গটি ছিল অসংখ্য প্রাসাদ, জলাধার, কৃষিক্ষেত্র, ফুলবাগান ও বিশাল প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দুর্গের পায়ের কাছে গোয়ালিয়ার শহর

সাতটি সুরক্ষিত দরোজা দিয়ে দুর্গে আরোহণের খাড়াপথ উঠে গিয়েছে। সেখানে উঠতে গেলে আজও কৌতূহলী পর্যটকের কানে জলের কলকল শব্দ ভেসে আসে। পাশে বয়ে চলেছে ঠাণ্ডা কালো জলের ঢাকা নালা। কোথায় তার উৎস, কেমন করে শতাব্দীর পর শতাব্দীর আক্রমণ এড়িয়ে আজও তৃষ্ণার্তের প্রয়োজনে ভূতল থেকে উৎসারিত হচ্ছে তার প্রস্রবণ কে তা বলবে! কখনও হাজার রঙের বর্ণালী ছড়িয়ে ময়ূরের দল উড়ে যায়। রাতে কালো প্যান্থার পরিত্যক্ত প্রাসাদগুলির মহলের ডেরা থেকে বেরিয়ে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। অপরূপ ভাস্কর্য সুশোভিত 'শাসবাহু' (সহস্রবাহু) ও 'তেলী' (ত্রৈলঙ্গ) মন্দির দর্শকজনের নয়নকে আনন্দ দেয়। সুউচ্চ দুর্গের ওপর একটি জলাশয় আছে। গোয়ালিয়ার দুর্গ সত্যিই জনতার কোলাহল থেকে সুদূরে অবস্থিত একটি সুন্দর জায়গা। এই দুর্গের জন্য গোয়ালিয়ারকে বলা হত "Gibralter of the East".

একদা গোয়ালিয়ারকে বলা হত হিন্দুস্থানের কণ্ঠহারের মধ্য-মণি।— Pearl in the necklace of Hind. রাজা মানসিংহ তাঁর গ্রাম্য প্রণয়িনী মৃগনয়নার জন্য নির্মাণ করিয়েছিলেন যে গুজারী মহল আজও তার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দর্শকের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সেই গুজারী মেয়ের সৌন্দর্যের খ্যাতিতে রচিত রাসো আজও ঘরে ঘরে গীত হয়। আকবরের সভার সঙ্গীতগুরু মিঞা তানসেনের জন্মভূমিও গোয়ালিয়ার। গোয়ালিয়ার শহরের অনতিদূরবর্তী তাঁর মক্‌বরা আজও সঙ্গীত সাধকদের তীর্থস্থান। সেই অমর কণ্ঠ আজ নীরব। তাঁর স্বরচিত রাগরাগিণীর নব নব রূপ সেই ললিত কণ্ঠে আর কোনদিন মূর্ত হবে না, তাঁর নির্জন ধ্যানে প্রসন্ন হয়ে ধরা দিতে আসবেন না টৌড়ি মল্লার অথবা অন্য কোন রাগরাগিণী। তাঁর স্মৃতি বহন করে গোয়ালিয়ার শহর গৌরবান্বিত। আর এই গোয়ালিয়ারের দুর্গেই নিহত হয়েছিলেন শাহ্‌জাহানের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদবক্স। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদারচেতা লোকপ্রিয় দারাশুকোর বিরুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর পতন ঘটাতে সাহায্য করেছিলেন মুরাদ স্বীয় স্বার্থের লোভে। কিন্তু বিচার মাপা থাকে অন্যত্র। দুষ্কৃতকারীর ক্ষমা নেই দুনিয়ার বিচারে।

প্রায়ান্ধকার ভূতলস্থ সেই সঙ্কীর্ণ কারাগৃহে হতভাগ্য মুরাদের দীর্ঘশ্বাস আজও বোধকরি বন্দী হয়ে আছে। কারাবাসের নির্জনতায় তাঁর আত্মানুশোচনা হত কি না কে জানে? সম্ভবতঃ স্নেহশীল জ্যেষ্ঠভ্রাতার মুখচ্ছবি মনে পড়ত তাঁর। হয়ত অনুভব করতেন আগ্রার দুর্গে বন্দী বৃদ্ধপিতা শাহ্‌জাহানের মর্মব্যথা। জীবনের শেষ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখন তাঁর সম্ভবতঃ মনে হয়েছিল রাজসিংহাসন কত নশ্বর! দেড়শ' বছর পরে মুর্শিদাবাদ জাফরাগঞ্জের কোঠায় বন্দী আর এক হতভাগ্য বাঙালী সুবেদারের মতো তিনিও বোধকরি ঘাতককে বলেছিলেন, আমি রাজ্য চাই না, সম্পত্তি চাই না, আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের হিসাবে মুরাদের বেঁচে থাকবার কোন অধিকার ছিল না। অতএব তাঁরই নির্দেশে অবশেষে নিহত হলেন হতভাগ্য মুরাদ।

এমনিধারা বহু ইতিহাস-বিজড়িত গোয়ালিয়ারের ইতিহাসে ১৮৫৮ সালের গৌরবময় অধ্যায়টি যুক্ত হবার আগে সিন্ধিয়াদের সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন।

মহাদাজী সিন্ধিয়া গোয়ালিয়ারের প্রথম খ্যাতনামা মহারাষ্ট্রীয় নায়ক। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার আমলে যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যশিবির ও ছাউনি পড়েছিল দুর্গের পশ্চিমে, তার স্থানীয় নাম লস্কর থেকে দ্রুতগতিতে গড়ে উঠল লস্কর নামে একটি সমৃদ্ধ সুন্দর শহর। লস্করে বাড়ায় প্রবেশের আগে গোরখী (গো-রক্ষী?) প্রাসাদ ছিল। সিন্ধিয়া এটিও ব্যবহার করতেন। এই বিশাল প্রাসাদের একাংশে ছিল একটি কোষাগার বা গঙ্গাজলী। অন্য অংশে ছিল মন্দির ও খাশ-মহল। লস্কর-এর একাংশে কাম্পু বা কাওয়াজ ময়দান। দুর্গ থেকে লস্করে আসবার পথে (বর্তমানে মাঝখানে) ছিল অতি সুন্দর বাগানের ভেতর ফুলবাগ প্রাসাদ ও উদ্যান।

কেল্লার দক্ষিণ দিকে ছয় মাইল দূরে মোরার বা নয়াক্যান্টনমেন্ট। পরে এটি ব্রিটিশ ছাউনিতে পরিণত হয়। মোরার নামে ছোট্ট একটি নদীর নামানুসারে ক্যান্টনমেন্টের নাম হয়েছিল মোরার। গোয়ালিয়ারের পূর্বপ্রান্তে কোটাহ্-কি-সরাই থেকে ফুলবাগ পর্যন্ত সোনেরেখা নালা ছিল। এই নালাটিতে সর্বদাই জল

থাকত। গোয়ালিয়ার শহর একান্ত জনবহুল হয়ে উঠেছিল বলে নতুন শহর লস্করেই ঊনবিংশ শতকে রাজা ও দেওয়ানরা থাকতেন।

১৮৪৩ সালে গোয়ালিয়ারের সিংহাসন খালি রেখে খাজারাও সিন্ধিয়া মারা গেলে তাঁর বিধবা পত্নীর দত্তকপুত্র নাবালক জয়াজী-রাও সিন্ধিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তাঁর বয়স তখন আট।

১৮৫২ সালে জয়াজীরাও-এর সাবালক হতে যখন দু'বছর বাকি, তখন রাজ্যের নবনির্বাচিত তরুণ দেওয়ান দিনকর রঘুনাথ-রাও রাজবাড়ের ওপর ভারত সরকার গোয়ালিয়ারের শাসনভার অর্পণ করলেন। ১৮৫৪ সালে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ফারসন (Macpherson) গোয়ালিয়ারে রেসিডেন্ট হয়ে এলেন। সেই বছরই সাবালক হলেন জয়াজীরাও। জয়াজীরাও সিন্ধিয়ার সম্পর্কে ১৮৫৮ সালে যে-ব্রিটিশ সরকার উচ্ছ্বসিত ছিলেন, ১৮৫৪ সালে তাঁরই সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সুর অন্যরকম ছিল। "Times of India"-র 'শতবর্ষ পূর্বে' শিরোনামায় ১৮৫৬ সালের খবরে বেরিয়েছিল সৈন্যদের বাকি বেতন না দেওয়াতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল একদল সৈন্য এবং পলিটিক্যাল রেসিডেণ্টের কিছু জানবার আগেই জয়াজীরাও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ষোলজনকে গুলী করে হত্যা করেন। তৎকালীন 'টাইম্‌স'-এ জয়াজীরাও-এর এই আচরণ "unprovoked and unnecessary Cruelty" বলে উল্লিখিত হয়েছে। সিন্ধিয়াকে "That impotent and worthless king" বলে সম্ভাষণ করেছে।

গোয়ালিয়ারের মতো বিরাট একটি ভারতীয় রাজ্যকে তাঁবেদার করে রাখাতে স্বার্থ ছিল ব্রিটিশ সরকারের। অল্পবুদ্ধি, দাম্ভিক, স্বল্পশিক্ষিত জয়াজীরাওকে হাতে রাখবার পক্ষে ম্যাক্‌ফারসন এবং দিনকররাও-এর জোট আশানুরূপ ফলপ্রদ হল। জয়াজীরাও-এর শিক্ষা সম্পর্কে সুচারু ভাষায় Forrest বলেছেন—

> 'His education had been nearly confined to the use of his horse, lance, and gun, whence his tastes were purely and passionately military.'

দিনকররাও তাঁর পদের পক্ষে উপযুক্ত লোক ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, স্বল্পভাষী, দূরদর্শী দিনকররাও ও ম্যাক্‌ফারসন সিন্ধিয়াকে রাজকার্যের

সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলেন এবং গোয়ালিয়ারের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সর্বাংশে উন্নত করলেন।

১৮৫৭ সালের জানুয়ারীতে জয়াজীরাও ও দিনকররাওকে নিয়ে ম্যাক্ফারসন কলকাতা এলেন। জয়াজীরাও ও দিনকররাও কলকাতায় স্কুল, কলেজ, ইত্যাদি পরিদর্শন করলেন। হুগলীতে একটি কাপড়ের কল দেখলেন। নির্বাসিত অযোধ্যার নবাবের প্রাসাদ দেখে বিমর্ষচিত্ত হলেন সিন্ধিয়া। ক্যানিং-এর আশ্বাস বাক্যে আবার উল্লসিত হলেন। স্বত্বলোপের ভিত্তিতে রাজ্যাধিকার নীতি আচরিত হয়েছিল নগণ্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে। হায়দ্রাবাদ বা গোয়ালিয়ারের ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণ চিরদিনই গ্রাহ্য হয়েছে। ক্যানিং সিন্ধিয়াকে আশ্বাস দিলেন, অপুত্রক মৃত্যু হলেও তাঁর ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণ ব্রিটিশ সরকার চিরদিনই মানবেন। অযোধ্যার নবাবের দুর্ভাগ্য তাঁর কোনদিন হবে না। নানাভাবে পারস্পরিক মিত্রতা ও আনুগত্যের বন্ধনগুলি দৃঢ় করে এপ্রিল ১৮৫৭ সালে সিন্ধিয়া গোয়ালিয়ারে ফিরে এলেন।

১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের প্রারম্ভে সিন্ধিয়ার নিজের দশ হাজার আর তাছাড়া গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের আট হাজার তিনশ' আঠারজন সৈন্য ছিল। এই কন্টিন্‌জেণ্ট ব্রিটিশ সরকারের অধীনে, সিন্ধিয়ার ব্যয়ে গোয়ালিয়ারে থাকত। গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের অফিসাররা অনেকেই ছিলেন ইংরেজ। সৈন্যরা ছিল Bengal Regiment-এর অন্যান্য সৈন্যদের মতো অযোধ্যা জেলার অধিবাসী। ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের সমতুল্য, শিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সৈন্য তখন আর কোথাও ছিল না।

মীরাট ও দিল্লীর অভ্যুত্থানের পর থেকে গোয়ালিয়ারের ছাউনিতে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠল। জুন, ১৮৫৭ সালে ঝাঁসীতে অভ্যুত্থানের খবর পাওয়ার পর গোয়ালিয়ারে সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হল। ১২ই জুন লেঃ রাইভ্‌স (Ryves) ঝাঁসী থেকে পালিয়ে গোয়ালিয়ার পৌঁছলেন। তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণে নিহতদের সংখ্যা ও ঘটনার বীভৎসতা, আসল কিম্বা নকল সমস্ত বিবরণকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে অবস্থা ক্রমশঃ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সিন্ধিয়া ও দিনকররাও মিলে রেসিডেন্ট ম্যাক্‌ফারসন এবং অন্যান্য ইংরেজ নরনারী শিশুদের শান্ত্রীপাহারা দিয়ে আগ্রা অভিমুখে পাঠালেন। কথা ছিল, চম্বল নদীর ওপারে ঢোলপুরের মিত্র রাজার কাছে তাঁরা আশ্রয় গ্রহণ করবেন। চম্বল নদী পর্যন্ত এসে সিন্ধিয়ার শান্ত্রীরা ফিরে গেল। জাঠসর্দার ঠাকুরবলদেও সিংহ ব্যক্তিগত দায়িত্বে তাঁদের ঢোলপুরে পৌঁছে দিলেন। সেখান থেকে তাঁরা আগ্রায় চলে গেলেন।

জুন ১৮৫৭ সালের পর থেকেই কন্টিন্‌জেন্ট সিন্ধিয়াকে ক্রমাগত চাপ দিতে লাগল যাতে তিনি তাদের নিজের সৈন্যদলভুক্ত করে নিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আগ্রা অভিমুখে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যদিও সিন্ধিয়ার অনুগ্রহে গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেন্টের কোন অসুবিধা ছিল না, তবু সাধারণ সিপাহীদের চিত্তে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। তারা সিন্ধিয়াকে আরও বলল,—রেসিডেন্ট ম্যাক্‌ফারসন তোমার কাছে সাড়ে চার লক্ষ টাকা জমা রেখে গিয়েছেন। সেই টাকা এবং তার ওপর তোমার নিজের থেকে পনের লাখ টাকা দাও, আমরা নিজেরাই একটি বিশাল বাহিনী গঠন করে যুদ্ধে অগ্রসর হই। কন্টিন্‌জেন্টের এই মনোভাব তাঁর নিজের দশ হাজার সৈন্যের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে তাদের বিদ্রোহী করতে পারে এই ভয়ে এবং কন্টিন্‌জেন্ট এখনি যাতে আগ্রা না চলে যায় সেইজন্য সিন্ধিয়া তাদের (কন্টিন্‌জেন্টকে) তিনমাসের বেতন পুরস্কার দিয়ে শীঘ্রই একটি স্বাধীন ভারতীয় বাহিনী গঠন করবার ভূয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবস্থা আপাতত শান্ত হল। আর সিন্ধিয়া অধীর আগ্রহে ব্রিটিশ ফৌজের আগমন পথ চেয়ে রইলেন।

তাঁর দশ হাজার সৈন্য তখন ক্ষেপে গিয়ে কন্টিন্‌জেন্টের অনুরূপ পুরস্কার দাবি করতে লাগল। সিন্ধিয়া মুক্তহস্তে তাদেরও ঘুষ দিতে লাগলেন। রসদ ও যাত্রীবাহী যানবাহনগুলির প্রত্যেকটির চাকা খুলে ফেললেন এবং হাতী ও উটগুলি জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন। আর সৈন্যদের বললেন,—এই বর্ষার সময়টা গেলেই আমি তোমাদের সঙ্গে লড়াইয়ে বেরুব।

১৮৫৭ জুলাই-এর শেষে ও আগস্টের প্রথমে ইন্দোর ও মৌ-

এর বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয়রা যোগ দিয়ে আগ্রার পথে চলেছেন জেনে কন্টিনজেন্টের একাংশ তাঁতিয়া টোপীর সঙ্গে যোগ দিতে চম্বল নদী পার হয়ে চলে গেল। সিন্ধিয়া বর্ষায় স্ফীত চম্বল নদীর ওপর থেকে সমুদয় নৌকা সরিয়ে ফেলে কন্টিনজেন্টের ফিরবার পথ বন্ধ করে দিলেন।

এদিকে তাঁতিয়া টোপী কন্টিনজেন্টের অবশিষ্ট সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ত যোগাযোগ রাখতে লাগলেন। কন্টিনজেন্টের ভারতীয় অফিসার ও সৈন্যরা সিন্ধিয়ার আশ্বাস ও বড় বড় কথার মূল্য যাচাই করবার জন্য সাতই সেপ্টেম্বর তাঁকে শেষ কথা দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন ও বললেন,—তোমার পতাকা নিয়ে আমরা ব্রিটিশ বিরোধী অভিযানে বেরোতে চাই। সিন্ধিয়া তখন হ্যাভ্‌লকের বিজয়ের সংবাদে পরম উল্লসিত। তিনি বললেন,—আমার পক্ষে বর্ষার মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলাই সম্ভব নয়। সিন্ধিয়ার এই উক্তিতে কন্টিনজেন্টের বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা বলতে লাগলেন যে, সিন্ধিয়া বেইমানী করেছেন। অবশেষে সাতই সেপ্টেম্বর তাঁরা মোরার ও কাম্পুতে পাশাপাশি হিন্দু ও মুসলমানের পতাকা প্রোথিত করলেন। সে রাতে যদি একটি বাঁশি বা বিউগল বেজে উঠত তাহলে সিন্ধিয়ার দশ হাজার সৈন্যও বেরিয়ে গিয়ে সেই পতাকার পাশে দাঁড়াত। সেইজন্য সিন্ধিয়া পূর্বেই লস্করের প্রাসাদে সবগুলি বিউগল ও কামান সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন।

সিন্ধিয়ার নিজের দশ হাজার সৈন্য বিশ্বস্ত রইল। তাঁতিয়া টোপীর নির্দেশে অক্টোবর মাসে পুরো গোয়ালিয়ার কন্টিনজেন্ট তাঁর নেতৃত্বাধীনে চলে এল। ঝাঁসী ও কাল্পির পতনে উল্লসিত সিন্ধিয়া ও দিনকররাও যখন হিউরোজকে সম্বর্ধনা করবার পরিকল্পনায় ব্যস্ত তখন তাঁদের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে রাওসাহেবের প্রথম চিঠি এল। রাওসাহেবের অযোগ্যতা বারবার প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দিয়ে চিঠি লেখাবার কারণ কী? মনে হয় রাওসাহেব পেশোয়া বংশের একমাত্র প্রতিভূ বলেই তাহা করা হয়েছিল।

রাওসাহেব, রাণী ও তাঁতিয়া টোপী, প্রথমে সিন্ধিয়াকে মিষ্টি কথায় তাঁদের পক্ষে টানবার চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্য এই চিঠিতে তাঁদের বর্তমান অসহায় অবস্থা এবং এ সময় সিন্ধিয়ার ভারতীয়

শিবিরে যোগদানের প্রয়োজনীয়তার কথাই লেখা ছিল। দৌলতরাও সিন্ধিয়ার বিধবা পত্নী বাইজাবাঈকেও চিঠি লিখলেন রাওসাহেব। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে সিন্ধিয়া জরুরী চিঠি লিখে রবার্ট হ্যামিল্টনকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উক্ত চিঠির কথা জানালেন।

দিনকররাও-এর মনুষ্য-চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাঁর স্বদেশবাসী মাত্রেই অর্থ ও উৎকোচ দ্বারা বশীভূত হতে পারে, এই ধারণা থেকেই তিনি সিন্ধিয়াকে জানালেন, যে-কোন উপায়ে অর্থ দিয়ে এবং মিষ্টি কথায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে হাতে রাখা উচিত, কারণ হিউরোজ এসে পড়লেন বলে। সিন্ধিয়ার দশ হাজার ফৌজ ও গোয়ালিয়ারবাসীর রাজানুগত্যের ওপর দিনকররাও রাজবাড়ের যথেষ্ট আস্থা ছিল।

সিন্ধিয়ার সৈন্য ও কর্মচারীরা কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তাঁরা সিন্ধিয়া ও দিনকররাওকে নিজ শিবিরের মনোভাব জানতে দিলেন না। বিভিন্ন জায়গা থেকে লুকিয়ে রাওসাহেবের উদ্দেশ্যে প্রায় দু'শ' চিঠি লেখা হল।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ আমীন গ্রামে পৌঁছে সিন্ধিয়ার জবাবের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সিন্ধিয়া চারশ' সৈন্যসহ তাঁর একজন পরমবিশ্বস্ত সর্দারকে দিনকররাও-এর অজানতে আমীন গ্রামে পাঠালেন। তাঁকে দেখেই রাওসাহেব বলতে শুরু করলেন—

"তুমি আমাদের কি প্রতিবন্ধক দেখাচ্ছ? সিন্ধিয়া আর দিনকররাও একলা কি করবে? তারা কি ক্রীশ্চান যে, সাহেবদের সাহায্যের কথা ভাবছে? আমি প্রধান রাওসাহেব পেশওয়া। তুমি হচ্ছ একজন ভাঙসেবী সুবেদারের দশ টাকার চাকর। সিন্ধিয়া তো একদিন আমাদের জুতো বইত। আমরা তাদের দয়া করে গোয়ালিয়ার বকশিশ দিয়েছিলাম। আমার নিজের রাজ্য আমি নিতে যাব, তাতে তোমার কি?"

ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান উচ্চপদস্থ ও সিন্ধিয়ার একান্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি যখন দেখলেন রাওসাহেবের কথা শুনে তাঁর সিপাহীরা হাসাহাসি কানাকানি করছে এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সিপাহী ও তাঁর সিপাহীদের মধ্যে মনের কথা বিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ চলেছে তখন তিনি প্রতিবাদ করে

নিজের জীবন বিপন্ন করা উচিত মনে করলেন না। উপরন্তু অবস্থা দেখে তিনি নেতৃবৃন্দের সঙ্গেই যোগ দিলেন। সিন্ধিয়ার এই চারশ' সৈন্যসহ রাওসাহেব ও অন্যান্য নেতারা গোয়ালিয়ারের ৮ মাইল দূরে বড়াগাঁও-এ উপস্থিত হলেন। সেদিন ৩১শে মে। সিন্ধিয়া তখন আর একজন সর্দারকে বড়াগাঁও-এ পাঠালেন। রাওসাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

> 'সিন্ধিয়া কেন আমাদের বাধা দিতে চাইছে? আমরা তো যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা এসেছি দাক্ষিণাত্যের পথে গোয়ালিয়ারে কয়দিন বিশ্রাম করতে আর রসদ যোগাড় করতে। জেনে রেখো তোমাদের সমস্ত ফৌজ আমাদের দলে। আমার কাছে সেই মর্মে অন্ততঃ দু'শ' চিঠি আছে। কাজে কাজেই সিন্ধিয়া বা দিনকররাও-এর সাহায্য ছাড়াই আমরা জিতব।'

গোয়ালিয়ারের এত কাছে এসে রাওসাহেবকে কথায়বার্তায় মুখপাত্র হতে দেবার ইচ্ছা অন্যান্য ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ছিল না। কাজে কাজেই তাঁতিয়া টোপী তাঁকে বললেন,—আপনার ওপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আপনি কথায়বার্তায় সময় না কাটিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

রাওসাহেবকে সরিয়ে দিয়ে তাঁতিয়া টোপী সিন্ধিয়ার সর্দারের সঙ্গে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাঁকে বশ করলেন। রাণীও মাঝখানে এসে এই সর্দারটির সঙ্গে কথা বলে তাঁকে অভিভূত করে ফেললেন। ঝাঁসীর রাণী ও তাঁতিয়া টোপীর মতো বিখ্যাত দুই ব্যক্তি যে তাঁর মতন ভারতীয়দের সাহায্যের ভরসা করে বড়াগাঁও এসেছেন, তা জেনে তিনি আনন্দিত হলেন। তাঁতিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে ৩১শে মে সন্ধ্যাবেলা সেই সর্দারটি গোয়ালিয়ার ফিরে গেলেন।

ফুলবাগের রাজপ্রাসাদে অশান্ত পদচারণা করে কার যেন আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন জয়াজীরাও। ত্রয়োবিংশবর্ষীয় যুবক জয়াজীরাও-এর ঘনশ্যাম মুখবর্ণ, ক্রোধে ও প্রতীক্ষায় আরো কালো হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় ঐ সর্দার সেখানে উপস্থিত হলেন। জয়াজীরাও-এর ক্রোধ প্রশমিত করে তিনি বললেন,—প্রতিপক্ষের অবস্থা একান্তই বিপর্যস্ত। ঝাঁসীর রাণীর নাম এত শুনেছিলাম,

কিন্তু কোথায়ই বা তাঁর সেই জাঁকজমক! আর তাঁতিয়া টোপী, রাওসাহেব, সকলকেই তো দেখলাম। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করাই শ্রেয় মনে হল। আমাকে পাঁচশ' সৈন্য দিলে আমিই তাদের হারাতে পারি।

তাঁর অন্যান্য অফিসাররা এবং ফৌজী সিপাহীরা মনে মনে অন্য পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি হয়ে সিন্ধিয়াকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতে লাগল। ঝাঁসীর রাণী ও তাঁতিয়া টোপীকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করবার সম্ভাবনায় জয়াজীরাও উৎফুল্ল হলেন। তাঁকে দ্বিগুণ উৎসাহ দিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত মরাঠা সর্দাররা এবং কোষাধ্যক্ষ আমীরচাঁদ বাটিয়া বললেন—

> 'যখন ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ আর তাঁতিয়া টোপীকে ধরে আপনি ব্রিটিশদের হাতে দেবেন তখন আপনার পদমর্যাদা কতখানি বেড়ে যাবে বলুন তো?'

এই আকাশকুসুম দুরাশা জয়াজীরাওকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলল যে, দিনকররাওকে পর্যন্ত তিনি এই কৃতিত্বের অংশ দিতে চাইলেন না।

১লা জুন অতি প্রত্যূষে জয়াজীরাও আট হাজার সওয়ার ও পদাতিক, চব্বিশটি কামান নিয়ে মোরার থেকে দুই মাইল পুবে এবং লস্কর থেকে নয় মাইল দূরে বাহাদুরপুর গ্রামে উপস্থিত হলেন। সিন্ধিয়ার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী দলেও চারশ' সৈন্য ছিল। তাদের ওপর ছিল কামান চালাবার ভার। কামান গর্জন শুনে সিন্ধিয়া স্বয়ং তাঁহাকে সম্মান জানাতে আসছেন মনে করে রাওসাহেব উৎফুল্লচিত্তে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি সিন্ধিয়ার ভাবগতিক দেখে সন্ত্রস্ত হলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈ তাঁর দেড়শ' সওয়ার নিয়ে এগিয়ে এসে সিন্ধিয়ার অগ্রগতি প্রতিরোধ করলেন। তাঁকে দেখে অবশ্য যতটা শুনেছিলেন ততটা অসহায় বোধ হল না সিন্ধিয়ার। ইতিমধ্যে তাঁতিয়া ও বান্দার নবাব এগিয়ে এলেন। তাঁতিয়ার শ্যামবর্ণ, দৃঢ় সঙ্কল্প পূর্ণ চেহারা দেখে শঙ্কিত সিন্ধিয়া যখন সাহায্যের জন্য কাতরভাবে তাঁর সর্দারদের দিকে তাকাচ্ছেন তখন একজন সৈন্য ভারতীয় পক্ষ থেকে তলোয়ার হাতে এগিয়ে এল। সমগ্র ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার উঁচু করে সমস্বরে বললেন, দীন! দীন!

হরহর মহাদেও! তৎক্ষণাৎ সিন্ধিয়ার সমস্ত ফৌজ যন্ত্রচালিতের মতো ভারতীয় পক্ষে গিয়ে দাঁড়াল। পরস্পর কোলাকুলি ও কথাবার্তা শুরু হল এবং পরম নিস্পৃহভাবে তারা মোরার নদীর বালুচরে বসে তরমুজ ভেঙে খেতে শুরু করল।

অবস্থা একান্তই তার প্রতিকূল দেখে সিন্ধিয়া তাঁর কিছু দেহরক্ষী নিয়ে নিকটস্থ একটি পাহাড়ের দিকে পলায়ন করলেন। পশ্চাদ্ধাবন করে ভারতীয় সৈন্যরা প্রায় ষাটজন দেহরক্ষীকে নিহত করলেন।

পলায়নপর সিন্ধিয়া অতপর দ্রুতবেগে ফুলবাগ প্রাসাদে এসে পোশাক বদলে আগ্রার পথে ঢোলপুর অভিমুখে পালালেন। দিনকররাও প্রভুর পন্থা অনুসরণ করলেন। রাণীরা ও রাজবাড়ে পরিবারের স্ত্রীলোকরা বাইজাবাঈসহ নরোয়ারের কেল্লায় পালিয়ে গেলেন। আজও লোকে বলে সেদিন সিন্ধিয়া, দিনকররাও এবং অন্য হোমরা চোমরা ব্যক্তিরা নাকি ঘাগরা ওড়না পরে মেয়ের বেশে পালিয়েছিলেন।

গোয়ালিয়ার ও লস্করবাসীর সংযুক্ত জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসীর রাণী, রাওসাহেব ও বান্দার নবাব ঘোড়ার পিঠে লস্করে ঢুকলেন। বাঢ়ার পথে ফাড়কে ভ্রাতাদের সুবৃহৎ অট্টালিকা (আজও বিদ্যমান) দেখে রাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "আহ্ কোনাসে ওয়াড়া?" এই বাড়ি কার? একজন জবাব দিল, সর্দার ফাড়কে ইথে রহতা। রাণী বললেন—"সাম্‌ড়েবালে ফাড়কে কা আহে?" কথাটা বলে রাণী হাসতে লাগলেন।

ফাড়কে ভ্রাতারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজাপুর রাজ্যে চাকরি করতেন। ১৭৫৭ সালে গাত্তির কেল্লা অধিকারের সময় দুই ভাই-ই অশেষ শৌর্য প্রদর্শন করেন। কিন্তু পুরস্কার দেবার সময় আদিলসাহ্ দুই ভাইকে একটিমাত্র রাজবস্ত্র দিলেন। পোশাকটি দুইভাই ছিঁড়ে ভাগ করে নিলেন। পরদিন আধখানা জামা গায়ে জড়িয়ে তাঁরা আদিলসাহের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন,—দুইজনের কৃতিত্বের জন্য মাত্র একজন পুরস্কৃত হয়েছে। অতএব রাজপুরস্কার আমরা "ফাড়কে লে"—অথাৎ ছিঁড়ে ভাগ করে নিয়েছি। সেই থেকে তাঁরা ফাড়কে নামে পরিচিত হলেন। সিন্ধিয়া বংশের প্রথম

পুরুষ রাণাজী সিন্ধিয়ার সঙ্গে তাঁরা গোয়ালিয়ার আসেন এবং গোয়ালিয়ারে অশেষ প্রতিপত্তি ও ধনসম্পত্তি অর্জন করেন। মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় মাথায় পাগড়ী এককেরতা পরতে হয়। ফাড়কেরা পাগড়ী দেড়ফেরতা ঘুরিয়ে সাম্‌ড়া বা প্রান্ত ঝুলিয়ে দিতেন।

ফাড়কে পরিবারের সকলে রাজবাড়ে পরিবারের সঙ্গে রাজ পরিবারকে অনুসরণ করে নারোয়ারের কেল্লায় পালিয়ে গিয়েছিলেন।

রাণী লস্করে যে বাড়িটি বিশ্রাম ও বাসের জন্য নিয়েছিলেন সেটি তখন নওলক্ষা নামে পরিচিত ছিল। অন্য প্রবাদ এই যে, তিনি মিঞাসাহেবের কোঠিতে ছিলেন। এই শেষোক্ত কুঠি বাড়িটি বর্তমানে জরাজীর্ণ। এর সম্মুখের ফটক, প্রাচীর, প্রশস্ত আস্তাবল, হাতীশালা প্রভৃতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত। একপাশে একটি কারখানা। মূল বাড়িটি কিন্তু অটুট দাঁড়িয়ে আছে।

দিনকররাও, বলবন্তরাও, মাহুরকার, ফাড়কে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িই শুধু লুণ্ঠিত হল। সাধারণ লোকের ওপর এতটুকুও অত্যাচার হল না।

গোয়ালিয়ারে বেশিদিন থাকবার ইচ্ছা ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ছিল না।

গোয়ালিয়ারের বিশাল দুর্গ, অজস্র খাদ্য ও শস্য ভাণ্ডার, অস্ত্র-শস্ত্র, তোষাখানা ইত্যাদি দেখে তাঁতিয়া টোপী ও রাওসাহেব তাঁদের বিজয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হল। তাঁরা জাঁক-জমক করে বিজয়োৎসব করবার দিকে জোর দিতে লাগলেন। রাণীর সঙ্গে তাঁদের মনান্তর ও মতান্তর ঘটল। রাণী তাঁদের বারবার সদ্যবিজিত গোয়ালিয়ারের ফৌজকে হাতে রাখবার জন্য সযত্ন প্রয়াস করতে বললেন। তাঁরা রাণীর কথা শুনলেন না। তখন রাণী গোরখী প্রাসাদের গঙ্গাজলী বা তোষাখানার কোষাধ্যক্ষ আমীরচাঁদ বাটিয়ার সহযোগিতায় গোরখীর প্রশস্ত অঙ্গনে দাঁড়িয়ে গোয়ালিয়ার ফৌজ ও তাঁদের সৈন্যদের মধ্যে কুড়িলক্ষ টাকা বিতরণ করলেন। দীর্ঘদিন তারা বেতন পায়নি, তাই টাকা পেয়ে তারা উৎফুল্ল হল। রাণী আমীরচাঁদ বাটিয়াকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কুঠিতে চলে

এলেন। আমীরচাঁদ বাটিয়া পরে ইংরেজের হাতে ধরা পড়েন। বাড়ার সামনের রাজপথের পাশের একটি নিমগাছে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হয়। শোনা যায় জয়াজীরাও এই কোষাধ্যক্ষের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুদণ্ড দেবার প্রাক্কালে চাবুক মারতে চেয়েছিলেন। উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধ আমীরচাঁদ বলেছিলেন, "আমার হাত খুলে দাও, আমি নিজের মাথায় দুইবার জুতো মারব। একটি মারব আজীবন সিন্ধিয়াদের কাজ করেছি তবু নিমকহারামী করিনি বলে, অপরটি এই জয়াজীরাও-এর নিমক খেয়েছি বলে। এই দুটি ঘটনা আমার জীবনের লজ্জার কথা। তাছাড়া আর যা করেছি তার জন্য আমি এতটুকু অনুতপ্ত নই।"

রাণীর এই আচরণে সৈন্যরা খুশি হলেও তাঁতিয়া টোপী ও রাওসাহেব যে কতখানি অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তা জানা গেল ৩রা জুন ১৮৫৮ সালে। সেদিন প্রভাতে ফুলবাগ প্রাসাদে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাঁকজমক করে হিন্দুরাজ্য পেশোয়াশাহী ঘোষিত হল। নানাসাহেব এই পেশোয়াশাহীর পেশবা। রাওসাহেব রাজ-কোষের মণিরত্নখচিত শিরপ্যাঁচ ও কস্কা পরে হেসে বললেন, আমি হচ্ছি পেশবার প্রতিভূ। তাঁতিয়া টোপী বহুমূল্য মুক্তোর মালা পরে হলেন সেনাপতি, সিন্ধিয়ার মন্ত্রী রামরাও গোবিন্দ হলেন মুখ্যপ্রধান। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হল, উৎসব হল এবং ঘৃত, দধি ও মিষ্টান্নের গন্ধে লস্কর ভরে গেল। এই সভাতে রাণী প্রথমে আমন্ত্রিত হলেন না কিন্তু ২রা জুন রাতে একজন সদার এসে রাণীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। রাওসাহেবের এই অবহেলাতে মর্মান্তিক আঘাত পেলেন রাণী। এবং সেই দিনই তিনি বুঝলেন এত সহজেই যখন তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সম্ভব হল এবং তাঁর সমস্ত পূর্ব কীর্তি অবহেলা করে তাঁর অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁতিয়া এবং রাও তাঁকে এতখানি তাচ্ছিল্য করতে পারলেন তখন সমস্ত কিছুই বিফল হয়ে যেতে বাধ্য। রাণীর এই অপমানে মর্মাহত হলেন মান্দার, রঘুনাথ সিংহ, গুলমুহাম্মদ ও বান্দার নবাব।

রাণী বিশ্রাম কক্ষের অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। একে একে বিগত জীবনের সমুদয় ঘটনা তাঁর মনের মুকুরে প্রতিফলিত

হতে লাগল। প্রথমে মনে পড়ল, কি ভাবে তিনি একাকিনী ছলে ও কৌশলে ইংরেজকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন এবং তারপর বাধ্য হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মনে পড়ল, বুন্দেলখণ্ডে বিক্ষোভ বিস্তারের কথা। কি জ্বলন্ত দেশপ্রেমের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন একাধিক বীর। আরো মনে পড়ল, ঝাঁসীতে কিভাবে মাসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে তিনি সংগ্রামের জন্য শক্তি সংঘটন করেছিলেন এবং কিভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন হিউরোজকে। তাঁর হাজার হাজার বুন্দেলখণ্ডী ও পাঠান বীর যোদ্ধা নরনারী কিভাবে তাঁর জন্য প্রাণ দিয়েছে, কিভাবে তিনি এক বছর ধরে প্রাণ ভয় তুচ্ছ করে শিশুপুত্রকে নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়েছেন। ফুলবাগ প্রাসাদ থেকে ঘন ঘন বাজি তখন অন্ধকার আকাশে উঠে সশব্দে বিদীর্ণ হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে লোকজনের কলরব। সেদিকে চেয়ে রাণীর মনে হল এইজন্যই কি ঝাঁসীর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছে? এই জন্যই কি লড়েছে তারা? তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, আজ যেখানে হাজার হাজার আতসবাজির স্ফুলিঙ্গ উড়ছে সেখানে অদৃশ্য পক্ষবিস্তার করে মৃত্যু যেন অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তিনি বুঝলেন, এতদিনে তাঁর পরাজয় আসন্ন। শত্রুর পরাক্রমের জন্য নয়, নিজেদের চেতনাহীনতার জন্য। দীর্ঘদিন পর সম্ভবতঃ সেই প্রথম অবসন্ন বোধ করলেন তিনি। আর দামোদর? তার কি হবে? মানসচক্ষে তার পরিণতির কথা কল্পনা করে শিউরে উঠলেন রাণী। আশঙ্কার একখানি কালো মেঘ সেই নির্ভীক হৃদয়কে আচ্ছন্ন করল। আজকের আকাশের মতোই ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে ঘোর অন্ধকার বোধ হল। যুদ্ধ করে কি তিনি তবে ভুল করেছেন? নিশ্চয় নয়। মনে পড়ল,

'হতো বা প্রাপ্স্যাসি স্বর্গ জিত্বা বা ভোক্ষসে মহীম্
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥'

তিনি কৃতনিশ্চয় হয়েই তো যুদ্ধে নেমেছিলেন, কিন্তু তবু ফল কেন অন্যরকম হল! ভাগ্যবাদে বিশ্বাস করে সান্ত্বনা নেই। গীতাপাঠে শান্তি মিলবে না। সংগ্রামে সাফল্যের সম্ভাবনা চিরতরে বিলুপ্ত হল দেখে পৃথিবীর অন্য বহু বীরের মতো রাণীও সেদিন নিজেকে একান্ত একাকী বোধ করলেন।

একুশ

ভারতীয়দের গোয়ালিয়ার বিজয়ের বার্তা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল তখন ক্যানিং বললেন,

'If Scindia joins the Rebels, I will pack off tomorrow.'

'সিন্ধিয়া যদি বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দেন আমি কালই বিলেত চলে যাব।'

গোয়ালিয়ার বিজয় ও সিন্ধিয়ার পলায়নের বার্তায় ব্রিটিশ-ভারত শঙ্কিত হল। ক্যানিং দেখলেন কাল্পি থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায় যে-ভারতীয়রা পালিয়েছিলেন, দশদিনের মধ্যে তাঁরা সিন্ধিয়ার রাজধানী, রসদ, সৈন্য ও বহু কামান সহ পরম শক্তিশালী একটি ঘাঁটি পেয়েছেন। প্রাচীন নগরী গোয়ালিয়ার ও নতুন পত্তনী লস্কর, দুটিই সুসমৃদ্ধ।

এই গোয়ালিয়ার ভারতীয় বাহিনীর হাতে গিয়েছে জানতে পারলে সমগ্র বিজিত ভারতীয় এলাকায় কি রকম উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে ভেবে শঙ্কা বাড়ল ক্যানিং-এর।

গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়ার সুবিস্তীর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে বোম্বাই ও মধ্যভারত, বোম্বাই ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও আগ্রায় যাবার বহু রাস্তা এবং শতশত মাইল ইলেকট্রিক লাইন গিয়েছে। সুতরাং গোয়ালিয়ার অধিকার করে সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করা ভারতীয়দের পক্ষে অসম্ভব হবে না।

তাঁতিয়া টোপী গোয়ালিয়ারে নামমাত্র সৈন্য রেখে দক্ষিণে অভিযান চালালে সবচেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। পশ্চিম ও দক্ষিণে লক্ষ লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় আজও পেশোয়াকে তাদের ন্যায়সঙ্গত শাসক বলে মান্য করে। ব্রিটিশ অধিকারে তারা তখনও অভ্যস্ত হয়নি। দাক্ষিণাত্যে ও পশ্চিমভারতে তখন পর্যন্ত বিদ্রোহের বিস্তৃতি হয়নি। তাঁতিয়া টোপী যদি পেশোয়াশাহীর পতাকা নিয়ে একবার সেখানে পৌঁছতে পারেন, তাহলে পর্বতাকীর্ণ দুর্গম মহারাষ্ট্রের

অধিবাসীরা—যারা একদা শিবাজীর নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল, তারা আবার আজ তাঁতিয়ার নেতৃত্বে তেমন করেই সঙ্ঘবদ্ধ হবে। সামনে বর্ষা সমাগত। বর্ষায় দুরতিক্রম্য হবে চম্বল, পাহুজ, সিন্ধিয়া ও অন্যান্য নদী। দাক্ষিণাত্যে বর্ষা নামলে সহস্রাধিক গিরিঝর্ণা উদ্বেল হবে এবং সেখানে কোনমতেই ব্রিটিশফৌজ সহজে যাতায়াত করতে পারবে না।

এই সমুদয় অবস্থা বিচার করলে বোঝা যায়, গোয়ালিয়ার অধিকার করবার পর ভারতীয়দের পক্ষে সামরিক পরিস্থিতি কতখানি অনুকূল হয়েছিল। এবং সেজন্য ব্রিটিশ সরকারের শঙ্কিত হবার যথার্থ কারণও ছিল। কিন্তু গোয়ালিয়ারে অযথা বিলম্ব করাই প্রথমতঃ তাঁতিয়া টোপীর পক্ষে অনুচিত হয়েছিল। স্বচ্ছন্দেই তিনি দক্ষিণ অভিমুখে চলে যেতে পারতেন। দ্বিতীয়তঃ গোয়ালিয়ারে বিলম্ব করবার পক্ষে যদি তাঁর এই যুক্তিই ছিল যে, তিনি হিউরোজের সঙ্গে একটি চূড়ান্ত লড়াই করবেন এবং তৎপরে গোয়ালিয়ার ত্যাগ করে দক্ষিণে যাত্রা করবেন, তাহলে উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতিরও দরকার ছিল। আসলে গোয়ালিয়ার জয় করবার পর থেকে তাঁতিয়ার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই ছিল না। ভারতীয়দের এই পরিকল্পনাবিহীন অনির্দিষ্ট অবস্থাই ব্রিটিশ পক্ষকে সর্বদা বিজয়ী করেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। সৈন্যসংখ্যা যতই কম হোক না কেন, হিউরোজের সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সংগ্রাম পরিচালনায় সুকঠোর সামরিক শৃঙ্খলাই তাঁকে বিজয়-গৌরবে ভূষিত করেছে শেষ পর্যন্ত।

লর্ড ক্যানিং রবার্ট হ্যামিল্টনকে জানালেন যে, গোয়ালিয়ার পৌঁছতে আর একঘণ্টা দেরি হলেও চলবে না।

ক্যাপ্টেন ওমমানী (Ommany)-কে কাল্পিতে রাখলেন হিউরোজ। ৫ই জুন তিনি কোলিন ক্যাম্পবেল-এর কাছ থেকে এই মর্মে এক তার পেলেন যে, ব্রিগেডিয়ার স্মিথ-এর সম্পূর্ণ ব্রিগেড ও কর্নেল রিডেল-এর একটি Column তাঁর সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। কর্নেল রিডেল তাঁর সঙ্গে No. 21 Light Field Battery, 3rd Bengal Europeans, 200 Sikh Horse, 300 Sikh

Infantry, Siege Artillery, কামান, মর্টার ও গোলাবারুদ নিয়ে আগ্রা থেকে গোয়ালিয়ারে আসছেন।

ব্রিগেডিয়ার স্মিথও রাজপুতানা ফিল্ড ফোর্সের একটি সম্পূর্ণ ব্রিগেড সহ চন্দেরী থেকে গোয়ালিয়ার রওনা দিয়েছেন।

Hyderabad Contingent-কে আগেই ছুটি দেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ ঝাঁসী ও কাল্পির যুদ্ধে সেদিন Hyderabad Contingent-এর সাহায্য ছাড়া হিউরোজকে নিতান্ত বিপন্ন হতে হত। কিন্তু সিন্ধিয়ার পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে আবার পুরো Contingent গোয়ালিয়ার অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

গোয়ালিয়ারকে দক্ষিণদিক থেকে পাহারা দেবার জন্য হিউরোজের নির্দেশে মেজর অর Hyderabad Contingent নিয়ে পুনিয়ার এসে গোয়ালিয়ার-সিপরী রোডের ওপর নজর রাখলেন। কেননা তাতে করে গোয়ালিয়ার থেকে দক্ষিণে পলায়নপর ভারতীয় সৈন্যকে বাধা দেওয়া সহজ হবে।

গোয়ালিয়ার, লস্কর ও মোরার, এই তিন ভাগে বিভক্ত গোয়ালিয়ারকে আক্রমণ করবার জন্য হিউরোজ একটি অভিনব পন্থা স্থির করলেন। গোয়ালিয়ারের পূর্ব-দক্ষিণে কোটাহ্-কি-সরাইকে প্রধান ঘাঁটি ঠিক করা হল। গোয়ালিয়ার থেকে কোটাহ্-কি-সরাই-এর দূরত্ব বড় জোর সাত মাইল, আর লস্কর থেকে চার মাইল। সত্য বটে কোটাহ্-এর নিকটে রয়েছে পর্বতমালা। কিন্তু সেই পর্বতমালা অতিক্রম করে এলে প্রথমে কাম্পু ময়দান ও ছাউনি পাওয়া যাবে এবং তারপরেই লস্কর। একবার লস্কর ও কাম্পু অধিকার করতে পারলে দুর্গের দক্ষিণদিকটি সম্পূর্ণ তাঁদের হাতে এসে যাবে। ওদিকে তিনি নিজে মোরার ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট অধিকার করে মোরার থেকে বিশ মাইল দূরে কোটাহ্‌তে উপস্থিত হবেন। এদিকে লস্কর ও কাম্পু আক্রমণ কালে তিনি ও ব্রিগেডিয়ার স্মিথ একজোট হবেন। এদিক থেকে লস্কর ওদিক থেকে মোরার, দুইদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে স্বভাবতঃই ভারতীয় বাহিনী দুর্গের দিকে পিছু হটবে। এবং সর্বশেষে দুর্গ আক্রমণ করবেন তিনি। পূর্বে নগরী ও পরে দুর্গ আক্রমণ করে ঝাঁসীতে তিনি সাফল্য লাভ করেছিলেন। এইবারেও সেই পন্থাই অনুসরণ করবেন তিনি।

গোয়ালিয়ার শহর ও মোরারের দূরত্ব পাঁচ মাইল। মধ্যবর্তী স্থানে তানসেনের সমাধির পাশ দিয়ে একটি পথ চলে গিয়েছে মোরারের দিকে। মাঝে মাঝে জঙ্গল।

মোরার থেকে লস্কর ছয় মাইলের পথ। লস্করের শেষপ্রান্তে মোরারের রাস্তায় পড়ে ফুলবাগ প্রাসাদ ও তার বিস্তীর্ণ উদ্যান। কোটাহ্-কি-সরাই থেকে সোনেরেখা নালা ফুলবাগ প্রাসাদের পাশ দিয়ে গোয়ালিয়ার শহরের দিকে চলে গিয়েছে। মাঝে মাঝে উঁচু নিচু ভূমি, ঝোপ ও জঙ্গল।

ব্রিগেডিয়ার স্মিথের ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানটির ভার পড়ল। তিনি কোটাহ্-কি-সরাই-এর দায়িত্ব নিলেন।

হিউরোজ কাল্পিতেই অবসর গ্রহণ করবার সঙ্কল্প করেছিলেন। সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রবার্ট নেপিয়ার হিউরোজের স্থান গ্রহণ করতে কাল্পি এসেছিলেন। এই নতুন পরিস্থিতির ফলে গোয়ালিয়ার অভিযানে নেপিয়ার হিউরোজের Second Commander-এর কাজ করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের জুন মাসের অভ্যুত্থানের ফলে মোরার ক্যান্টন-মেন্টের কয়েকটি গৃহমাত্র ভস্মীভূত হয়েছিল। অন্যথায় সেখানকার ফুলবাগান, প্রশস্ত সৈন্যব্যারাক, হাসপাতাল, কুঠি ইত্যাদি পূর্ববৎ মনোরম অবস্থাতেই ছিল। হিউরোজ স্থির করলেন তিনি নিজে মোরার অধিকার করবেন। সেখানে অস্থায়ী ছাউনি, হাসপাতাল ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করে মোরার থেকে কোটাহ্-কি-সরাই-এ ব্রিগেডিয়ার স্মিথ-এর সঙ্গে যোগ দেবেন।

কাল্পি থেকে ইন্দুরকীর পথে প্রথম ব্রিগেড নিয়ে হিউরোজ, নেপিয়ার ও ব্রিঃ Stuart গোয়ালিয়ার রওনা হলেন। আগ্রা থেকে গোলিয়ারের পথে কর্নেল রিডেল-এর সুবিশাল বাহিনী পূর্বেই চম্বল নদী অতিক্রম করেছিল। ব্রিগেডিয়ার স্মিথ রাজপুতানা ফিল্ড ফোর্স নিয়ে চন্দেরী থেকে গোয়ালিয়ার আসতে লাগলেন। আর মেজর অর ঝাঁসী থেকে গোয়ালিয়ারের পথে পুনিয়ার দিকে রওনা হলেন।

হিউরোজের গোয়ালিয়ার আক্রমণের পরিকল্পনা প্রত্যেকটি ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে জানান হল।

প্রখর গ্রীষ্ম। রাতের ঠাণ্ডায় পথ চলে চলে হিউরোজ বারোই জুন আমীন পৌঁছলেন। আশা করলেন ১৬ই জুনের মধ্যেই তিনি বাহাদুরপুর পৌঁছতে পারবেন। জনৈক ভারতীয়—সিন্ধিয়ার বিশ্বস্ত কর্মচারী, তাঁকে মোরারের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

বাইশ

১৮৫৮ সালের জুন মাসে ভারতীয় এবং ইংরেজ উভয় পক্ষই গোয়ালিয়ারের দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়েছিল। কেননা উভয় পক্ষই জানতেন যে, তাঁতিয়া টোপী ও ঝাঁসীর রাণী যদি হিউরোজকে গোয়ালিয়ারে পরাভূত করতে পারেন তা হলে যুদ্ধের গতি একেবারে বদলে যাবে। আবার গোয়ালিয়ার ভারতীয়দের হাতে দীর্ঘদিন থাকলে ভারতে ব্রিটিশরাজের অবস্থাও সঙ্গীন হয়ে উঠবে।

গোয়ালিয়ারের রঙ্গমঞ্চে সেদিন আশা-নিরাশার এই দোদুল্যমান অবস্থার নেপথ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের অবস্থা কিন্তু একান্ত শোচনীয়।

বারোই জুন মধ্যরাত্রে তাঁতিয়া এবং রাওসাহেবের কাছে যখন হিউরোজের আমীন পৌঁছবার সংবাদ এল, তখন তাঁদের সম্বিৎ ফিরল।

তাঁরা বুঝলেন এই দুঃসময়ে পারস্পরিক সমঝোতার একান্ত অভাব তাঁদের মধ্যে কি দুস্তর ব্যবধান রচনা করেছে। তাঁরা আরো বুঝলেন যে, শুধুমাত্র বাহুবল আর হৃদয়াবেগ সম্বল করেই যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করা যায় না, সেই সঙ্গে রণনীতিজ্ঞানও অপরিহার্য-ভাবে প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু তখন অবস্থা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে।

তেরই জুন ভোরবেলা সমগ্র সৈন্যদের সমবেত করতে গিয়ে তাঁতিয়া বিচলিত হলেন। সৈন্যরা তখন তাঁতিয়ার ওপর ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে। এক শাহী খতম করে অন্য শাহী গড়বে বলে

জানের পরোয়া না করে তারা তাঁতিয়ার নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল। তারা জয় করল গোয়ালিয়ার আর তাদের নেতা হয়ে তাঁতিয়া কি না তখন ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে পুণ্য অর্জন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল! পেশোয়াশাহীকে সিংহাসনে বসিয়ে মোতির মালা গলায় পরে হীরে বসান তরবারি হাতে, পেশোয়ার তাঁবেদার সেজে কি না নির্জীব হয়ে বসে রইল তাঁতিয়া!

নেতা যেখানে বেইমানি করেছে, ফৌজের স্বার্থের দিকে ফিরে তাকায়নি, সেখানে নেতার কথা মানবে কেন তারা? তারা বলতে লাগল—আজ হিউরোজের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তাই আমাদের কাছে এসেছ? আমাদের লড়িয়ে দিয়ে আবার কোন্ চোরা দরোজা দিয়ে পালাবে তুমি? এখন যাও, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও, পুণ্যাহ কর, গণেশচতুর্থী কর। পুণ্যবলই তো তোমাকে রক্ষা করবে, সিপাহীরা তোমার কি করবে? তুমি তফাত যাও, তুমি বেইমান!

প্রমাদ গণলেন তাঁতিয়া। এই ফৌজের সামনে দাঁড়াবার সমস্ত অধিকারই নষ্ট করেছেন তিনি। তবে কি উপায়? এখন তাহলে কি হবে?

ফৌজের চিৎকার তাঁর কানে এল। তারা বলছে—আমরা তাঁতিয়ার নেতৃত্ব মানি না। 'তাঁতিয়ানে বেইমানি কিয়া।'

নিরুপায় তাঁতিয়া তখন বান্দার নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন—এখন কর্তব্য কী?

বান্দার নবাব বললেন—কর্তব্য আপনার অজানা নয়। বাঈসাহেবের কাছে যান। আমরা মিলিত হবার চেষ্টা করি।

তাঁতিয়া অধর দংশন করলেন।

বান্দার নবাব বললেন—অন্য কোন উপায় নেই।

তেরই জুন মধ্যাহ্নে রাওসাহেব, তাঁতিয়া এবং বান্দার নবাব রাণীর কাছে গেলেন।

কাল্পি, কুঁচ, গোলাওলী ও বাহাদুরপুরের যুদ্ধে রাণী সর্বদাই তাঁদের যে-কথা বলে এসেছেন, সে-কথা শুনলে আজ তাঁদের এ অবস্থা হত না, তা সত্য। গোয়ালিয়ারে ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা না করলে, কিম্বা পুণ্যাহ ও উৎসবে

সময় অপব্যয় না করলে সমস্ত ছবিখানার রং-ই বদলে যেত। কিন্তু তখন আর সময় নেই।

অভিমানিনী রাণী গম্ভীরমুখে পুত্র দামোদরকে কোলে করে অনুচরবর্গ পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। তাঁকে দেখে শঙ্কিত হলেন নেতৃবৃন্দ। রাণীকে যথারীতি সম্ভাষণ করে তাঁতিয়া বললেন,—ইংরেজ সৈন্য সন্নিকটে। বর্তমানে আমাদের একত্র হওয়া দরকার। আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন,

'আজ পর্যন্ত এবড়া অটোকাট বিভূ রচুন যে জিবাপাড় শ্রম কেলে
তে ফলক্রুপ হোণ্যাচী আশা আতাঁ রাহিলী নাহী।'

—যে সময় যুদ্ধের প্রস্তুতি করা উচিত ছিল সে সময় আপনারা বিজয়োৎসবে মগ্ন ছিলেন। আমি সামান্যা নারী। আপনাদের কি পরামর্শ দেব! তবে ভবিষ্যতে যে কঠোর পরিণাম অপেক্ষা করে আছে, তাই ভেবে আমি শঙ্কিত হচ্ছি।

আত্মধিক্কারে মাথা নত করে রইলেন নেতৃবৃন্দ।

তাঁতিয়া টোপী রাণীর সামনে নিজের পাগড়ী নামিয়ে রাখলেন।

এই স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে জয়ের আশা দুরাশা মাত্র। তথাপি রাণী উদ্দীপিত হলেন। উৎসাহ ও সঙ্কল্পে মুখমণ্ডল তাঁর প্রদীপ্ত হল। তাঁতিয়া সমগ্র কোটাহ্-কি-সরাই-এর দায়িত্ব রাণীর ওপর ছেড়ে দিলেন। সমগ্র অশ্বারোহী সৈন্যের ভারও রাণী নিজে গ্রহণ করলেন।

বাঈসাহেবের নেতৃত্ব গ্রহণের কথা জেনে সৈন্যদলে আবার নতুন আশার সঞ্চার হল।

ঝাঁসী থেকে যাঁরা তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে তখনও রঘুনাথ সিং, গুলমুহাম্মদ, গণপৎরাও মারাঠা, রামচন্দ্ররাও দেশমুখ, মান্দার, কাশী কুনবীন, জুহী নাটকওয়ালী, নান্নে খাঁ প্রভৃতি ছিলেন। তাঁদের সমবেত করলেন রাণী। বারবার অনুরোধ করলেন সামান্য মাত্র বিপদের সম্ভাবনাতেই তাঁরা যেন বালক দামোদরকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান। আরও বললেন,—আমার অবশিষ্ট অলঙ্কার ও অর্থ দিয়ে তোমরা দামোদরকে রক্ষা করো। দামোদর

বালক। তথাপি আমি ইংরেজের শত্রুতা করেছি বলে এই অবোধ শিশুকেও তারা কষ্ট দিতে পারে। কাজেই তোমরা তাকে সর্বদা নিরাপদে রাখবার চেষ্টা করো।

দামোদরকে বললেন,—আনন্দ, এই দুঃখ দুর্দশার দিনে তুমিই আমার একমাত্র আনন্দ। যদি প্রয়োজন হয় তুমি আমাকে ছেড়ে বালারাও, কাশী, রঘুনাথ এঁদের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে পারবে তো? জেনো তুমি নিরাপদে আছ জানলে আমিও নিশ্চিন্ত থাকব।

অভিভূত দামোদর বিস্ময়ে ঘাড় নাড়লেন। দত্তক গ্রহণের সময়ে যদিও তাঁর নাম মৃত শিশু যুবরাজের নামানুসারে দামোদর রাখা হয়েছিল, তবু রাণী তাঁকে আনন্দ বলেই ডাকতেন। সম্ভবতঃ মৃত পুত্রের নামে ডাকতে তাঁর প্রাণে বাজত। সর্বদাই তিনি বলতেন, আনন্দ আমার আনন্দস্বরূপ। রাণী অনুচরদের বারবার করে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্রের ধারে কাছে থাকবার তাদের প্রয়োজন নেই। দরকার হলে তাঁরা যেন পালিয়ে যেতে দ্বিধা বোধ না করেন।

তারপর তিনি মান্দারকে উদ্দেশ করে বললেন—আমার শমসের এনে দাও।

কিন্তু অনুচরদের মনে প্রশ্ন জাগল, রাণীকে কে রক্ষা করবে?

নীল রং রাণীর বরাবর প্রিয় ছিল। আজ তিনি নীল চন্দেরীর মুরেঠা বাঁধলেন। নীল আংগরাখা ও চিপা পাজামা পরলেন। কণ্ঠে মুক্তোর কণ্ঠী পরে হাতে রত্নখচিত তলোয়ার নিয়ে বিদ্যুল্লতা-প্রভ গৌরীর মতো রাজরত্ন ঘোড়ায় চড়ে কাম্পু ময়দানে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করবার জন্য চলে গেলেন। কাল্পিতে গোলাওলী যুদ্ধের পর সারেঙ্গী ঘোড়ীর মৃত্যু হয়েছিল। বড়া গোড়-বোলে সাগ্রীদ তাঁকে রাজরত্ন ঘোড়া দিয়েছিল। রাজরত্ন শ্বেতবর্ণ অতি সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়া।

স্থির হল তাঁতিয়া টোপীর একটি মোর্চা কাম্পুতে থাকবে। সেই স্থানটি বর্তমানে সারস্বত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পেছনে। তাঁতিয়ার আর একটি বাহিনী থাকবে উত্তরে। রাওসাহেব থাকবেন পশ্চিমে এবং বান্দার নবাব থাকবেন গোয়ালিয়ার শহরের ও কেল্লার ভার নিয়ে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রাণীকে কোটাহ্-কি-সরাই-এ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রায় দশহাজার সৈন্যের ভার দেওয়া হয়েছিল। সেই সৈন্যদলে গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের সাদা ও লাল কুর্তারা ছিল। 5th Irregular-এর ধূসর পাজামা ও লাল কুর্তারাও রাণীর অধীনে যুদ্ধ করেছিল।

কাম্পুতে রাণী ও বান্দার নবাব সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাতে লাগলেন। কুঁচ ও গোলাওলীর যুদ্ধে যেভাবে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল এবার যেন কোনমতেই তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। নেতৃবৃন্দেরা এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বারবার আলোচনা করে স্থির-সঙ্কল্প হলেন।

ছোট বড় মিলিয়ে আটান্নটি কামান কোটাহ্-কি-সরাই কেল্লা, কাম্পু, ফুলবাগ, মোরার-এর বিভিন্ন স্থানে বসাবার বন্দোবস্ত হল।

১৬ই জুন ভোরে হিউরোজ মোরার ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের চার পাঁচ মাইল দূরে বাহাদুরপুর গ্রামে পৌঁছলেন। তাঁর অগ্রগতির খবর পেয়ে ১৫ই জুন রাতে 5th Irregular-এর কিছু সওয়ার ও কামান নিয়ে রাওসাহেব মোরারে পৌঁছলেন। সিন্ধিয়ার ব্যক্তিগত ফৌজের বাছাই করা সিপাহী সওয়াররাও তখন ওখানে ছিল।

হিউরোজের নেতৃত্বাধীনে ব্রিগেডিয়ার Stuart, ব্রিঃ জেনারেল নেপিয়ার, ক্যাপ্টেন এ্যাবট (Abbott), লেঃ নীভ (Neave), লেঃ হারকোর্ট (Harcourt), স্ট্রাট (Strutt), ক্যাপ্টেন লাইটফুট (Light foot), ক্যাপ্টেন রীচ্ (Rich) প্রভৃতি সুযোগ্য যোদ্ধারা ছিলেন।

সার রবার্ট হ্যামিল্টন তাঁর একান্ত পরিচিত এই স্থানগুলির সম্বন্ধে হিউরোজকে বিশেষ ওয়াকিবহাল করে দিয়েছিলেন। মোরারের ডানদিকের গিরিখাত ও নদীখাতগুলির মধ্যে ভারতীয় সেনা আত্মগোপন করে থাকতে পারে সে-কথাও তিনি হিউরোজকে বারবার বলেছিলেন।

১৬ই জুন সকালে বাহাদুরপুর থেকে হিউরোজ মোরারের পথে অগ্রসর হতে হতে স্পষ্ট বুঝলেন, তাঁর বামদিকের নদীখাতগুলি শত্রুসৈন্যে সমাকুল। মোরার থেকে মুহুর্মুহু কামানের গোলা নিক্ষেপ করে হিউরোজের অগ্রগতিতে বাধা দেওয়া হল।

হিউরোজের পক্ষে ক্যাপ্টেন নীভ নিহত হলেন। দুই ঘণ্টা তুমুল লড়াই-এর পর হিউরোজ মোরার ক্যান্টন্‌মেন্ট অধিকার করলেন। বিপর্যস্ত ভারতীয় সৈন্য সুশৃঙ্খলভাবে পশ্চাদপসরণ করতে লাগল।

১৬ই জুন রাতে লস্কর মশালের আলোতে দিনের মতো ঝলমল করছিল। আর সেই উজ্জ্বল আলোতে অবিরাম লোক-লস্করের আনাগোনা চলেছিল।

কোটাহ্-কি-সরাই ও লস্করের অন্তর্বর্তী অঞ্চল পর্বতসঙ্কুল খানাখন্দে পরিপূর্ণ। কোটাহ্-কি-সরাই-এর নাম এসেছে একটি মুসাফিরখানা থেকে। এখানে একটি নগণ্য গড়, নদী ও নালা ছিল। এই এলাকাটি বিষাক্ত সাপের জন্যও বিপজ্জনক ছিল।

১৬ই জুন সমস্তরাত্রি ধরে রাণী ও অন্যান্য নেতাদের মধ্যে পরামর্শের পর কোটাহ্ থেকে দেড়হাজার গজ দূরে, বর্তমানে যে স্থানে মাতা-কি-মন্দির তার কাছাকাছি কয়েকটি কামান সন্নিবেশিত হল। উভয় পার্শ্বস্থ সমতল জমিতে দুটি সৈন্যদল রাখা হল। কাম্পু ময়দানে স্বয়ং তাঁতিয়া টোপীর নির্দেশে একটি মোর্চা গঠিত হল। কোটাহ্ থেকে লস্করের মধ্যবর্তী গিরিখাতগুলিতে পদাতিক, অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী সৈন্য মোতায়েন করা হল। ফুলবাগে একদল সৈন্য নিয়ে রইলেন মান্দার। রঘুনাথ সিং সমভিব্যাহারে রাণী স্বয়ং ফুলবাগ ও কোটাহ্'র মধ্যস্থিত সৈন্যবাহিনীর ভার নিলেন, আর কোটাহ্তে রইলেন গুলমুহাম্মদ। বর্তমানে কাটিঘাঁটি নামে পরিচিত স্থানে অপর একটি সৈন্যদল নিয়ে বান্দার নবাব অপেক্ষা করতে লাগলেন।

১৩ই জুন থেকে ১৭ই জুন পর্যন্ত রাণী দিনরাত্রি প্রত্যহ ছয় ঘণ্টাও বিশ্রাম করেছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর শরীরে ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু তাঁর বাহন রাজরত্ন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, সেই ঘোড়া নিয়ে যুদ্ধ করা চলে না। তাই ১৭ই জুন প্রত্যূষে রাণী সিন্ধিয়ার অশ্বশালা থেকে একটি তাজা ঘোড়া বেছে নিলেন। তারপর হাতে শমসের ও কোমরে পাশখুব্ নিয়ে রাণী গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেন্টের সৈন্যদের মতোই সাদা পাজামা ও লালকুর্তা পরিধান করলেন। সামরিক উচ্চপদ অনুযায়ী কণ্ঠে পরলেন তাঁর পুরানো চিহ্ণ পেটি। ঝাঁসীর নেবালকর বংশের

আশীর্বাদস্বরূপ সেই মুক্তোর কণ্ঠহার পনের বছর আগে তিনি পেয়েছিলেন। পায়ে পরলেন নাগরা, মাথায় বাঁধলেন চন্দেরীর সাদা মুরেঠা। অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতে থাকতেই তিনি দামোদরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন। যাবার পূর্বে রামচন্দ্ররাও দেশমুখ, গণপৎরাও ও কাশীকে পুনর্বার স্মরণ করালেন তাঁর অনুরোধ। রাণীর অনুরোধ রক্ষার জন্য নিরাপদ স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে রইলেন এই অনুগত ও বিশ্বাসী অনুচরবৃন্দ।

বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। সূর্যোদয় থেকেই শুরু হবে গরম। প্রভাতের মৃদুমন্দ বাতাসে সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হতে হতে রাণী ভাবলেন, নিত্যকার মতো সূর্যোদয় আজও দেখা যাবে। কিন্তু তাঁর জীবন-সূর্য তার পরিক্রমার শেষ কক্ষে পৌঁছবে কবে? কিন্তু এ-চিন্তা এক মুহূর্তের মাত্র। তারপরেই তিনি নিজেকে দৃঢ়-চিত্ত করলেন। দূর থেকে সৈন্যদলকে দেখে তাঁর মনে উৎসাহ এল এবং আসন্ন সমরের কথা ভেবে আনন্দ হল।

ইতস্ততঃ ব্যস্ত সৈন্যরা সসম্ভ্রমে তাঁকে দেখে বলাবলি করতে লাগল—বাঈসাহেব চলেছেন।

ব্রিগেডিয়ার স্মিথ, Her Majesty's 8th Hussar, 14th Light Dragoon, 95th Regiment, 1st Bombay Lancer, 3rd Troop Bombay Horse Artillery, 10th Bombay Native Infantry ইত্যাদি বিভিন্ন সৈন্যদল এবং লেফটেনান্ট কর্নেল ব্লেক (Blake), লেঃ কর্নেল রেইন্স (Raines), আওয়েন (Owen), মেজর ভায়াল্‌স (Vialls), মীড (Meade) (পরে তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসীর সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন), লক্‌ (Lock), হীথ (Heath) প্রভৃতি সুযোগ্য অফিসার নিয়ে সকাল সাতটার সময় কোটাহ্‌-কি-সরাই পৌঁছলেন।

এই স্থানের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হলেও স্মিথ-এর মনে হল তাঁর সামনের পর্বতমালা এবং লস্করের মধ্যবর্তী সমস্ত জায়গায় ভারতীয় সৈন্য প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে।

তাঁর সঙ্গে ছিল রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম। কোটাহ্‌তে তিনি সেগুলি রাখবার নির্দেশ দিয়ে পাহারা দেবার ভার দিলেন 8th Hussar ও Bombay Lancer-দের দুটি Troop-কে। তারা

কোটাহ্‌তেই থাকবে এবং একান্ত প্রয়োজন না হলে রসদঘাঁটি ছেড়ে নড়বে না। তারপর গিরিখাত, নালা ও গর্তের দিকে নজর রেখে স্মিথ সন্তর্পণে অগ্রসর হতে লাগলেন। পাঁচশ' গজ অগ্রসর হতে না হতেই ভারতীয় কামানগুলি গর্জন করে উঠল। তুই পশলা গোলাবর্ষণের ফলে স্মিথ পিছু হটে এলেন। তারপর Horse Artillery-সহ এগিয়ে গিয়ে স্মিথ পাল্টা গোলাবর্ষণ আরম্ভ করলেন। এই কামান যুদ্ধে ভারতীয় পক্ষের প্রধান গোলন্দাজ নিহত হলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই ভারতীয় বাহিনী পিছু হটতে আরম্ভ করল। তখন স্মিথ 95th Regiment-এর লেঃ কর্নেল রেইন্স (Raines)-কে ভারতীয় বাহিনীর পশ্চাৎ অনুসরণ করতে আদেশ দিলেন। 95th Regiment ও 10th Regiment Native Infantry নিয়ে রেইন্স ভারতীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। এই ভারতীয়দের দলে ছিলেন গুলমুহাম্মদ। গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেন্টসহ পশ্চাদপসরণ করবার সময় তিনি বারবার গুলী ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের অগ্রগতিতে বাধা দিতে লাগলেন। অগ্রসরমান রেইন্স-এর সামনে পড়ল সোনেরেখা নালা। নালার তু'পাশ উঁচু এবং তার মধ্যে তখনও চারফুট পরিমাণ জল। সেখানে তাঁর গতি রুদ্ধ হল। সওয়ার ও পদাতিকরা এক এক করে সন্তর্পণে নালা পেরিয়ে অগ্রসর হতে লাগল।

ইতিমধ্যে গুলমুহাম্মদ সমস্ত কামানগুলি সরিয়ে লস্করের পথে কাম্পুর দিকে ফিরে চললেন। কামান, পদাতিক, সওয়ার ও গোলন্দাজসহ দ্বিতীয় মোর্চা অনতিদূরেই তৈরি হয়েছিল। গুলমুহাম্মদ নিজে সেখানে রয়ে গেলেন এবং তাঁর সৈন্যদল কামানগুলি নিয়ে আরও পিছিয়ে গেল। রেইন্স যখন তাঁর সম্মুখস্থিত শত্রু সৈন্য দেখে কি করা কর্তব্য স্থির করছিলেন, তখন ডানদিকে একটি উঁচু জায়গায় গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেন্টের অপর একটি বাহিনী তাঁর দৃষ্টি-গোচর হল। আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিজের বাহিনীর উপর সামনের ও পাশের তুটি শত্রু সৈন্যদল থেকে যুগপৎ কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল।

অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখে রেইন্স পশ্চাদপসরণ করতে লাগলেন। 10th Regiment Native Infantry তাঁর বাহিনীর পৃষ্ঠভাগ রক্ষা

করতে লাগল। পশ্চাদপসরণকারী রেইন্স-এর সঙ্গে যোগ দিলেন এসে মেজর ভায়ালস্ (Vialls)। তাঁরা তখন আবার একসঙ্গে কাল্পীর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁতিয়া টোপীর বাহিনীর ছয়টি কামান থেকে অগ্রসরমান ইংরেজ সৈন্যদের ওপর মুহুর্মুহু গোলা এসে পড়তে লাগল। তখন গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড সংগ্রাম। দুই পক্ষই সমান মরিয়া। দুইঘণ্টা কেটে গেল তথাপি রেইন্স ও ভায়াল্‌স পিছু হটলেন না। ভারতীয় পক্ষেও এতটুকু শৈথিল্য দেখা গেল না।

দু'ঘণ্টা বাদে ভারতীয় পক্ষের পার্শ্বভাগে ভাঙন শুরু হল। সমগ্র ভারতীয় বাহিনী তখন ফুলবাগ প্যারেড ময়দানের দিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করল। ফুলবাগ তখন প্রাচীর বেষ্টিত ছিল না। তার সামনে ও পেছনের জায়গাগুলিকেও ফুলবাগই বলা হত।

ফুলবাগের দিকে অগ্রসর হতে হতে রেইন্স দেখলেন, তাঁর সামনে দু'শ' গজের মধ্যে অপর একটি বাহিনী। এদের সঙ্গে ছিলেন রঘুনাথ সিং। তারপরেই দেখা গেল অগণিত গোয়ালিয়ার কন্টিন্‌জেণ্টের অশ্বারোহীসহ অপর একটি বিশাল বাহিনী। এদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাণী এবং মান্দার।

রেইন্স ও ভায়াল্‌স-এর সম্মিলিত বাহিনী এই মোর্চা দেখে সন্ত্রস্ত হলেন। তখন সমূহ বিপদ আশঙ্কা করে ব্রিগেডিয়ার স্মিথ সমগ্র 8th Hussar, অবশিষ্ট Light Dragoon ও Bombay Lancer নিয়ে পেছন থেকে ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যার্থ এগিয়ে এলেন। এই ধরনের কোন জরুরী অবস্থায় লড়াই করতে হতে পারে জেনেই 8th Hussar-কে ইতিপূর্বেকার যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়নি। ভরসা পেয়ে রেইন্স একঘণ্টাকাল পর্যবেক্ষণের পর আবার অগ্রসর হলেন। শুরু হল ঘোরতর যুদ্ধ।

রাণী তাঁর সৈন্যদের উৎসাহিত করতে লাগলেন এবং নিজে মরিয়া হয়ে লড়তে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠে মুক্তোর মালা ঝলমল করতে লাগল। বেশভূষার দরুন রাণীকে কেউ চিনতে পারল না। ইংরেজ সৈন্যরা শুধু যুদ্ধমান এক তরুণ সৈনিকের তরবারি চালনা দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হল।

Gwalior Cavalry-সহ রাণী, রঘুনাথ সিং ও মান্দার

যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রখর গ্রীষ্ম। বেলা তিনটে বেজে গিয়েছে। সর্বত্র তলোয়ারের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষা, কামানের গর্জন, আহতের আর্তনাদ হিন্দী ও ইংরেজীতে মুহুর্মুহু চিৎকার ও নির্দেশে রণাঙ্গন মুখরিত।

প্রখর নীল আকাশ। চক্রাকারে উড়ছে শকুনি গৃধিনী। যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে নখ-দন্তে তাদের হিংস্র ভূমিকা শুরু হবে। সূর্যের কিরণ অগ্নিবর্ষী। ঘর্মাক্ত দেহ। ক্ষতবিক্ষত কলেবর। তবু টগবগ করে রক্ত ফুটছে ধমনীতে। একমুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। ক্রমশঃ রেইন্স-এর সৈন্যদল বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। জয় সুনিশ্চিত জেনে অদম্য উৎসাহে লড়তে লাগলেন রাণী। সৈন্যদলও তাঁর উৎসাহে উদ্দীপিত হল। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে ক্লান্ত ইংরেজ সৈন্যদল ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল। আবহাওয়ায় সেদিন উত্তাপ ১২৫° ডিগ্রী। ভারতীয় শিবির থেকে 'হরহর মহাদেও' শব্দ ঘনঘন উত্থিত হতে লাগল। ইংরেজ সৈন্যের সেই চরম বিপদকালে ব্রিগেডিয়ার স্মিথ 8th Hussar-দের আক্রমণ করতে হুকুম দিলেন।

একটানা যুদ্ধে রাণীর সৈন্যদল একেবারে ক্লান্ত। এই অবস্থায় 8th Hussar-দের দ্রুতবেগে অগ্রসর হতে দেখে রাণী প্রমাদ গণলেন। তিনি মান্দার ও রঘুনাথ সিংকে ফুলবাগ ছাউনিতে সরে যেতে নির্দেশ দিলেন। ক্যাপ্টেন হিনীজ্ (Heneage), ক্যাপ্টেন পুর (Poore) ও লেফটেনাণ্ট রেইলী (Reiley), অধিকাংশ 8th Hussar-দের নিয়ে বামদিকে অগ্রসর হয়ে কেল্লার নিচে রাণী ও তাঁর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের সঙ্গে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু করলেন। কারো কারো মতে গোয়ালিয়ারে রাণীর সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের সেই ভয়াবহ যুদ্ধের জন্যই ঐ এলাকাটির নামকরণ হয়েছে কাটিঘাঁটি।

কেল্লা হতে আক্রমণকারী ইংরেজ সৈন্যের মধ্যে বারবার কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল। কিন্তু সেই অগ্নিবর্ষণের মধ্যেও ইংরেজ সৈন্য প্রশংসনীয় বীরত্বের সঙ্গে লড়তে লাগল। ইতিমধ্যে ফুলবাগ ছাউনির ভারতীয় গোলন্দাজদের নিহত করে ক্যাপ্টেন হিনীজ তিনটি কামান অধিকার করলেন। সমস্ত ভারতীয় ছাউনিতে তখন চরম ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি

হল। রাণী তাঁর কিছু সওয়ার ও পদাতিকসহ সেই চরম বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যেও ফুলবাগ ছাউনির বাইরে মোর্চা গঠনের প্রয়াস করে শত্রু সৈন্য প্রতিরোধ করবার শেষ চেষ্টা করলেন। কিন্তু আতঙ্কিত ও বিপর্যস্ত সৈন্যদলের অধিকাংশই তখন সোনেরেখা নালা পেরিয়ে মোরারের রাস্তা ধরে অথবা দুর্গের দিকে পালাবার চেষ্টা করছে। কর্নেল হিক্স ইতিমধ্যে ফুলবাগ ছাউনির ভিতরে এসে পড়লেন। ফলে অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হল।

রাণী, মান্দার ও রঘুনাথ সিং তখন মাত্র পনের-ষোলজন সৈন্য নিয়ে মূল বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরা ছিলেন সমভূমিতে। আশেপাশের জমি উঁচু। সেই উঁচু জায়গা থেকে যুদ্ধপটু 8th Hussar দল ভীমবেগে তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে আক্রমণ প্রতিহত করা রাণীর পক্ষে কঠিন হল। তখনও তাঁকে বা সহচরী মান্দারকে দেখে ইংরেজ সৈন্য নারী বলে বুঝতে পারেনি।

এই চূড়ান্ত বিপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়ে রাণী প্রাণপণ শক্তিতে সোনেরেখা নালা পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। এমন সময় মান্দারের বুকে এসে গুলী বিঁধল। করুণ কণ্ঠে মান্দার বললেন—বাঈসাহেব আমি চললাম আর পালিয়ে যাওয়া হল না। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে রাণী মান্দারের আততায়ীকে হত্যা করলেন। সেই সময় তাঁর গাত্রাবরণের কিছু অংশ কণ্ঠ থেকে সরে যেতেই মুক্তোর কণ্ঠী দেখা গেল আর তৎমুহূর্তে তাঁর কপালে একটা তলোয়ারের আঘাত এসে লাগল। মাথার ডানদিক থেকে ডান চোখ অবধি গেল কেটে। পাগড়ির পাল্লা ছিঁড়ে তিনি রক্তস্রাব বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন। ফিনকী দিয়ে রক্ত পড়ছে। তথাপি ঘোড়ার পেটে আঘাত করে তিনি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চললেন। শেষ অবধি ঘোড়া নালা পেরিয়ে গেল এবং সেই সময় হঠাৎ তাঁর বুকের বাঁদিকে একটি গুলী এসে বিদ্ধ হল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন।

ইতিমধ্যে গুলমুহাম্মদ, গণপৎরাও মারাঠা, নাম্নে খাঁ প্রভৃতি অবশিষ্ট কতিপয় অনুচর রঘুনাথ সিং-এর সঙ্গে যোগ দিলেন। রঘুনাথ পশ্চাৎ অনুসরণকারী লেফ্‌টেনান্ট রেইলীর কোমর লক্ষ্য

করে গুলী ছুঁড়লেন। কিন্তু তার আগেই রৌদ্রাহত হয়ে রেইলী পড়ে গিয়েছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হল। ক্যাপ্টেন হিনীজ-এর দল আর সেখানে দাঁড়ালেন না। তাঁরা ফুলবাগ ছাউনির ওধারে চলে গেলেন।

রাণীর অনুচরবৃন্দ তখন তৎপর হয়ে রাণীর সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কোথায় রাণী? কিছু দূর এগিয়ে সোনেরেখা নালা পেরিয়ে যেখানে জমি একটু সমান সেখানে তারা দেখতে পেলে যে, রাণীর ঘোড়া অনতিদূরে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ তাকাচ্ছে। রক্তের গন্ধে তার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, আর নাক ফুলিয়ে সে পা ঠুকছে। দূর হতেই তাঁরা দেখতে পেলেন ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন রাণী। রক্তধারা ঘোড়ার পিঠ বেয়ে ঝরে পড়ছে মাটিতে। গুলমুহাম্মদ ছুটে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললেন এবং বালকের মতো ক্রন্দন করতে করতে রাণীকে নিয়ে এলেন। গঙ্গাদাস বাওয়ার পরিত্যক্ত একটা ভিটা ছিল সেখানে। ভিটার পাশেই ছিল একটি বিশাল ঘাসের গঞ্জী। সেইখানে রাণীকে সন্তর্পণে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাঁরা মাটিতে শোয়ালেন। রামচন্দ্ররাও দেশমুখ আর কাশী কুন্‌বীন্ দামোদররাওকে নিয়ে এলেন। সোনেরেখার কর্দমাক্ত জল উত্তরীয় সিক্ত করে বারবার রাণীর কপালে, চোখে এবং মুখে সিঞ্চন করা হল।

সন্ধ্যা সমাসন্ন। দূরে দূরে যুদ্ধ ক্ষান্তির কোলাহল, কোথাও বা আহতের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। কামানের গোলা এবং বন্দুকের গুলী তখনও মাঝে মাঝে এখানে সেখানে সশব্দে বিদীর্ণ হচ্ছে।

রাণীর জ্ঞান ফিরে এল। শোকবিহ্বল অনুচরবৃন্দ ও হতবুদ্ধি দামোদর প্রত্যেকের দিকে চাইলেন তিনি। গলায় সোনার পৈতের সঙ্গে ক্ষুদ্র তাম্র আধারে গঙ্গাজল বহন করতেন রামচন্দ্র দেশমুখ। ধার্মিক ও আচারনিষ্ঠ এই ব্রাহ্মণ যুদ্ধক্ষেত্রেও গঙ্গাজল বহন করতেন বলে আগে আগে রাণী কতই না কৌতুক করেছেন। আজ রাণীর ওষ্ঠাধরে উক্ত আধার হতে গঙ্গাজল দেবার সময় সম্ভবতঃ সেই সব স্মৃতি জাগরূক হল রামচন্দ্রের মনে।

তারপর রাণী মৃদু অথচ পরিষ্কার গলায় তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বললেন, "আমার প্রতি যে আনুগত্য তোমরা দেখিয়েছ,

অনাথ আনন্দের প্রতি তা অটুট রেখো। আমার যে অলঙ্কার ও অর্থ রইল তার থেকে আমার ফৌজকে টাকা দিও। আমার মৃতদেহ যেন ফিরিঙ্গীর হাতে না পড়ে।”

এই কথাগুলিই তাঁর শেষ কথা। এবং এর পরই তিনি অন্তিম-নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। যেন এই কথাগুলি বলবার জন্যই তিনি এতক্ষণ প্রাণ ধরে রেখেছিলেন।

তেইশ

সৃষ্টির প্রারম্ভে কোটি কোটি মানুষের সুখদুঃখ ও জন্ম-মৃত্যুর লীলাভূমি এই পৃথিবী যখন মহাবারিধির অতল তলে জাগরণের স্বপ্ন দেখছে, সেই থেকে প্রত্যহ যেমন করে সন্ধ্যা নেমেছে, সেদিনও তেমনি করেই সন্ধ্যা নামল। অদূরে পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে গোয়ালিয়ারের দুর্গ। দূরে দূরে কামানের গর্জন আর বন্দুকের বিক্ষিপ্ত শব্দ, আহতের আর্তনাদ, অশ্বের হ্রেষারব, এই পরিবেশে রাণীকে শেষবারের মতো দেখে নিল এই মাটির পৃথিবী। যোদ্ধার উপযুক্ত রণ-ভূমিতেই তিনি শেষ শয্যা নিলেন। তারপর ধীরে, অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে সেই দৃশ্যের ওপর সন্ধ্যার যবনিকা নামল। আর সেই সঙ্গে যবনিকা পড়তে লাগল ১৮৫৭—৫৮ সালের শেষ অধ্যায়ের ওপর। আকাশে সূর্য তার পরিক্রমা সমাপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গেই রাণী তাঁর জীবনের পরিক্রমা শেষ করলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত হল ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে একটি গৌরবময় অধ্যায়ের পরিক্রমণ।

কতিপয় ভক্ত অনুচর রাণীর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন। রক্তাক্ত ললাট সিক্ত উত্তরীয়ে মুছে নিলেন রঘুনাথ সিংহ। রণক্লান্ত চরণ থেকে চর্ম-পাদুকা উন্মোচন করলেন কাশী। আর হাত থেকে খুলে নিলেন বর্ম, কোমর থেকে উন্মোচন করলেন পাশ্‌খুব এবং কণ্ঠ থেকে খুলে নিলেন মুক্তোর হার। দুর্ধর্ষ গুলমুহাম্মদ, গোঁড়া হিন্দু রামচন্দ্ররাও, বিশ্বস্ত পার্শ্ববর্তিনী যোদ্ধা কাশী কুন্‌বীন, দামোদরকে ক্রোড়ে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর সেই বীরদেহ ঘাসের

গঙ্গীতে স্থাপন করে রঘুনাথ সিং চকমকি ঠুকে তাতে অগ্নি সংযোগ করলেন। ধূ-ধূ করে জ্বলে উঠল আগুন। আর সেই আগুনের শিখা ও বাতাসের হা-হা শব্দের সঙ্গে জ্বলতে লাগল হাজার হাজার মানুষের আত্মাহুতিতে পবিত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত সম্ভাবনা। লক্ষ্ণৌ, মীরাট, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী, ঝাঁসী এবং আরও কত অখ্যাত জায়গা, কত গ্রাম, কত জনপদ, কত নদীতীর, কত প্রান্তর, কত কৃষিভূমিতে যে-সুবিশাল গণঅভ্যুত্থান জন্ম নিয়েছিল, তাও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে নিঃশেষ হতে লাগল।

দাহ সমাপনান্তে মধ্যরাত্রিতে পূত অস্থি সংগ্রহ করে রাণীর পরিত্যক্ত উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধলেন রামচন্দ্ররাও। তারপর অনাথ দামোদরকে নিয়ে বালকের মতো কাঁদতে কাঁদতে তাঁরা সেই স্থান পরিত্যাগ করলেন।

মধ্যভারতের সুন্দরী নগরী গোয়ালিয়ার। সুউচ্চ তার দুর্গ বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। তার অনতিদূরে একান্তে মিঞা তানসেনের একটি মর্মর সমাধি। কখন কখন গভীররাতে শুভ্র জ্যোৎস্নায় স্নাত মূর্তিমতী টোড়ী রাগিনী নাকি শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে শ্বেতপুষ্পের মালা ধারণ করে চকিতনয়ন মৃগদম্পতি সমভিব্যাহারে সেখানে এসে বীণা বাজান বলে জনশ্রুতি আছে।

সিন্ধিয়াদের প্রাসাদে প্রাসাদে সমাকীর্ণ নগরী লস্করের কেন্দ্রে—বাড়াতে সুউচ্চ পাদপীঠে মহারাজা জয়াজীরাও সিন্ধিয়ার বিশাল মূর্তি। ভারতবর্ষের রাজাদের মধ্যে তাঁর স্থান বহুজনের ওপর। রাজানুগত্য যে পুরস্কৃত হয়, জয়াজীরাও তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেদিন যাঁরা ভারতীয়দের বিপক্ষে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের উন্নতি হয়েছে দ্রুতগতিতে।

গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়ার প্রাসাদ জয়বিলাস, মোতিমহল, ফুলবাগের পরেই দিনকররাও রাজবাড়ের অট্টালিকা।

বিশাল কুঞ্জকানন, প্রমোদ ভূমি, জলের উৎস পরিবেষ্টিত ফুলবাগ প্রাসাদ। লস্করে যাবার আগেই চোখে পড়বে সম্মুখে সেই ইন্দ্রভবন। সেইখানে ফুলবাগ প্রাসাদের মুখোমুখি পথের ওপর একটি ছোট্ট চবুতরার সামনে কৌতূহলী দর্শককে দাঁড় করাবে

টাঙাওয়ালা। ছোট্ট একটি ফুলবাগান। নগণ্য এক সমাধি। সেখানে লেখা আছে—ঝাঁসীওয়ালী মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর ছত্রী।

সেস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন রাণী লক্ষ্মীবাঈ। আকাশ তাঁর চন্দ্রাতপ। গ্রীষ্মে সূর্য তার ওপর নির্মম ময়ূখ বর্ষণ করে, বর্ষায় মেঘ বারিধারা সিঞ্চন করে আর শীতে উত্তরের বাতাস সেই সমাধি থেকে ধুলো এবং শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায়। সমাধি গাত্রে উৎকীর্ণ আছে—

'ঝাঁসী পত্তন পালিকা নৃবসনা তুঙ্গাশ্ব সঞ্চালিকা।
হস্তোদ্যত করবালিকা রণমদোন্মত্তা যথা কালিকা॥
হিউরোজ প্রমুখাম্লসৈন্যাপতির্ভিযুদ্ধে ভৃশংশ্চলিতা।
সা লক্ষ্মী ইত দৈব তূর্বিলসিতৈত্রে্র্ব যাতা দিবম্॥'

ফলক গাত্রে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে—

'This monument marks the site of the cremation of the illustrious and heroic Maharani Luxmi Bai of Jhansi, who fell in a battle in the Sepoy War of 1857—58.

Born at Benares on Nov. 19, 1835 A.D. Died at Gwalior on June 18, 1858.

The monument was conserved by the Gwalior Archaeological Department in 1929 A.D. during the reign of H. H. The Maharaja Jivaji Rao Scindia Alijah Bahadur of Gwalior.'

সেখানে যে বৃদ্ধ সমাধিরক্ষী অবসর সময়ে ফল বিক্রি করে সে অনুরোধ করে দর্শককে, "ছত্রীপর এক দো ফুল চড়াইয়ে।" পাশের বাগানে গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকা ফোটে মৌসুমে। মন যদি চায় তো দর্শক সেই শান্ত পরিবেশে দাঁড়িয়ে একটি দুটি পুষ্প চয়ন করে চবুতরার ওপর রাখুক তার জন্য সেই রক্ষী কোনও পুরস্কার চাইবে না।

চব্বিশ

রাণীর মৃত্যুতে হিউরোজ পরম আশ্বস্ত হলেন। আর গোয়ালিয়ারের পথে আসতে আসতে ঢোলপুরের রাজার আতিথ্যে সুখশয্যায় শায়িত জয়াজীরাও সিন্ধিয়াও উৎফুল্ল হলেন। দু'দিন বাদে বাজি পুড়িয়ে কামানের আওয়াজ করতে করতে সিন্ধিয়া এবং হিউরোজ মহাসমারোহে শোভাযাত্রা করে গোয়ালিয়ারে প্রবেশ করলেন। দিনকররাও রাজবাড়ের হুকুমে ঘরে ঘরে দীপ জ্বালিয়ে এই আনন্দের দিনে উৎসব করা হল। কিন্তু হঠাৎ কেল্লা থেকে কামান গর্জনে ব্যাহত হল তাঁদের শোভাযাত্রা। কেল্লাতে তখনও কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ যোদ্ধা অবরুদ্ধ হয়েছিল। তাঁরা শেষ অবধি যুদ্ধ করলেন এবং বারুদে আগুন লাগিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন।

এবার আর কোন বাধা রইল না। বিজয়োৎসব এবং বিদ্রোহীদের সাহায্যকারীদের ফাঁসি দেওয়া একই সঙ্গে চলতে লাগল।

ঝাঁসীকে শ্মশান করেও রাণীর ওপর প্রতিশোধ নেওয়া সম্পূর্ণ হয়নি। ঝাঁসীর কেল্লা দেওয়া হল সিন্ধিয়াকে। ঝাঁসীর বড় বড় কামানগুলিকে গোয়ালিয়ারে আনা হল। সকাল সন্ধ্যায় সেই সব বিদ্রোহী কামান থেকে গোলা বর্ষণ করে সিন্ধিয়াকে সম্মান জানান হবে।

এই সব ঘটনার অনেক পরে ঝাঁসী উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত হয়।

রণক্লান্ত হিউরোজ এবার পুণাতে বিশ্রামের জন্য চলে গেলেন। সেখানে নির্জন শৈলাবাসে বসে গোয়ালিয়ারের যুদ্ধের বিবরণী লিখতে লিখতে তিনি রাণীর সম্বন্ধে কি লিখবেন ভেবে ক্ষণিক থামলেন। তারপর লিখলেন—

> 'Although a lady, she was the bravest and best military leader of the rebels. A man among the mutineers.'
>
> 'নারী হলেও তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী সামরিক নেতা। বিদ্রোহীদের মধ্যে একমাত্র পুরুষ।'

শত্রুর গুণের সমাদর করার মতো উদারতা ইংরেজ চরিত্রে বিরল নয়, কিন্তু হিউরোজের এই উক্তি শুধু বীরের প্রতি বীরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নয়। তার সঙ্গে আরও কিছু আছে, কেননা ঝাঁসীই হিউরোজের জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা করল। ১৮৬০ সালে স্যার কোলিন ক্যাম্বেলের পর কমাণ্ডার-ইন-চীফের পদ পেলেন তিনি। তারপর ১৮৬৬ সালে যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁকে "Baron Strathnairn of Strathnairn and Jhansi" উপাধিতে ভূষিত করেন। ঝাঁসী জয়ের জন্যই যে তিনি উক্ত পদ ও পদবী পেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রেঙ্গুণে নির্বাসিত সম্রাট বাহাদুরশাহ্‌কে ব্যঙ্গ করে একদা ইংরেজ রেসিডেণ্ট বলেছিলেন—

'দম্‌দমে মেঁ দম্‌ নেহি হ্যায় খ্যার মাঙ্গো জান কী
বাস্‌ জাফর বাস্‌, চল্‌ চুকি অব্‌ তৈর হিন্দুস্তাঁ কি ।।'

'কামানে আর দম নেই, প্রাণের জন্য ভিক্ষা করছ জাফর, হিন্দুস্তানের তরবারির খেলা ফুরিয়েছে।

বাহাদুরশাহ্‌ উত্তর দিয়েছিলেন—

'গাজিয়োঁ মে জব্‌ তলক্‌ বাকি হ্যায় লৌ ইমানকি।
তখ্‌ত-ই-লণ্ডন তক্‌ চলেগী তৈর হিন্দুস্তাঁ কি ।।'

যত দিন শহীদরা প্রাণ দানের আদর্শের প্রতি অটুট থাকবে, ততদিন জেন লণ্ডনের তখ্‌ত পর্যন্ত চলবে হিন্দুস্তানের তরবারি।'

বাহাদুরশাহের এই উক্তির সত্যতা জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন তাঁতিয়া টোপী। রাণীর মৃত্যুর পর সম্ভবতঃ উপলব্ধি করলেন তাঁরই দোষে কি ভাবে মধ্যভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। আর শুধু তাঁরই অবহেলায় ব্যর্থ হয়েছে কত অমূল্য আত্মাহুতি। সম্ভবতঃ এই বেদনাময় চেতনাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল শেষ অবধি সংগ্রাম করতে। তাই তাঁতিয়ার জীবনের শেষ অধ্যায় অতীব গৌরবপূর্ণ। তিনি বুঝেছিলেন অমূল্য সুযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবু অদম্য সাহসে ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে লড়ে চললেন। তারপর

একদিন তাঁর পরম বিশ্বাসভাজন বন্ধু রাজা মানসিংহ কর্নেল মীডের ফৌজের হাতে তাঁকে ধরিয়ে দিলেন।

শিপ্রীতে তাঁতিয়াকে বন্দী করে আনা হল। বিচার প্রহসনের শেষে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। নির্ভীক মৃত্যুবরণে তাঁতিয়া টোপী ইংরেজদেরও বিস্ময় উদ্রেক করলেন আর অর্জন করলেন অমেয় শ্রদ্ধা।

জীবনের হিসেব খতিয়ে দেখার সময় মানুষের একবারই আসে। প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা মাথায় নিয়ে শিপ্রীতে তিনদিন কাটিয়েছিলেন তাঁতিয়া। সেই তিনদিন নির্জন চিন্তার প্রচুর অবকাশ মিলেছিল তাঁর। বেতোয়া, কুঁচ, গোলাওলী এবং গোয়ালিয়ারের যুদ্ধের কথা সে-সময়ে তাঁর নিরন্তর স্মরণ হত নিশ্চয়ই। নিদ্রাহীন রাতে বারবার মনে পড়ত, গোয়ালিয়ারে রাণীর আশাহত মুখের ছবি। বেদনায় হতাশায় সেই সুন্দর মুখ মলিন, আয়ত নেত্র দুঃখকাতর। তবু একমাত্র তাঁরই অনুনয়ে রাণী তখন তরবারি তুলে নিলেন এবং উদ্দীপ্ত উৎসাহে সাদা ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। তারপর যতদূর অবধি তাঁর নীল মুরেঠা দেখা গেল, মনে হল যেন একটি কিশোর সৈনিক অমিত তেজে ছুটে চলেছে। এই যুদ্ধের পরিণতি যে কি হবে রাণী সেদিন তা বুঝতে পেরেছিলেন। তবু জেনে শুনেই সেদিন তিনি মৃত্যুবরণ করতে ছুটে গিয়েছিলেন। পবিত্র অগ্নিশিখার মতো সেই চরিত্র যতবার তাঁর স্মরণে আসত, ততবারই শ্রদ্ধা এবং অনুশোচনায় তাঁতিয়া মাথা নিচু করতেন। অভূতপূর্ব আবেগে উৎসাহে নিজেকে এবং অপরকে উদ্দীপ্ত করে যে মৃত্যু বরণ করে গিয়েছেন রাণী, তার গৌরব-স্মৃতিতে তাঁতিয়ার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

না, তাঁতিয়া দয়া ভিক্ষা করেননি। তাঁর যুগই যখন অতিক্রান্ত তখন বেঁচে থেকে কি লাভ! মৃত্যুর জন্য তাঁতিয়াকে অধৈর্য হতে দেখে মীড আশ্চর্য হয়েছিলেন। অতি অবহেলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন তাঁতিয়া। রাজোচিত ব্যক্তিত্বে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কালো কাপড়ের আবরণ। রাজার মতো অবহেলে তিনি জীবন ত্যাগ করলেন। শিপ্রীতে তাঁর ফাঁসির স্থান সর্বজনের স্মরণীয় হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই বীর যোদ্ধার

কোন স্মৃতি চিহ্ন নেই আমাদের দেশে। শোনা গিয়েছে, অন্তিমকালে তিনি যে পরিচ্ছদ পরেছিলেন তা বিলেতে রক্ষিত আছে।

পঁচিশ

কথা ফুরিয়ে গেলেও কিন্তু কথা থাকে। তাই রাণীর কথা নিয়ে বেঁচে রইলেন অনেকে। বিড়ম্বিত-ভাগ্য দামোদররাও সেই অনেকের একজন। ষাটজন লোক, ছয়টি উট ও বাইশটি ঘোড়া নিয়ে রামচন্দ্ররাও দেশমুখ, গণপৎরাও মারাঠা, রঘুনাথ সিং, কাশী কুন্‌বীন প্রভৃতি দামোদররাওকে নিয়ে গোয়ালিয়ার ত্যাগ করলেন। তাঁরা চন্দেরী অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

পথে কোথাও তাঁদের আশ্রয় মিলল না, আহার মিলল না। ইংরেজ সৈন্যরা হুলিয়া নিয়ে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে ফিরছে। কেউ রাণীর নামোচ্চারণ করলেই তাকে হত্যা করবে তারা। কাজেই তাঁদের সাহস করে কেহ আশ্রয় দিল না। মোরেণাতে জনৈকা বৃদ্ধা রমণী দামোদরের গায়ে হাত বুলিয়ে নীরব অশ্রুপাত করলেন। গোপনে কিছু মিষ্টান্ন এনে দিলেন। জনচক্ষু এড়িয়ে তাঁরা বেতোয়া নদীর তীর ধরে চলতে চলতে পৌঁছলেন তাল-বেট-কোঠ্‌রা। চন্দেরীর অন্তর্গত এই জায়গাটি ঝাসীর অন্তর্গত ললিতপুর বা লাল্‌থাপুরের খুব নিকটে। ইতিমধ্যে দু'মাস কেটে গিয়েছে। ইংরেজ ফৌজ তাঁদের ধরবার জন্য সর্বত্র ঘুরছে।

তাল-বেট-কোঠ্‌রা গ্রামের ঠাকুর গম্ভীর সিং ও শঙ্কর সিং-এর সঙ্গে দেখা করলেন রঘুনাথ সিং। তিনি শেষদিনের যুদ্ধে কপালে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর সেই ক্ষতের বর্ণনা দিয়ে গ্রামে গ্রামে হুলিয়া ছড়িয়ে ছিল ইংরেজ। তবুও তিনি বিচলিত হলেন না। ঠাকুরদ্বয়ের সঙ্গে দেখা করে একান্ত অনুনয় করে দামোদরের জন্য কিছু আটা চাইলেন আর বললেন, দামোদরকে কোথাও থাকতে দাও। তারা আশ্রয় দিতে সাহস পেল না কারণ ললিতপুরে তখন ইংরেজরা ঘাঁটি করেছে। ঠাকুরদ্বয় রঘুনাথকে বললেন,—

আপনাদের অস্তিত্ব জানতে পারলে ইংরেজ নিঃসন্দেহে আপনাদের ও আমাদের হত্যা করবে। তার চেয়ে আপনারা জঙ্গলে থাকুন। আমরা লুকিয়ে আপনাদের খাদ্য সরবরাহ করব।

ইংরেজদের ও গ্রামবাসীদের নজর এড়াবার জন্য রঘুনাথ সিং দলটিকে চার ভাগে ভাগ করলেন। পনের মাইল এলাকা জুড়ে তাঁরা ছড়িয়ে রইলেন। ব্যবস্থামতো শঙ্কর সিং ও গম্ভীর সিং একটি দলের কাছে আটা, ঘি, চিনি ইত্যাদি পৌঁছে দিতেন। তারপর সেখান থেকে দলের সকলের মধ্যে খাবার সরবরাহ হত। রাণীর সঙ্গে প্রচুর অর্থ এবং তাঁর ব্যক্তিগত অলঙ্কারাদি কিছু ছিল। মৃত্যুকালে তাঁর আদেশ ছিল যে, তাঁর সৈন্যদের মধ্যে যেন এই অলঙ্কারাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভাগ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কার্যকালে তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। সেই অলঙ্কার ও অর্থই বিপৎকালে দামোদররাও ও অনুচরবৃন্দকে বাঁচিয়ে রাখল। গম্ভীর সিং তাঁর সাহায্যের বিনিময়ে মাসে পাঁচশ' সিক্কা করে নিতে লাগলেন। ঝাঁসীর মুদ্রা বলে সেগুলিকে রাতে গালিয়ে ফেলা হত যাতে কেউ রাণীর নামাঙ্কিত মুদ্রা চিনতে না পারে। শঙ্কর সিং নয়টি ঘোড়া ও চারটি উট নিয়ে নিলেন। এই সময় রামচন্দ্ররাও দেশমুখকে দামোদর সম্বন্ধে ইংরেজ সরকারের প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য কোঠ্‌রা ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে হল। যাবার সময়ে দামোদর, বালারাওকে (রামচন্দ্র দেশমুখের অপর নাম) যেতে দেবে না বলে কাঁদতে লাগলেন। কিন্তু তবু তাঁকে যেতেই হল। তখন দামোদর রইলেন রাণীর প্রিয় সহচরী কাশী কুন্‌বীন্, রঘুনাথ সিং, লক্ষ্মণ পাচক ও বালুগোডবোলে সাগরীদ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে। তাঁরা সবসুদ্ধ দশজন ছিলেন।

বনে অরণ্যে এই পলাতক জীবনে দামোদরের তত দুঃখ ছিল না। কিন্তু তাঁর সামনে সামান্য খাদ্য ধরে যখন কাশীবাঈ অশ্রুমোচন করতেন, তাঁর নগ্নপায়ে হাত বুলিয়ে যখন রঘুনাথের মতো বীরের চোখেও জল পড়ত, তাঁর মায়ের নামমাত্র উচ্চারণে যখন বালকের মতো রামচন্দ্ররাও রোদন করতেন তখন কারণ বুঝতে না পারলেও দামোদর দুঃখে অভিভূত হতেন।

বিড়ম্বিত-ভাগ্য বালককে সান্ত্বনা দিত কেবলমাত্র অরণ্যের অনাবিল প্রকৃতি। কোঠ্রা থেকে পাঁচ মাইল দূরে যেখানে বেতোয়ার ফেনিল জলরাশি পাঁচশ' ফুট উঁচু থেকে ভীমগর্জনে নিচে আছড়ে পড়ছে সেখানে ছিল অবহেলিত ও অবজ্ঞাত একটি মহাদেবের মন্দির। কবে যেন জনপদ ছিল সেখানে। পুরনারীরা প্রভাতে ও সন্ধ্যায় মহাদেবের উদ্দেশে দুধ গঙ্গাজল ও বিল্বপত্রের অর্ঘ্য রেখে যেতেন সেই মন্দিরে। সেখানে এক গুহায় রাত্রিবাস করতেন তাঁরা। বেতোয়ার জল যেখানে কুণ্ড রচনা করেছে সেখানে বালক দামোদর স্নান করতেন আর দেখতেন মাছেরা কেমন আপন মনে খেলা করে বেড়াচ্ছে। যখন লুকিয়ে মাছকে খেতে দিতেন তখন মনে পড়ত সেই তিন বছর আগের কথা। ঝাঁসীর রাজপ্রাসাদে মায়ের সঙ্গে বসে রামনাম লেখা কাগজ আটার মণ্ডতে ভরে কতদিন টিক্‌লি বানিয়ে মাছকে খেতে দিতেন। আর সেই সময় মা কেমন শিবজী মহারাজের কথা আর রামলক্ষ্মণের গল্প শোনাতেন। নির্জন নদীতীরে আন্‌মনা বালককে খুঁজতে খুঁজতে কাশী সেখানে এসে পড়তেন। তারপর বনের ফুল তুলে, ফল খুঁজে এনে তাঁকে আনন্দ দিতেন, আর এ কথা সে কথায় তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন।

এক জায়গায় থাকা তাঁদের পক্ষে বেশিদিন সম্ভব হত না। অরণ্যচারী কাঠুরিয়া ও শিকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের ভয় সব সময়ই ছিল। সেই মহাদেব মন্দির থেকে চার মাইল দূরে গিরিশিখরে বাবা সিদ্ধনাথের নামে একটি কুণ্ড ছিল। তার জল কখনও ফুরোত না। কখনও কখনও সেখানেও থাকতেন তাঁরা। শীতে ও বর্ষায় তাঁদের কষ্ট হত সবচেয়ে বেশি। সিংহ, বাঘ ও সাপের লীলাভূমি সেই অরণ্য। কখনও জন্তুর ভয়ে মাচানেও রাত্রিবাস করতেন তাঁরা। তবে মানুষের চেয়ে জানোয়ারকে তাঁদের ভয় ছিল কম।

এইভাবে দু'বছর কাটিয়ে দামোদরের দেহ ভেঙে পড়ল। দুরন্ত জ্বর ও আমাশয় রোগে তিনি শয্যা নিলেন। দামোদর চিরদিনই কোমলাঙ্গ ছিলেন। ঝাঁসীর রাণী তাঁকে অত্যন্ত আদরে লালন পালন করেছিলেন। অরণ্য-জীবনের দুঃখ কষ্ট তাঁর আর সহ্য হল না। অসুস্থ দামোদরের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন রঘুনাথ সিং।

রঘুনাথের চেহারা লাল্‌তাপুর এবং তালবেট অঞ্চলের লোকদের

কাছে পরিচিত। কাজেই লোকালয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয় বলে কাশী কুন্‌বীন্‌ গভীর রাত্রে সেই অরণ্যপথ দিয়ে একাকিনী নির্ভয়ে কোঠ্‌রা গেলেন। সেখানে শঙ্কর সিং-এর কাছে অনুনয় বিনয় করে একজন বৃদ্ধ চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ফিরে এলেন। সেই বৃদ্ধের অন্তর ঝাঁসীর রাজ্যচ্যুত কুমারের দুর্দশায় বিগলিত হল। তিনি তাঁকে সুস্থ করে তুললেন।

মৃত্যুকালে রাণী যে অর্থ রেখে যান তার থেকে কিছু অবশ্য তাঁর ফৌজকে দেওয়া হয়েছিল, বাকি সত্তর হাজার টাকা রঘুনাথের কাছে তখনও ছিল। কিন্তু ঠাকুররাই তার অধিকাংশ নিয়ে নিয়েছিল। রাণীর নামাঙ্কিত অলঙ্কার খোলাবাজারে নিয়ে যাওয়া যেত না। ঠাকুর গম্ভীর সিং ও শঙ্কর সিং সেই অলঙ্কারেরও অধিকাংশই আত্মসাৎ করল। তারপর যখন জানল যে, এঁদের কাছে আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তখন তারা ইংরেজকে খবর দেবে বলে তাঁদের ভয় দেখাল। অগত্যা তাঁরা সেইস্থান ত্যাগ করলেন। যাবার আগে শঙ্কর সিংহের কাছ থেকে মাত্র তিনটি ঘোড়া পাওয়া গেল। বাইশজন লোক কেবল তিনটি ঘোড়া নিয়ে আবার অনির্দিষ্ট যাত্রা শুরু করল। প্রথমে তাঁরা শিপ্‌রী গেলেন। সেখানেই তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি হয়েছিল। সর্বত্র ইংরেজের চর বিদ্রোহীদের খুঁজে ফিরছে। একদিন ক্লান্ত হয়ে তাঁরা এক ফলের বাগানে বসেছিলেন। সেই সময় বাগানের মালিক জমিদার এসে, 'তোমরা নিশ্চয়ই ঝাঁসীর রাণীর লোক, নইলে পালিয়ে বেড়াচ্ছ কেন,' বলেই চেঁচাতে শুরু করল। রঘুনাথ সিং তখন তাঁর নিজের আঙটি ঘুষ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করলেন। কিন্তু সে যাত্রা রক্ষে পেলেও বেশিদিন আর পালিয়ে বেড়ান চলল না। ছিপ্পাবরোটে একজন বানিয়া তাঁদের ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দিল। বন্দী অবস্থায় তাঁরা পাটনের এজেন্টের কাছে প্রেরিত হল। বেতোয়ার তীর ধরে তাঁরা হেঁটে চললেন। রাণীর অনুচররা দামোদরকে পিঠে করে নিয়েছিলেন।

বনে জঙ্গলে যখন দামোদররাও রঘুনাথের সঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন, তখন নন্নে খাঁ রিসালদার এবং গণপৎরাও মরাঠা দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পাটনে রাজা পৃথ্বী সিংহের কাছেই তাঁরা

ছিলেন। পাটনের কাছেই আগর। আগরে ছিলেন মেজর ফ্লিক্। ফ্লিক্ (Flick) দয়ালু এবং করুণাপরবশ স্বভাবের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নন্নে খাঁ একদিন ফ্লিক্-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, "ঝাঁসীর রাণীর একটি অবোধ বালকপুত্র আছে। তার বয়স এখন বারো। ইংরেজের ভয়ে সে পশুর মতো বনে জঙ্গলে সঙ্গীদের সঙ্গে লুকিয়ে আছে। প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশরাজ কি সেই হতভাগ্য বালককে ক্ষমা করতে পারেন না?" এই বলে নন্নে খাঁ ফ্লিককে কাতরভাবে অনুরোধ করলেন, "আপনি দয়া করে এই বালককে বাঁচান।" মেজর ফ্লিক মধ্যভারতের এজেন্ট ইন্দোরস্থিত কর্নেল শেক্সপীয়ারকে চিঠি দিয়ে জানালেন, "তিনি যেন দামোদরকে আশ্রয় দেন।" শেক্সপীয়ার ফ্লিককে জানালেন, "হ্যাঁ, তাঁর কাছে সেই বালককে নিয়ে এলে তিনি আশ্রয় দেবেন।" নন্নে খাঁ ফ্লিক-এর দু'জন ইংরেজ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে পাটনে এলেন। গণপৎরাও মরাঠাকে নিয়ে তিনি যখন দামোদরকে খুঁজতে বেরিয়েছেন তখন পথে বেতোয়ার তীরে তাঁদের সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সাক্ষাৎলাভ ঘটল। গণপৎরাও মরাঠা দামোদরকে দেখে অশ্রু মোচন করতে করতে বললেন, "এই সেই বালক, এরই জন্য বাঈসাহেব লড়েছিলেন।" তারপর তিনি সযত্নে দামোদরকে সঙ্গে নিয়ে পাটনে এসে উপস্থিত হলেন।

ঝাসীর রাণী তখন সমগ্র ভারতবর্ষে একটি নিষিদ্ধ নাম। তবুও পাটনে রাজা পৃথ্বী সিংহ সাদরে দামোদরকে অভ্যর্থনা করলেন। দামোদরের এবং রঘুনাথ সিংহের আত্মসম্মানে কোন রকম আঘাত না দিয়ে তিনি সবিনয়ে বললেন, "সেই বীর রমণীর পুত্রের জন্য আমাকে কিছু করতে দিন।" দামোদরের জামা কাপড় শয্যা ইত্যাদি তৈরি করালেন তিনি। দামোদরকে তাঁর বাড়িতে অতি আদরে রাখলেন। প্রত্যহ তাঁকে দশটি করে টাকা দিতেন। তাঁর সঙ্গীদের জন্য বস্ত্র, শয্যা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে বললেন, "আমার এখানে থাকলে আমিই আপনাদের পেন্সনের ব্যবস্থা করে দেব।" রঘুনাথ রাজী হলেন না। তখন বিষণ্ণচিত্তে পৃথ্বী সিংহ তাঁদের বিদায় দিলেন। সেখান থেকে দামোদর ম্যাগাজিন-এ এলেন। এখানে দামোদরকে নজরবন্দী করে রাখা হল। তিন মাস বাদে

তাঁরা আগর ক্যান্টনমেণ্ট-এ পৌঁছলেন। আগরে মেজর ফ্লিক-এর সঙ্গে দেখা করবার জন্য কিছু উপহার নেওয়া প্রয়োজন। অথচ রঘুনাথরাও তখন একেবারে নিঃসম্বল। রাণীর অলঙ্কারের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল শুধু বত্রিশ তোলা ওজনের সোনার বালা-জোড়া। দামোদর আগে আগে এই বালা দেখে বলতেন, "এত সুন্দর গহনা আছে, তুমি তো মা কিছুই পর না ?" রাণী বলতেন, "আমি আর পরব না। তোমার বৌ এলে তাকে এই সব পরাব।" এবার সেই স্মৃতিবিজড়িত বালা-জোড়া রঘুনাথ বিক্রি করলেন এবং সেই অর্থে উপহার কিনে ফ্লিক-এর সঙ্গে দেখা করলেন।

কিন্তু দামোদরের জন্য কিছু করা ফ্লিকের সাধ্যাতীত। কারণ ঝাঁসী মধ্যভারতে। একমাত্র মধ্যভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধিই তাঁর জন্য কিছু করতে পারেন।

৫ই মে, ১৮৬০। দামোদর ও তাঁর সঙ্গীরা ইন্দোরে মধ্য-ভারতের রাজনৈতিক প্রতিনিধি স্যার রিচমণ্ড শেক্সপীয়ার (Richmond Shakespeare)-এর সঙ্গে দেখা করলেন। কাশ্মীরি মুন্সী ধরমনারায়ণকে দিয়ে শেক্সপীয়ার তাদের সব বন্দোবস্ত করলেন।

দু'চারজন ব্যতীত দামোদরের অন্য সকল সঙ্গীকে বরখাস্ত করলেন শেক্সপীয়ার। এইবার দামোদরের কাছ থেকে রাণীর পার্শ্বচর রঘুনাথরাও রিসালদার ও কাশীর বিদায় নেবার মুহূর্ত সমুপস্থিত। রাণীর পুত্রকে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে তাঁরা রাণীর ঋণ শোধ করেছেন। চোখের জল মুছতে মুছতে দামোদরকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন। আর সেই যে চলে গেলেন, তারপর থেকে তাঁদের আর কোন সন্ধানই মেলেনি। ১৮৫৭-৫৮ সালের যোদ্ধাদের কেউ কেউ তখনও জীবিত ছিলেন। কাজেই বহুদিন ধরে তাঁদের নামে হুলিয়া চালু ছিল। তাই আ-মৃত্যু ভারতবর্ষের হাটে মাঠে ঘাটে বনে জঙ্গলে তাঁরা আত্মগোপন করে ফিরেছেন। ঘর ছাড়া হয়ে, প্রিয়জনের সঙ্গ বিচ্যুত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই বীর সৈনিকরা নানাস্থানে নানাভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। একদা শোনা গিয়েছিল ঝাঁসীর রাণীর অনুচরদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা প্রতিবৎসর কুম্ভমেলায় মিলিত

হবেন। তাঁদের কোন একটা সঙ্কেত থাকবে এবং তার দ্বারা তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পারবেন। সে-কথা সত্য কিনা তা-ও আজ নিরূপণ করবার উপায় নেই।

প্রকৃতপক্ষে '৫৭-৫৮ সালের পর এমন নির্মম অত্যাচার চলেছিল যে, যোদ্ধারা তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করতে ভয় পেতেন। শুনেছি এলাহাবাদের গ্রামে এক বৃদ্ধ চাষী মৃত্যুকালে প্রকাশ করে গিয়েছে যে, সে বান্দার নবাবের সঙ্গে ছিল এবং ঝাঁসীর রাণীকে কাল্পিতে দেখেছিল। হয়ত তাদেরই মতো কোথাও নগণ্য এবং অখ্যাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন রঘুনাথ ও কাশী। ইতিহাস তাঁদের প্রসঙ্গে একেবারে নিরুত্তর।

ইন্দোরে এসে দামোদররাও শাস্ত্রমতে রাণীর শেষকৃত্য করলেন। রামচন্দ্ররাও তখনও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। শেক্সপীয়ার দামোদরের জন্য ১৫০ টাকার সরকারী বৃত্তি বন্দোবস্ত করলেন। ইন্দোরে ধরমনারায়ণের কাছে দামোদর ফার্সী, মারাঠি ও ইংরেজী শিখলেন এবং সেখানেই বড় হলেন তিনি।

গঙ্গাধর-এর মৃত্যুর পর এবং ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তির সময়ে ডালহৌসী ঝাঁসীর রাজকোষে গচ্ছিত পাঁচ লক্ষ টাকা এবং রাজার খাজগী সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, দামোদর সাবালক হলে সেই সব পাবেন। পারোলা, কাশী এবং পুণাতেও গঙ্গাধররাও-এর নিজের বাড়ি ছিল। কিন্তু সাবালক হলে দামোদররাও জানলেন যে, সেই সম্পত্তির কিছুই তিনি পাবেন না। কেননা তাঁর মা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। বৃদ্ধদের মুখে ঝাঁসীর গৌরবকাহিনী শুনে এবং Jhansi Blue Book-এ সব পড়ে তিনি নিজের হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের প্রয়াস করেন, কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হবে জেনে অবশেষে ক্ষান্ত হন।

দামোদররাও ইতিহাসের ক্রীড়নক। ভাগ্য তাঁকে নিয়ে পুতুল-খেলা খেলেছে। ঝাঁসীর রাজসিংহাসন তিনি পাবেন, এই ভরসায় বাসুদেব তাঁকে দত্তক দিয়েছিলেন। পরে পুত্রের নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয় জেনে বাসুদেব তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি দামোদরকে

দেবার চেষ্টা করেন। তাঁর আর কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু প্রবল রাজরোষের ভয়ে তাঁর সে ইচ্ছাও ফলবতী হল না। দামোদর-এর আপন জননী, বাসুদেবের পত্নী, একবার পুত্রকে দেখতে এসেছিলেন। কিন্তু দু'জনেই দু'জনকে দেখে মর্মাহত হলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদ তখন দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে ভিন্ন পথে নিয়ে গিয়েছে। পুনর্মিলন অসম্ভব জেনে ভগ্নহৃদয়ে বাসুদেবের স্ত্রী ইন্দোর ত্যাগ করলেন। অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাস, পিতামাতা জীবিত থাকা সত্ত্বেও দামোদর অনাথ! যাবার সময় তিনি নিজের কিছু অলঙ্কার দিতে চেয়েছিলেন, দামোদর তা'ও প্রত্যাখ্যান করলেন। কেননা এই মাকে তো তিনি জানেন না। তিনি কেবল এক মাকেই জানতেন, সেই মা আজ আর নেই।

দামোদররাও-এর পূর্ব পিতা বাসুদেবের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র কাশীনাথহরিভাও বা লালাভাও। তিনি ১৮৫৭-৫৮-তে ঝাঁসীতে তহসিলদার ছিলেন। তাঁর পত্নী ১৮৭১ সালে ঝাঁসী থেকে ইন্দোর এলেন। দামোদরকে দেখে দুঃখে ও করুণায় তাঁর হৃদয় বিগলিত হল। লক্ষ্মীবাঈ-এর পুত্র দামোদর বৃদ্ধ রামচন্দ্ররাও-এর সঙ্গে একখানি সামান্য গৃহে বাস করেন এবং দীনহীনভাবে থাকেন দেখে তাঁর অসহ্য বোধ হল। তিনি দামোদররাওকে বললেন—তুমি বিবাহ কর। কিন্তু বিবাহে অর্থের প্রয়োজন। ইংরেজ সরকার কোন আর্থিক সাহায্য করতে রাজী হলেন না। তখন এই শুভার্থিনী বললেন—তোমার মাতা আমার কন্যাস্থানীয়া স্নেহাস্পদা হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তাঁর অনুগ্রহে জীবন ধারণ করেছি। তাঁর কাছে কত কৃপাপ্রার্থীকে যে আমি পাঠিয়েছি কিন্তু কাউকে তিনি বিমুখ করেননি। আজ তোমার বিবাহ আমিই দেব, তাতে সেই পুণ্যশীলার আত্মা তৃপ্ত হবে।

ইন্দোর নিবাসী বাসুদেবরাও ভাটোরেকারের কন্যার সঙ্গে তিনি দামোদরের বিবাহ দিলেন। ১৮৭২ সালে সেই কন্যার মৃত্যু হয়। তারপর বলবন্তরাও মোরেশ্বর শিরড়ের কন্যার সঙ্গে আবার তাঁর বিবাহ হল। এই বিবাহের ফলে ১৮৭৯ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র লক্ষ্মণরাও-এর জন্ম হয়। ইনি আজও জীবিত।

১৮৭০ সালে ইন্দোরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দামোদররাও তখন কিছু অর্থ ধার করেন। কিন্তু তাঁর অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কুশীদজীবীরা সেই ঋণকে আট হাজার টাকা বলে দেখায়। দামোদররাও-এর বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও, ইন্দোরের রেসিডেণ্ট জেনারেল মীড (Meade) এবং পরে স্যার হেনরী ডেলি (Henry Delly) তাঁকে কোনরকম সাহায্য করলেন না। অবশেষে তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের নিকট দামোদররাও আপীল করলেন। নর্থব্রুক-এর সম্মতিতে ইন্দোরের রেসিডেণ্ট দামোদররাওকে এককালীন দশ হাজার টাকা এবং মাসিক ২০০৲ বৃত্তি নির্দিষ্ট করলেন।

তারপর দামোদররাও তাঁর হৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বার বার বিলাতে আপীল করেন। কিন্তু ১৮৮২ সালে তাঁকে যে কথা জানান হয়, তাতেই এই প্রসঙ্গের পূর্ণচ্ছেদ ঘটে। বিলেত থেকে জবাব এল—

> 'The confiscation of the private possessions of the Jhansi Raj consequent on the rebellion of the Rani, during the mutiny of 1857, has long since been carried into effect, and I see no reason to reopen the question. The memorialist, who appears to have been treated with reasonable liberality may therefore be informed that I decline to interfere on his behalf.'

> '১৮৫৭-৫৮ সালে রাণী বিদ্রোহে যোগদান করবার ফলে ঝাঁসী-রাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বহুদিন হল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমি সেই প্রসঙ্গ পুনরুত্থান করবার কোন প্রয়োজন দেখছি না। আবেদনকারীর প্রতি যথেষ্ট উদারতা প্রদর্শিত হয়েছে এবং তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হোক যে, এই ব্যাপারে আমি আর হস্তক্ষেপ করতে প্রস্তুত নই।'

তখন কোন কোন ব্যক্তির উৎসাহে দামোদররাও বিলাত যাবার পরিকল্পনা করলেন এবং সাহায্য চেয়ে একশ' একুশজন ধনীলোকের কাছে আবেদন করলেন। বেরিলীর রাজা রামচন্দ্র এক হাজার

টাকা পাঠালেন, কিন্তু আর কেউ তাঁকে সাহায্য করলেন না। অতএব সেই পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন দামোদররাও।

ভারতের ইতিহাসে সামন্ত যুগ অতিক্রান্ত। ধনতন্ত্রের যুগ আগতপ্রায়। এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে দামোদররাও সম্ভবতঃ তাঁর হৃতভাগ্য ও বিড়ম্বিত জীবনের কথা ভাবতেন। রাণী তাঁকে দত্তক না নিলে এইরূপ দুর্ভাগ্য তাঁকে বরণ করতে হত না। কিন্তু তাই বলে কি রাণীর সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিযোগ ছিল? অনেক নীরব সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ অবসরে তাঁর মনে পড়ত বাল্যের কথা। মনে পড়ত কখনও হঠাৎ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। ঘরের প্রদীপ নির্বাপিত। তখনি মা তাঁকে স্নেহময় হাত বুলিয়ে আশ্বস্ত করে প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন। আবার মনে পড়ত ঘরে বসে দুপুরে মা কেমন সুর করে তাঁকে চাণক্যশ্লোক শোনাতেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনতেন আর দেখতেন মা'র গলায় কেমন সুন্দর মুক্তোর মালা দুলছে। আরো মনে পড়ত, কেল্লার যুদ্ধের সেই উত্তেজনাভরা রাতগুলি। যত রাতই হোক না কেন মা একবার এসে তাঁকে দেখে যেতেন এবং হেসে বলতেন—দেখ না, ফিরিঙ্গীদের কোথায় হটিয়ে দিই। তারপরে এল সেই রাত, যেই রাতে গভীর আঁধারে মায়ের কোলে বসে ঘোড়ার পিঠে ছুটে চলেছেন দামোদর। অনেকেই তাঁকে মায়ের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছে। কত জনের কাছে কত কথা শুনেছেন তিনি, কিন্তু কোন ছবিই যেন তাঁর মা'র পূর্ণ ছবি নয়। বাল্যের সব কথা সকলের স্মৃতিতে জাগরূক থাকে না। কিন্তু তেমন কোন ঘটনা হলে তা স্মৃতিতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা থাকে। তাই যুদ্ধের কথা দামোদরের অনেক সময় মনে পড়ত। অশ্বের হ্রেষা, অস্ত্রের ঝঞ্চনা, হাতীর বৃংহণ আর আহতের আর্তনাদ। তারই পটভূমিকায় কেন যেন তাঁর বার বার মনে পড়ত গোয়ালিয়ারে এক সন্ধ্যায় দুটি বড় বড় চোখের স্নেহ-দৃষ্টি তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে—মা যেন কোথায় কত দূরে চলে যাচ্ছেন, আর তাঁকে ধরা ছোঁয়া যাবে না! আবার কখনও মনে পড়ত সকাল বেলা সারেংগী ঘোড়ীকে প্রাঙ্গণে এনেছে

সাগরীদ। প্রতীক্ষায় অধীর সারেংগী ডেকে উঠছে, আর সিঁড়ি দিয়ে মা পাঠানী পোশাক পরে নেমে আসছেন।

দামোদররাও

এইসব কথা ভেবে ভেবে পলাতক ভাগ্যকে ধরবার চেষ্টায় দেহ ও মনে দামোদর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সারেংগী ঘোড়ীর পিঠে তাঁর মা'র একখানি ছবি স্মৃতি থেকে আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এই ছবিকে তিনি নিত্য পূজা করেছেন।

ইন্দোরের রাজা তুকাজী হোলকার থেকে শুরু করে প্রত্যেকে দামোদরকে ঝাঁসীর রাণীর পুত্র বলে সম্মান করতেন। উনিশশ' ছ' সালের আঠাশে মে ভাগ্যহত দামোদররাও যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তখন তাঁর বয়স আটান্ন বৎসর।

রাণীর অনুচরবর্গের মধ্যে রামচন্দ্ররাও ইন্দোরে ১৮৮৮ সালে মারা যান। জীবনের শেষদিন অবধি এই ব্রাহ্মণ পরম নিষ্ঠার সঙ্গে দামোদরের সেবা করেছিলেন।

মৃত্যুকালে রাণীর কোমরে যে ছোরা এবং মাথায় যে পাগড়ি ছিল, তা রামচন্দ্রের কাছে গচ্ছিত ছিল। দামোদররাও-এর বয়ঃপ্রাপ্তি হলে সেই ছোরা ও পাগড়ি তাঁকে দেওয়া হয়। পরম দুঃখের বিষয় সেই অমূল্য স্মৃতি চিহ্নের কোন সন্ধানই আজ মেলে না।

দামোদররাও-এর পুত্র লক্ষ্মণরাও ইন্দোর রেসিডেন্সিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। তাঁর পেশা ছিল টাইপ করা। তাঁর দুই পুত্র। যুক্তপ্রদেশ সরকার দামোদররাও-এর বৃত্তির এক চতুর্থাংশ—পঞ্চাশ টাকা, আজও তাঁকে দেন। তবে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই এই বৃত্তি বন্ধ হবে।

লক্ষ্মণরাও-এর জীবন সম্বন্ধে কিছু কথা না বললে এ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ হবে না। দামোদরের প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে ঝাঁসীর বিখ্যাত গ্রন্থকার ও এ্যাডভোকেট বৃন্দাবনলাল বর্মার সঙ্গে একদা লক্ষ্মণরাও-এর আলোচনা হয়। তখন আইন দেখে এই স্থির হয় যে, ঝাঁসীর রাজকোষে যে টাকা ছিল, তা গচ্ছিত টাকা বা Trust money। নাবালকের গচ্ছিত টাকা, যার ওপর রাণীর কোন অধিকার সরকার স্বীকার করেননি, তা রাণীর বিদ্রোহে যোগদানের অপরাধে বাজেয়াপ্ত করা যায় না।

লক্ষ্মণরাও এই বিষয়ে বিলেতে আপীল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিণাম চিন্তা করে ক্ষান্ত হন।

ইন্দোরে ইম্‌লীবাজারে এই অশীতিপর বৃদ্ধ আজও বাস করেন। সাধারণ স্বল্পবিত্ত সঙ্গতিতে অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন। পিতার কাছে এবং নিজের শৈশবে রামচন্দ্ররাও দেশমুখের কাছে রাণীর সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা শুনেছেন।

ইন্দোরের জনসাধারণ এই সরলচিত্ত নিরহঙ্কার বৃদ্ধকে ঝাঁসী-ওয়ালে বলে সম্মান জানায়। কিন্তু এই নাম তাঁর কাছে বিড়ম্বনা মাত্র। ঝাঁসীতে একবার মাত্র তাঁকে বৃত্তি আনবার জন্য যেতে হয়েছিল। সেই সময়ে, কেল্লা দেখে তাঁর মানস-পটে ভেসে উঠেছিল সেই দৃশ্য যেখানে ঝাঁসীর রাণী তাঁর পিতাকে পিঠে নিয়ে কেল্লার পশ্চিম প্রান্তের সমতল ভূমি দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। ঝাঁসী দেখে তাঁর পিতার নিকট শোনা আরও অনেক কাহিনীর টুকরো টুকরো স্মৃতি তাঁর মনে পড়ল; কিন্তু তাদের সঙ্গে যেন তাঁর কোন বন্ধন অনুভব করলেন না। নিতান্ত দর্শকের মতোই তিনি সব দেখে ফিরে আসেন।

রাণীর পুণ্যস্মৃতির বাহক নাগপুরের তাম্বে পরিবার।

মোরোপন্ত তাম্বে অবরুদ্ধ কেল্লাতে যখন প্রতিরোধ সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন তাঁর পত্নী, রাণীর বিমাতা চিমাবাঈ, শিশুপুত্র চিন্তামণিকে কোলে নিয়ে স্বামীর নিকট উপস্থিত হলেন। স্বামীকে বললেন, "তুমি আমার কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দাও। বল, আমি কি করব।" মোরোপন্ত তখন সংগ্রামের আদর্শে উদ্দীপিত। তিনি কন্যাকে

ত্যাগ করে আত্মরক্ষা করতে রাজী হলেন না। চিমাবাঈও তাঁকে সেই অন্যায় অনুরোধ করেননি। মোরোপন্ত বললেন, "তোমার ও আমার জীবনের পথ আজ থেকে ভিন্ন হয়ে যাক। পার তো আমার শিশুপুত্রকে বাঁচাও আমি মনুকে ছেড়ে যাব না।" অগত্যা চিমাবাঈ রাণীর কাছে বিদায় নিতে গেলেন। সাশ্রুলোচনে রাণী তখন কেল্লার প্রাকারে দাঁড়িয়ে ঝাঁসীতে ইংরেজের অত্যাচারের তাণ্ডব দেখছিলেন। সেই করুণ দৃশ্যের সামনে চিমাবাঈ কিছুতেই 'যাচ্ছি' এই কথা উচ্চারণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আমার বাড়ির কি অবস্থা জানি না, একবার গিয়ে দেখে আসতে চাই।" রাণী কিন্তু সব বুঝলেন। অশ্রু মোচন করে চিমাবাঈকে এবং প্রাণপ্রিয় ছোটভাইকে আদর করে বিদায় দিলেন। রাণী চিন্তামণিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর জন্মদিনে হাতির পিঠ থেকে শহরে মিষ্টান্ন বিতরণ করেছিলেন। নিত্য ভ্রাতার জন্য নূতন নূতন উপহার পাঠাতেন। কান্নার বেগ কোন প্রকারে রুদ্ধ করে রাণী ভাঙাভাঙা কথায় আদর করে চিন্তামণিকে বিদায় দিচ্ছেন এই দৃশ্য অনেকদিন পরেও চিমাবাঈ-এর মনে ছিল।

সেখান থেকে মোরোপন্তের জনৈকা ভ্রাতৃবধূ (আপন নয়) কাকুবাঈ-এর সঙ্গে গুপ্তপথে কেল্লা ত্যাগ করলেন চিমাবাঈ। শহরের পথে কাদার মতো রক্ত জমে আছে। আহত মানুষ রাস্তায় পড়ে করুণ আর্তনাদ করছে, সুন্দর তেজস্বী ঘোড়াগুলি নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়ে পড়ে আছে, চতুর্দিকে বাড়ি ঘর জ্বলছে। এই ধ্বংসলীলার মধ্যে তাঁরা প্রথমে মুরলীধর মন্দির সংলগ্ন তাঁর বাড়িতে গেলেন। চিমাবাঈ দেখলেন তাঁর ঘরসংসার, বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার তৈজসপত্র সব লুণ্ঠিত। তারপর গলিপথে অলক্ষ্যে গা বাঁচিয়ে তাঁরা নগর প্রাচীরের সমীপবর্তী হলেন। দেখলেন প্রাচীরের দরজা বন্ধ, এবং তালাতে সীলমোহর করা। প্রতিটি দরজা বন্ধ করে হিউরোজ তখন হত্যালীলা চালাচ্ছেন। সেই দরজার বাইরে যে পরিখা আছে তা চিমাবাঈ জানতেন।

মোরোপন্তের পত্নী সম্ভ্রান্ত কুলজাতা চিমাবাঈ জীবনে কোনদিন পথে হেঁটেছেন কিনা সন্দেহ। একমাত্র শিশুপুত্রের চিন্তাই তাঁকে দুঃসাহসী করে তুলল। উত্তরীয়ে উত্তরীয়ে গ্রন্থি বেঁধে তাঁরা প্রাচীর

টপ্‌কে পরিখায় নামলেন। সৌভাগ্যবশতঃ দুরন্ত গরমে পরিখার জল তখন শুষ্ক। চিমাবাঈ প্রথমে পরিখায় নামলেন, তারপর কাকুবাঈকে ধরে নামালেন। পরিখা দিয়ে নিচু হয়ে খানিক দূর চলে মাথা তুলে যেখানে দেখলেন ইংরেজ ছাউনি নেই সেখান দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা গুরসরাইয়ের পথ ধরে অগ্রসর হলেন। ঝাঁসীকে পেছনে রেখে, ক্ষেত, পাহাড়, মেঠোরাস্তা ধরে তাঁরা চলতে লাগলেন। পথে যেতে যেতে দেখলেন ইংরেজ ফৌজেরা গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছে, আর বলছে—ঝাঁসীর একটি মানুষকে আশ্রয় দিলে বা রাণীর পক্ষের কাউকে এতটুকু সাহায্য করলে ফাঁসি দেব, গ্রাম জ্বালিয়ে দেব। রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলে চিমাবাঈ দ্বারে দ্বারে ঘুরে পুত্রের জন্য একটু খাদ্য, একটু পানীয় চেয়ে বেড়াতেন। গ্রামবাসীরা লুকিয়ে মাটির হাঁড়ি, চাল, ডাল, দুধ ইত্যাদি তাঁদের দিত। নিজেরা রেঁধে খেয়ে তাঁরা পথ চলতেন। সম্ভ্রান্তদর্শনা, পথ চলতে অনভ্যস্তা চিমাবাঈকে দেখে গ্রামবাসীরা সভয়ে বলাবলি করত, "নিশ্চয়ই বাঈসাহেব-এর কোন আত্মীয়া।"

চল্লিশ মাইল পথ চারদিন ধরে হেঁটে তাঁরা গুরসরাই পৌঁছলেন। সেখানে চিমাবাঈ-এর পিতা বাসুদেব বাস করতেন। কন্যাকে জীবিত দেখে তিনি আশ্বস্ত হলেন। পরে চিমাবাঈ বলেছেন, "শিশুপুত্রের প্রাণরক্ষার কথা না ভাবলে আমি কিছুতেই সেদিন ওরকমভাবে পালাতে পারতাম না।"

গুরসরাইয়ে থাকতে থাকতে মোরোপন্তের ফাঁসির খবর এল। এই সংবাদ চিমাবাঈ বিশ্বাস করলেন না। স্বামী যে পন্থা গ্রহণ করেছেন, তা মৃত্যুর পথ। তা জেনেও শুধুমাত্র জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করে বৈধব্য চিহ্ন ধারণ করতে তনি রাজী হলেন না। এই সংবাদের যাথার্থ্য নিরূপণ করতে কাকুবাঈকে ঝাঁসী পাঠান হল। চিমাবাঈ নিজেই যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঝাঁসীতে তাঁকে অনেকেই চেনে। কাজেই তাঁর পক্ষে সেখানে যাওয়া তখন নিরাপদ বলে বিবেচিত হল না।

ঝাঁসীর কেল্লা ত্যাগ করে আসার সময় চিমাবাঈ-এর সঙ্গে অন্তত পনের হাজার টাকার অলঙ্কার ছিল। কিন্তু বহন করে

আনতে গেলে জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বুঝে এক দরিদ্র ভাটে পরিবারে তিনি সেগুলি গচ্ছিত রেখে এসেছিলেন, কারণ দরিদ্রের গৃহ লুণ্ঠিত হবার সম্ভাবনা কম। কাকুবাঈকে চিমাবাঈ অনুরোধ করলেন তিনি যেন সেই অলঙ্কারগুলি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন।

ঝাঁসীতে এসে কাকুবাঈ খবর পেলেন মোরোপন্ত তাম্বের জোকানবাগ উদ্যানে ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। অতঃপর তিনি ভাটে পরিবারের গৃহে গিয়ে বললেন, "অলঙ্কারগুলি আমাকে দাও।" ভাটে পরিবার রাজী হলেন না। তাঁরা বললেন, "এ তো ছোটিবাঈ (চিমাবাঈ)-এর গহনা। তোমাকে দিলে কেমন করে হবে?" কাকুবাঈ বললেন, "যদি এই গহনা এখনই আমাকে না দাও আমি ব্রিটিশকে জানাব যে, তোমরা তাম্বেদের গহনা লুকিয়ে রেখেছ।" সভয়ে ভাটেরা গহনা বার করে দিলেন এবং সেই গহনাগুলি হস্তগত করে কাকুবাঈ উধাও হলেন।

ইতিমধ্যে অন্য বিশ্বস্তসূত্রে চিমাবাঈ অবগত হলেন যে, মোরোপন্তের ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি গুরসরাইয়ে স্বামীর যথাশাস্ত্র শেষকৃত্য সমাপন করলেন। পুত্রের মুখ চেয়ে একবার তিনি শোকাকুল হলেন, আবার স্বামী যে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেছেন সেই গৌরবে সান্ত্বনাও পেলেন।

১৮৬৪ সালে যখন চিন্তামণির বয়স আট বৎসর তখন তাঁর উপনয়ন দেবার জন্য চিমাবাঈ-এর পিতা ও মাতা ব্যস্ত হলেন। চিমাবাঈ মনে মনে স্থির করলেন যে, এই উপলক্ষ্যে ঝাঁসীতে এসে তাঁর হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা দেখবেন। ঝাঁসীতে এসে সব দেখে শুনে তিনি মর্মাহত হলেন। ঝাঁসী, আর সেই ঝাঁসী নেই। পুত্রকে জোকানবাগ উদ্যান দেখিয়ে বললেন যে, ওখানেই কোথাও তার পিতার ফাঁসি হয়েছে। সেই পরিচিত পথঘাটে কত স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। বেদনাহত অন্তরে চিমাবাঈ ভাটে পরিবারের কাছে গিয়ে জানলেন, কাকুবাঈ তাঁর সমস্ত অলঙ্কার আত্মসাৎ করে চলে গিয়েছেন। ঝাঁসীতে চিমাবাঈকে আশ্রয় দিলেন তাঁর দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি কৃষ্ণরাও তাম্বে। চিমাবাঈকে তিনি বললেন,

"মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, ত্রিগুণাতম, মহাবিষ্ণু প্রমুখ পঞ্চায়তন দেবতা আমার গৃহে অধিষ্ঠিত। আমি নিঃসন্তান। তুমি এঁদের সেবার ভার গ্রহণ কর। নিত্য পূজা কর, মঙ্গল হবে।" সেই বিগ্রহ আজও তাম্বে পরিবারের বাড়িতে আছে।

কৃষ্ণরাও চিন্তামণির উপনয়ন দিতে চাইলেন। কিন্তু সেজন্য যে অর্থের প্রয়োজন সে অর্থ কোথায়? নিজের গৃহ, নিজের সম্পত্তির কথা স্মরণ করে চিমাবাঈ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সব থাকতেও তাঁর পুত্র একেবারে নিঃসম্বল।

একদিন সন্ধ্যায় চিমাবাঈ তাঁর পুত্রকে নিয়ে তাঁদের পুরাতন বাসগৃহের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। অতীতের কত কথাই তাঁর মনে পড়ছিল, এমন সময় মন্দিরের পূজারী বেরিয়ে এলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কে তোমরা? কি চাও?" চিমাবাঈ উত্তর করলেন, "কিছু না। এই গৃহ একদা আমাদের ছিল। তাই আমার পুত্রকে দেখাচ্ছি।" তখন সেই ব্রাহ্মণ তাঁকে সাদর সম্ভাষণ করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, "ইংরেজ আমাকে এই গৃহ দিয়েছে, তাই এখানে বাস করছি। কিন্তু তোমার পুত্রকে নিঃস্ব করে এই সম্পত্তি ভোগ করলে আমি শান্তি পাব না।" তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, তৎকালীন হিসাবে বাড়িটির মূল্য যা হতে পারত তার চেয়ে কিছু বেশি, প্রায় নগদ আট হাজার টাকা চিমাবাঈকে দিলেন। তারপর সেই কোমল হৃদয় ব্রাহ্মণ বললেন, "তোমার স্বামী মোরোপন্ত তাম্বে, তোমার কন্যা বাঈসাহেব, তাঁদের পুণ্য কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য দিয়েছি। সাধারণ মানুষের মতোই কাজ করেছি।"

মুরলীধর মন্দির আজও সেই পুরোহিতের বংশধরদের অধিকারে। জন্মাষ্টমী এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে সেখানে অত্যন্ত ধুমধামে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

চিন্তামণির উপনয়ন ১৮৬৪ সালে সুনির্বাহ হল। ঝাঁসীতে কিছুদিন থাকবার পর দামোদররাও-এর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পেলেন চিমাবাঈ। ইন্দোরে যাওয়া কর্তব্য। অতএব যাত্রা করলেন। তাঁরা ঝাঁসী থেকে ললিতপুর, সাগর, রায়গড়, সিহোরী, ভূপাল হয়ে ইন্দোরে পৌঁছলেন। দামোদররাও-এর বিবাহের পর

চিমাবাঈ ধাবালে পরিবারের সাহায্যে ইন্দোরে খজুরীবাজারে আশ্রয় পেলেন।

ইতিমধ্যে কাকুবাঈ ১৮৫৮ সালে ঝাঁসী থেকে চিমাবাঈ-এর অলঙ্কারাদি নিয়ে ইন্দোরে এসে রাজ পরিবারে জানিয়েছেন যে, তিনিই ঝাঁসীর রাণীর বিমাতা। সেজন্য হোলকার পরিবার তাঁকে প্রত্যহ সিধা পাঠাতেন। চিমাবাঈ-এর অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করে কাকুবাঈ কাপড়ের ব্যবসায় শুরু করলেন। ক্রমশঃ তিনি ধনী হলেন। খোলাবাজারে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনি পাইকারদের সঙ্গে কথা বলতেন। ঝাঁসীর রাণীর বিমাতা বলে তাঁর সব ব্যবহারই সকলে সহ্য করতেন। চিমাবাঈ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু কাকুবাঈ জানালেন, চিমাবাঈকে আত্মীয়া বলে পরিচয় দিতে তাঁর লজ্জা বোধ হয়।

কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শমতো চিমাবাঈ কাকুবাঈ-এর বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। কাকুবাঈ তখন তাঁর ব্যবসা গুটিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন। দীর্ঘদিন বাদে আরুই-এর তহসিলদার চিমাবাঈকে জানায় যে, কাকুবাঈ মারা গিয়েছেন।

চিমাবাঈ-এর প্রথমে দুটি কন্যা হয়েছিল। একটির অতি শৈশবে মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া কন্যা গোপিকার জন্ম হয় ১৮৫২ সালে। ১৮৫৬ সালে ঝাঁসীতে জালৌনের নিকটস্থ চুরখির নারায়ণরাও খেরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহে রাণী কন্যাকে অলঙ্কার, জামাতাকে একটি পোষাক এবং তাঁর একটি ছোরা উপহার দেন। গোপিকার তিনটি সন্তান হয়। রঘুনাথ, শিবরাও ও সখুবাঈ। ১৯০০ সালে গোপিকার মৃত্যু হয়। ১৯০৭ সালে তৎকালীন সাগর বাসিন্দা উক্ত বৃদ্ধ নারায়ণরাও খের রাণীর নিকট হতে প্রাপ্ত ছোরাটি চিমাবাঈ-এর পৌত্র গোবিন্দ চিন্তামণিকে ফিরিয়ে দেন। সেই ছোরাখানির ছবিই 'ঝাঁসীর রাণীর ছোরা' নামে সর্বত্র খ্যাত।

কিছুদিন বাদে চিমাবাঈ পুত্র চিন্তামণিকে নিয়ে ডাক্তার রমণগোপাল কাণের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসেন। চিন্তামণি তখন ইন্দোরের মাদ্রাসায় ইংরেজী ও মারাঠি শিক্ষা করছিলেন।

ইন্দোরবাসী মাত্রেই ডাক্তার কাণের অদ্ভুত পরোপকারিতার নানা কাহিনী শুনে থাকবেন। প্রত্যূষে, গ্রাম থেকে তরকারি ও

দুধ নিয়ে যারা শহরে বিক্রি করতে আসত, তাদের বিশ্রামের জন্য তিনি পথের পাশে স্থান করে দিয়েছিলেন। গাড়ি গাড়ি জ্বালানি কাঠ কিনে তিনি দরিদ্র লোকের বাড়িতে বিতরণ করতেন। ছেলেধরাদের কাছ থেকে একটি দরিদ্র চাষীর ছেলেকে উদ্ধার করে তিনি তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে ডাক্তারী পাশ করিয়ে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করেছিলেন। ইন্দোর ত্যাগের সময়ে পরোপকারিতার জন্য কাণের চৌদ্দ হাজার টাকা ঋণ হয়। স্যার হেনরী ডেলী তখন ইন্দোরের রেসীডেন্ট ছিলেন। তাঁর অনুরোধে বিখ্যাত ধনী সর্দার বোলিয়া কাণের বাড়ি চৌদ্দ হাজার টাকায় কিনে কাণেকে ঋণমুক্ত করেন। ইন্দোর থেকে বম্বে গিয়ে কাণের মৃত্যু হয়। তুকাজীরাও হোলকারের সাহায্যে কাণের পুত্রদ্বয় ডাক্তারী পাশ করেন। কাণের কন্যার স্বামী সি. ভি. বৈদ্য একদা গোয়ালিয়ারে প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন।

চিন্তামণি তাম্বে

এই কাণের সাহায্যে চিন্তামণিও ম্যাট্রিক অবধি পড়েন। স্যার হেনরী ডেলী তাঁকে তখন সাগরের নায়েব তহসিলদার এবং পরে তহসিলদারের কাজ যোগাড় করে দিলেন।

মুলে পরিবার এই সময়ে ইন্দোরে আসেন। তাঁরা ধনী এবং বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কুলশীল দেখে দরিদ্র চিন্তামণিকে তাঁরা জামাতা করেন। চিন্তামণি ও সরস্বতীবাঈ-এর একমাত্র

পুত্র গোবিন্দরাম চিন্তামণি তাম্বে এবং তাঁদের কন্যার নাম দুর্গা।

গোবিন্দরাম চিন্তামণি তাম্বের ১৮৮১ সালে জন্ম হয়। শৈশবে পিতামহী চিমাবাঈ-এর কাছে ঝাঁসীর রাণীর কথা নানাভাবে শুনে তাঁর মনে এই মহীয়সী মহিলা সম্বন্ধে অদ্ভুত কৌতূহল জাগে এবং হৃদয় শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়।

দৈনন্দিন জীবন যাপনের সংগ্রামে তাঁকে আজীবন ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তবু তিনি সযত্নে সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী এবং অধুনা লুপ্তপ্রায় মারাঠি লিপি "মোড়ি" শিক্ষা করেন। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এবং অবসর গ্রহণের পর থেকে দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে এই স্বল্পবিত্ত বৃদ্ধ কঠোর পরিশ্রমে কাশী, পুণা, ইন্দোর, ঝাঁসী সর্বত্র ভ্রমণ করে রাণীর সমসাময়িক পরিচিত বন্ধু আত্মীয় প্রত্যেককে খুঁজে বের করে রাণীর সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য আহরণ করেন। তাঁর যৌবনে রাণীর সমসাময়িক মানুষরা কেউ বৃদ্ধ, কেউ প্রৌঢ়। কখন তিনি তাঁদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন আবার কখনও বা তাঁদের আত্মীয় কিম্বা বংশধরদের পেয়েছেন। সাগরে নারায়ণরাও খেরের কাছ থেকে রাণীর ছোরাটি এবং দামোদররাও-এর কাছ থেকে পাগড়ি উদ্ধার করে তিনি কাঁচের আধারে সযত্নে রেখেছিলেন। ইন্দোর থেকে রাণীর তৈলচিত্রও তিনি উদ্ধার করেছিলেন। ঝাঁসীর নেবালকর বংশের পূর্ব ইতিহাস জানবার জন্য তিনি পুণা ও পারোলাতে লুপ্ত দলিল উদ্ধার করে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। এক সময়ে দিল্লীর প্রখর গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে তিনি প্রত্যহ সারাদিন ধরে Archive-এ বসে ঝাঁসীর কাগজ-পত্র দেখতেন। কলকাতায় এসে কঠোর পরিশ্রমে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এসিয়াটিক সোসাইটি ও তদানীন্তন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে ঘুরে ঘুরে সিপাহী বিদ্রোহ সংক্রান্ত বই দেখতেন। ১৯০২ সাল থেকে তিনি রাণীর বিষয়ে মারাঠি কাগজে বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন। রাণীর বিষয়ে ভারতবর্ষের কোথাও ভুল তথ্য বা সংবাদ প্রকাশিত হলে সাধ্যমতো তার প্রতিবাদ করেছেন। কাশীতে রাণীর পিতৃগৃহ, বিঠুরে মোরোপন্তের বাড়ির পতিত ভিটা, পুণাতে তাম্বে পরিবারের প্রাচীন গৃহ, এগুলি সম্পর্কে

তিনিই জনসাধারণের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। রাণীর মাতা ভাগীরথীবাঈ-এর পিতৃকুল সম্বন্ধে বিবিধ লুপ্ত তথ্য তিনিই সংগ্রহ করেন। রাণীর বিষয়ে তাঁর সমসাময়িকদের ব্যক্তিগত বিবরণী লিখে নেবার সখ তাঁর ছিল। এইভাবেও তিনি বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। পিতৃ, মাতৃ ও পতিকুলে রাণীর যত আত্মীয়-স্বজন ছিলেন তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। বিলেতে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম থেকে রাণীর বধূবেশিনী প্রতিকৃতিটির অনুলিপি করিয়ে এনেছিলেন তিনিই। রাণীর যে ছোরাখানি তিনি নারায়ণরাও খেরের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তার ছবি তুলিয়ে তিনি বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে দিয়েছিলেন। এই ছবিই উত্তরকালে সাভারকারের বই-এ ব্যবহৃত হয়।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল ভেতরে ভেতরে। ঝাঁসীর রাণীর একখানি জীবনী লেখবার বাসনা নিয়ে তিনি তিরিশ বছর ধরে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু বই লেখবার সময় তাঁর মিলল না। ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের তিনি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সযত্নে আহরিত এই তথ্যগুলি কোন কাজে লাগল না বলে শেষজীবনে তাঁর মনে সর্বদাই ক্ষোভ জাগত। ভারত সরকারের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস দপ্তরের নাগপুর শাখাকে তিনি বহু কাগজপত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ইতিহাস রচনাও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত থাকল বলে তাঁর অত্যন্ত আশাভঙ্গ ঘটেছিল।

ঝাঁসীর রাণীর জীবনী রচনার সঙ্কল্প যখন গ্রহণ করা হয়, তখন দেখা গেল জ্ঞান আমাদের একান্ত পরিমিত। কেবল আন্তরিক আগ্রহ আর উৎসাহ পুঁজি করে এই কাজ করা, একটি ছোট্ট নৌকো নিয়ে অতল অপার সমুদ্রে পাড়ি দেবার মতোই অসম্ভব বোধ হয়েছিল। ঝাঁসীর রাণীর নামই জানা ছিল শুধু কিন্তু কোথা থেকে কি ভাবে কাজ শুরু করলে সেই নাম ইতিহাসের পাতা ছেড়ে ব্যক্তিত্ব পরিগ্রহ করবে তা জ্ঞাত ছিল না। সেই সময়ই

গোবিন্দরাম তাম্বের কথা কানে আসে। শোনা গেল ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি একজন নিয়মিত আগন্তুক।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে আমেদাবাদ ইতিহাস কংগ্রেস-এ। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যই সেবার এসেছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে তিনি একান্ত অভিভূত হয়ে পড়লেন। একটি সুন্দর মারাঠি কবিতা বলে তিনি সম্ভাষণ করেছিলেন, যার ভাবার্থ—পরস্পর সাক্ষাৎ ও সম্ভাষণের ইচ্ছে যদি আন্তরিক হয় তাহলে নদীতে নদীতেও দেখা হয়—মানুষে মানুষে তো হবেই।

বর্তমান যুগ, তার মানুষ এবং চিন্তাধারা, সবকিছুই তাঁর কাছে বড় অন্যরকম বোধ হত। কোথাও যেন তিনি বিভ্রান্ত বোধ করছেন। বার্ধক্য যে তাঁকে ক্রমশঃ হীনবল করে ফেলছে তাহা তাঁর চোখে মুখে স্পষ্টই প্রতিফলিত হত। যদিও অর্থে বা সামর্থ্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি তাঁর জীবনে ছিল না তবু একটি আদর্শ, একটি উদ্দেশ্য, একটি শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি জীবনের সত্তরটা বছর কাটিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার বোধ হল, সেই সযত্নপালিত আদর্শকে কোনমতে রূপ দিতে পারবার শক্তি বা সামর্থ্য নেই বুঝতে পেরে তিনি একান্ত হতাশ বোধ করছেন।

আমাকে দেখে প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, গত ত্রিশ বছর ধরে অনেকে যেমন তাঁর কাছে রাণীর সম্বন্ধে মৌখিকভাবে লিখবার উৎসাহ প্রকাশ করেছে অথচ কাজে কিছুই করেনি, আমিও বুঝি তাদেরই সমগোত্রীয় একজন। অবশ্য আমার আন্তরিকতা সম্বন্ধে পরে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন। তারপর দুই বছর ধরে তিনি একাদি-ক্রমে আমাকে বহু তথ্য, গ্রন্থ, প্রতিকৃতি ইত্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। তিনি তিরিশ বছর ধরে যে আশাকে সযত্নে লালন করেছেন তাকে আমি সত্যিকার রূপ দিতে পেরেছি জেনে তাঁর আনন্দের অবধি ছিল না। বারবার তিনি বলেছেন, "এবার আমি নিশ্চিন্ত হলাম। এখন আর আমার কোন খেদ নেই।"

রাণীর সম্বন্ধে তাঁর নিজের কাগজপত্রের সংগ্রহ তখন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার দফ্‌তরে চলে গিয়েছে। তাই অধিকাংশ তথ্যই তিনি মন থেকে বলতেন। পরে অবশ্য কাগজপত্র থেকেও

সাহায্য করেছেন। কখনও খেতে বসে অন্য কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি বলে উঠতেন, "কখনও কি বলেছি তোমাকে যে, রাণী অধিকপক্ক ঘি ভালবাসতেন?" সন্ধ্যার সময় যখন আমরা গৃহ-প্রাঙ্গণে পায়চারি করতাম তখন তিনি অনর্গল আবৃত্তি করে যেতেন কবিভূষণের কবিতা। কখনও তিনি ঘুমোতে গেলে আমি যখন বেরিয়ে আসতাম তখন সহসা ডেকে বলতেন, "মোতিবাঈ কেল্লায় গিয়েছিল আর রাণীর ঘোড়ীর নাম ছিল সারেংগী।" এই সব টুকরা টুকরা অনেক কথাই মনে পড়ছে। তাঁর কথাবার্তা থেকে আস্তে আস্তে রাণীকে রক্তমাংসের মানুষ বলে যেন চিনতে পারলাম—একটি ছোট্ট মেয়ে, একটি ছোট্ট বৌ, তরুণী বিধবা, স্নেহময়ী মা, কৌতুকময়ী সখী—। এরা যেন একটি চরিত্রেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি বিভিন্নরূপে প্রতিভাত।

আমেদাবাদ থেকে একত্রে আমরা বরোদা গেলাম। সেখান থেকেই তাঁর কাছে আমি বিদায় গ্রহণ করি। আমি যে চলে আসব তা তিনি জানতেন তবুও বারবার বললেন, "তুমি থাক, এখনই যেও না।" তারপর যখন বুঝলেন আমি অনাত্মীয় আমার ওপর তাঁর দাবি চলে না তখন চুপ করে গেলেন। বরোদায় রাজরত্ন তাম্বের বাড়ির ছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি সাশ্রুনয়নে আমাকে বিদায় দিলেন। সেই আমার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা। যখন চলে আসছি, তখন তাঁকে যে কি নিঃসঙ্গ আর একাকী বোধ হয়েছিল সে কথা আজও ভুলতে পারি না।

রাণীর প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। সেই ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে রাণীর একটি জীবনী লেখবার প্রবল আকাঙ্খা তিনি তখনও পোষণ করতেন। কিন্তু আমার সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি আমাকে দুর্বল হাতে লিখেছেন—"They do not tell me, yet I know that Doctors offer no hope of recovery. But I want to see your book, and if possible I want to come to Calcutta to congratulate you. We must write the English biography together."

উক্ত চিঠি লেখবার কিছুদিন পরেই ১৯৫৬ সালের ৫ই জানুয়ারী এই সদাশয় নিরভিমানী বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব মাত্রেই ঝাঁসীর রাণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা অবগত আছেন। তাই তাম্বেসাহেবের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্যটির কথাও তাঁদের অজানা নয়।

নাগপুরে তিনি বাস করতেন। পিতামহের নাম "মৌরেশ্বর" (সম্বোধনে মোরোপন্ত) অনুসারে তাঁর বাসগৃহের নাম "ময়ুরাশয়"। সেখানে তাঁর পুত্র কন্যারা বাস করেন। নাগপুর-বাসী মাত্রেই জানেন তাঁর বাড়িটি রাণীর, তাঁর পিতা এবং পিতামহীর প্রতিকৃতি এবং বিবিধ পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন দ্বারা সুসজ্জিত।

সে বাড়ি আমি দেখিনি, তবে গোয়ালিয়ার থেকে যখন ঝাঁসীর দিকে ট্রেন এগিয়ে এল, যখন আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশের পটভূমিকায় দেখা দিল ঝাঁসীর কেল্লা তখন এক আশ্চর্য অনুভূতি হয়েছিল। কল্পনায় যে ছবি হাজারবার দেখেছি বাস্তবে তাকে দেখে বড় আশ্চর্য লেগেছিল। সমস্তই যে অতীত এবং সে দিনের সব কিছু যে একান্তই অতিক্রান্ত সেই উপলব্ধি সেদিনই প্রথম এসেছিল।

ঝাঁসীর পথে পথে আমি অনেকবার ঘুরেছি। শীতের প্রবল বাতাসে, ক্যান্টনমেণ্ট ছাড়িয়ে পুরনো ছাউনির পথে বড় বড় পাথরের ছায়ায় ছায়ায়, নির্জন কেল্লার পরিত্যক্ত কোণায় কোণায়, জীর্ণ ও অবহেলিত রাণীমহালের ঘরে ঘরে, সেই শহরের জনাকীর্ণ পথে এবং লছ্মীতালের বুকে বজরা নিয়ে ঘুরে অতীতের পদসঞ্চার কান পেতে শোনবার চেষ্টা করেছি। অতীতের স্মৃতিমণ্ডিত ঝাঁসীতে যখন দাঁড়ালাম তখন যেন তাম্বেসাহেবকে পুরোপুরি জানলাম। যেন সঙ্গতি খুঁজে গেলাম।

মোরোপন্ত বীর যোদ্ধা ছিলেন। পরম বীরত্বের সঙ্গে তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে লড়েছিলেন। প্রাণ দিয়েছিলেন ফাঁসিমঞ্চে। পিতৃ-কুলের সংগ্রামী ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশ হয়েছিল রাণীর চরিত্রে। আর সেই পুণ্য ঐতিহ্য এবং রাণীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই বেঁচেছিলেন গোবিন্দ চিন্তামণি তাম্বে।

ছাব্বিশ

১৮৫৮ থেকে প্রায় শতবর্ষ পরে আজ যখন সেই দিনের পট-ভূমিকায় অগ্নির অক্ষরে লেখা ঝাঁসীর রাণীর কথা স্মরণ করি, তখন মোটেই বিস্মিত হই না। ভারতীয় নারীত্বের শাশ্বত ঐতিহ্য থেকেই তো তাঁর স্বাভাবিক উৎপত্তি—একাধারে ললিতে ও কঠোরা। শরতের ভরাগঙ্গায় উজান বেয়ে যে দুর্গা আমাদের আঙ্গিনায় আসেন, তিনি কন্যা ও জননী, আবার তিনিই দনুজদলনী দশপ্রহরণ-ধারিণী। যে-নারী বধূ ও জননী সেই আবার পুরুষের পাশে ক্ষেতে দাঁড়িয়ে চাষ করে, হিমালয়ের দুর্গম পথে স্বচ্ছন্দে বোঝা বয়, পাথর ভাঙে, উত্তাল সাগরে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরে, মরুভূমিতে জল বয়। তারাই আবার দুর্দিনে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছে, প্রয়োজনে চিতাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়েছে।

শীতের স্বল্প রৌদ্রালোকিত অপরাহ্ণে রাণীর স্মৃতিবেদীমূলে দাঁড়িয়ে এমনি কত কথাই আমার মনে হচ্ছিল। একবার মনে হল এই সামান্য, অনাড়ম্বর স্মৃতিসৌধ তাঁর যোগ্য নয়। কি জীবনে, কি মরণে শুধু অবিচারই পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু আবার মনে হল তাই বা কেন কোন শিল্পীই তাঁর যোগ্য স্মৃতিসৌধ গড়তে পারবেন না। তিনি আজও বেঁচে রয়েছেন বহু মানুষের মাঝে, ঝাঁসী, কাল্পি, গোয়ালিয়রে। যেখানে প্রভাতে মোটা চাদর গায়ে জড়িয়ে দু'খানি রুটি সঙ্গে দিয়ে মা বালকপুত্রকে মোষ চরাতে পাঠায়, যেখানে বনের শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে ছেলেমেয়েরা ঘরে ফেরে, যেখানে কত মানুষ কাজ করে, ভালবাসে, হাসে আর কাঁদে, সেখানে রাণীকে নিত্য স্মরণ করে তারা গীতে, গানে, রাসোয় আর গল্পে। হোলির দিনে আজও বুন্দেলখণ্ডে গরীব ছেলেমেয়েরা গান গেয়ে বেড়ায়। বেতোয়ার কাকচক্ষু স্বচ্ছ জলে গাঁয়ের কিশোরী মেয়ে মুকুরের অভাবে ছায়াতে মুখ দেখে আর ফুল পরে চুলে। চৈত্রে ফসল ঘরে তুলে, গরুর

গাড়ির পাশে বসে ধুলোভরা পা ঝুলিয়ে দিয়ে ভীরু গলায় গান করে কিষাণী বধূ—এই সব মানুষের সুখে দুঃখে মিলিত নিত্য জীবন-প্রবাহের মধ্যেই তিনি বেঁচে আছেন। এইসব মানুষ তাঁর মৃত্যু স্বীকার করে না, তারা বলে—অমর হ্যায় ঝাঁসী কী রাণী।

এতজন যদি সেই কথা বলে, সেই মাটিতে তারা যদি ফসল বোনে, গাছ লাগায়, সেইখানে মেঘ যদি জল দেয়, সূর্য ওঠে আর সকাল হয়, সূর্য ডোবে আর সন্ধ্যে হয়, তা হলে রাণীর স্মৃতিতে ইট কাঠ পাথরের সৌধ নাই বা থাকল। স্মৃতির জন্যই সৌধ। স্মৃতি তো তাঁর অবিস্মরণীয় হয়েই আছে।

স্মৃতি মানুষের মনে। পূজা মানুষের হৃদয়ে। তাই সেই সব কথা স্মরণ করলে পুনর্বার ভক্তিতে অবনত হবে মাথা। তাঁর কথা যদি নিত্য স্মরণ করা যায়, তাতেও সে স্মৃতি পুরনো হবে না।

সূর্য প্রত্যহ ওঠে। তবু প্রতিদিনই সে নূতন। সেই সূর্যের মতো একক দীপ্তমান চরিত্রের কথা স্মরণ করলে, প্রান্তরে প্রান্তরে গৃহপথগামী বধূবেশিনী সন্ধ্যার বাসরলগ্নের সময়ে সেই স্মৃতি-বেদীতে এক অঞ্জলি ফুল দেওয়া সার্থক মনে হবে। মনে হবে মৃত্যুকে জয় করেছে জীবন। তাই তাঁর মৃত্যুর কথা তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে। তাই সত্যিই বিশ্বাস হয় তিনি অমর। অমর হ্যায় ঝাঁসী কি রাণী।

পরিশিষ্ট

এই বই-এ ব্যবহৃত রাণীর ছবির সত্যতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে। যে ছবি সচরাচর দেখা যায় তার সঙ্গে রাণীর সাদৃশ্য আছে কিনা সে বিষয়ে নানাজনের নানামত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, ভূপালের বেগম শিকান্দারের একখানি ফটোকে একদা মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী কর্মীরা ঝাঁসীর রাণীর ছবি ভ্রমে পোস্টকার্ডে ছাপিয়ে ছিলেন। সেই ভ্রম কালক্রমে সংশোধিত হয়। ভূপালে অবস্থিত, তামাকু সেবনরতা, ঘাগরা পরিহিতা জনৈকা রমণীর ছবিকেও ঝাঁসী রাণীর ছবি বলে Gede নামক ইংরেজ ঐতিহাসিক ব্যবহার করেছেন।

রাণীর কপালে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি উল্কির দাগ ছিল। রাণীর বিমাতা চিমাবাঈ, পরবর্তী জীবনে তাঁর পৌত্রী দুর্গাকে প্রায়ই কৌতুক করে বলতেন, "আয় তোর কপালে উল্কি দিয়ে দিই। বাঈসাহেব-এর যেমন ছিল।" সুতরাং যে ছবিগুলিতে উল্কির চিহ্ন আছে, তাদের চিত্রকররা রাণীকে দেখেছেন বলে মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে।

১৯২৮ সালে ইন্দোরের অন্যতম বিখ্যাত ধনী সর্দার বোলিয়ার বন্ধু দিনকর বিনায়ক মুলে (চিন্তামণির শ্যালক) জানতে পারলেন যে, একটি ঘরে তাঁর পূর্বপুরুষদের নানাবিধ ছবি ও শিল্পের সংগ্রহ গুদামজাত করা আছে। আগ্রহান্বিত হয়ে সেইগুলি দেখতে দেখতে তিনি সহসা একটি ছবি দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ছবিটিতে অনাড়ম্বর পোষাকে জনৈকা রমণী ঢাল তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। তার মনে হল এই ছবি নিশ্চয় ঝাঁসীর রাণীর, কেননা ছবির সঙ্গে শ্রীযুত চিন্তামণির আশ্চর্য সাদৃশ্য ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময় চিন্তামণিও ইন্দোরে ছিলেন। তি.ন ছবিখানি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রতিকৃতির কপাল-দেশে উল্কি লক্ষ্য করে

ওটি রাণীর প্রকৃত ছবি বলেই ধারণা করেন। কিন্তু তবু ছবিটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে তখনও সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন হল না।

ইন্দোরে প্রাপ্ত রাণীর ছবি

দুর্ভাগ্যবশতঃ চিন্তামণির মা চিমাবাঈ তখন পরলোকে। কিন্তু সরস্বতী টিকেকার নাম্নী জনৈকা অশীতিপর মহিলা তখন ইন্দোরে ছিলেন। তিনি কৈশোরে ঝাঁসীতে ঢেক্‌রে পরিবারের আতিথ্যে ছয়মাস বাস করেন। সরস্বতী ছিলেন সূচীকার্যে নিপুণা। সেই সময় রাণী তাঁকে এনে রাজপ্রাসাদের মেয়েদের সূচীকার্য শিক্ষায়

নিযুক্ত করেন। চিন্তামণি ছবিখানির আলোকচিত্র এনে সেই বৃদ্ধাকে দেখাতেই তিনি "এই ছবি যে বাঈসাহেব-এর, তাতে ভুল কোথায়?" বলে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সাশ্রুনয়নে বললেন, "এ ছবি তাঁরই, কিন্তু সেই প্রাণ, সেই উৎসাহ, কোন্ চিত্রকর আঁকবে? এই ছবির চেয়ে বাঈসাহেব অনেক কোমল-দর্শনা ছিলেন।"

বহু অনুসন্ধানের পর এই ছবির ইতিহাস জানা গেল। ১৮৬১ সালে জনৈক দরিদ্র চিত্রকর ইন্দোরে এসেছিলেন। ইন্দোরের প্রখ্যাত ধনী সর্দার কীভে ও সর্দার বোলিয়ার কাছে গিয়ে তিনি বললেন যে, ঝাঁসীতে দীর্ঘদিন বাস করবার পর ১৮৫৮ সালে ঝাঁসী ত্যাগ করেছেন। এবং তৎপর করজোড়ে জানালেন যে, চিত্রাঙ্কন তাঁর পেশা। ইন্দোরের ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য পেলে তিনি কিছু ছবি আঁকতে পারেন। সর্দার কীভে ও বোলিয়া তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঝাঁসীর রাণীকে দেখেছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "বহুবার দেখেছি। কখনও পাঠানী পোষাকে, কখনও বা মারাঠি রমণীর পোষাকে তরবারি নিয়ে তিনি অশ্বারোহণে নগর পরিক্রমা করতেন ১৮৫৮ সালের গোড়ার দিকে।"

সর্দার বোলিয়া ও কীভের আদেশে তখন তিনিই স্মৃতি থেকে রাণীর চিত্র আঁকেন। এই ছবিতে রাণী মাথায় 'ফেটা' বেঁধে, ঢাল ও তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিকৃতিটি প্রমাণ মাপের। সর্দার কীভের ছবিখানি অতি পাতলা তারের জালের ওপর তেল রং-এ আঁকা হয়েছিল। কালক্রমে সেটি খসে পড়ে যায়।

সর্দার বোলিয়ার বাড়ির ছবিখানির নিচের দিকে, যেখানে চিত্রকরের পরিচয় লেখা ছিল, সেদিকটি সামান্য পোকায় কেটেছিল। সেইজন্য সর্দার বোলিয়া ছবিখানি নিচের দিক কেটে বাদ দিয়ে দেন। চিত্রকরের নাম, খুব সম্ভবতঃ ছিল রতন কাছ্‌বাহা।

চিন্তামণি ইন্দোরের আলোকচিত্র শিল্পী মিঃ বোদাস্‌কে দিয়ে রাণীর এই প্রতিকৃতির ছবি তোলান। রাণীর কপালের উল্কি চিহ্নটির কথা তিনি মায়ের কাছে বহুবার শুনেছিলেন তাঁর কন্যা দুর্গাকে চিমাবাঈ প্রায়ই বলতেন, "বাঈসাহেব-এর মতো তোর কপালেও আমি উল্কি দিয়ে দেব। তাহলে তুই তাঁর মতো ভাগ্যবতী হবি।" মায়ের এই কথার উত্তরে তাঁর দিদিমা একদিন দুঃখ করে

তাঁর মাকে বলেছিলেন, "বাঈসাহেব-এর সৌভাগ্য তুই কোথায় দেখলি? তিনি নিজে ভাগ্যহীনা ছিলেন, তোর যা সর্বনাশ হয়েছে, সে তো তাঁরই জন্য।" তখন চিমাবাঈ বলেছিলেন—

> 'আমি বিধবা হয়েছি, আমার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তবু আমি বলব তিনি পরম ভাগ্যবতী ছিলেন। তিনি সম্পর্কে আমার কন্যা, কিন্তু তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। আজও দেখ, কতজন এসে তাঁর কথা আমার কাছে বসে সাশ্রুনয়নে শুনে যায়। কত সৌভাগ্যবতী হলে এতখানি শ্রদ্ধা পায় তা কি বোঝ না?'

পিতার কাছে এই তৈলচিত্রের কথা শুনে গোবিন্দরাম আগ্রহান্বিত হলেন। ১৯২৯ সালে তিনি দিনকর বিনায়ক মুলেকে অনুরোধ করলেন, তৈলচিত্রটি সর্দার বোলিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করে দিতে। এই ছবি সর্দার বোলিয়ার কাছে সামান্য একটি সংগ্রহ মাত্র। কিন্তু চিন্তামণির পরিবারে তার স্থান অনেক উচ্চে। দিনকরের প্রস্তাব শুনে সর্দার বোলিয়া তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। ছবিখানি তাম্বেদের দেওয়া হল।

নাগপুরে স্ব-গৃহে, একটি উচ্চ পাদপীঠে ছবিখানি স্থাপন করে মহাধুমধামে বহু দর্শক সমাগমে 'প্রতিকৃতি-উন্মোচন-অনুষ্ঠান' করা হল। ছবিটি উৎকৃষ্ট ফ্রেমে বাঁধিয়ে পেছনে একটি লাল রেশমের পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

১৯৩০ সালে সর্দার বোলিয়া ছবিখানি ফেরত চাইলেন। গোবিন্দরাম তখন অযোধ্যার বি. এইচ. পন্থ প্রধানকে দিয়ে ছবিটির একখানি হুবহু অনুকরণ করিয়ে নিলেন। অনুকরণখানি আজও নাগপুরে তাম্বেদের বাড়িতে এবং মূল ছবিখানি ইন্দোরে সর্দার বোলিয়ার বাড়িতে আছে। এই ছবিখানি বহুল প্রচারিত এবং ঝাঁসীর রাণীর ছবি নামে সর্বসাধারণের পরিচিত।

১৯০৩ সালে, লর্ড কার্জন যখন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নির্মাণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন দামোদররাও রাণীর প্রতিকৃতি সেখানে রাখবার প্রস্তাব করে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন। উত্তরে কার্জন জানিয়েছিলেন, তিনি ঝাঁসীর রাণীর ছবি রাখতে রাজী আছেন, কিন্তু নানা সাহেবের ছবি রাখা চলবে না। রাণীর একখানি প্রামাণ্য প্রতিকৃতি সংগ্রহের জন্য তিনি দামোদররাওকেও

অনুরোধ করেন। দামোদররাও-এর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কার্জনের পরবর্তী অন্য কোন বড়লাট রাণীর প্রতিকৃতি সংগ্রহ সম্বন্ধে আর আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

রাণীর বধূবেশিনী ছবিখানি একখানি গজদন্ত ফলকে রাজপুত পদ্ধতিতে আঁকা হয়েছিল। এই ছবিখানির মূল রয়েছে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম—লণ্ডন-এ। বিংশশতকের গোড়ার দিকে কিছু মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবী যুবক বিলেতে যান। জনৈক রানাডে ফিরে এসে শ্রীযুত তাম্বেকে ঐ ছবির বিষয়ে জানান। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শ্রীযুত তাম্বে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে ছবিখানির থেকে রঙিন আলোকচিত্র আনিয়ে ভারতীয় চিত্রকরকে দিয়ে আঁকিয়ে নেন। উক্ত ছবির মূল সম্বন্ধে জানা যায়, ১৮৬০ সালে সিপাহী যুদ্ধের কাগজপত্রের সঙ্গে ওখানা বিলেতে পাঠান হয়েছিল। কপালের উল্কি চিহ্ন এবং অন্যান্য সাদৃশ্য থেকে মনে হয় এই ছবি রাণীর বধূজীবনের। রাণীর বৈমাত্রেয় ভগ্নী গোপিকা ১৯০৭ সালে সাগরে মারা যান। তিনি ঐ আলোকচিত্র (যা পূর্বে রানাডে এনেছিলেন) দেখে বলেছিলেন যে, ছবিখানির অনুলিপি তাঁর কাছেও ছিল। এই ছবি গঙ্গাধররাও-এর অনুমতি ক্রমে একজন রাজপুত চিত্রকর এঁকেছিলেন।

রাণীর বিমাতার মতে, ১৮৫৭ সালের নভেম্বর মাসে আগ্রা থেকে জনৈক রাজপুত চিত্রকর ঝাঁসীতে এসেছিলেন। রাণী নিজের অশ্বপৃষ্ঠে, গীতাপাঠনিরত এবং দামোদরসহ এই তিনখানি ; পিতা, মাতা, ভগ্নী ও ভ্রাতার একখানি ; অশ্বপৃষ্ঠে দামোদরের একখানি এবং নৃত্যগীত-নিরতা জনৈকা নর্তকী (মোতিবাঈ ?)-এর একখানি ; মোট ছয়খানি ছবি তাঁকে দিয়ে আঁকিয়েছিলেন। কেননা একটি পারিবারিক চিত্রশালা গঠন করবার ইচ্ছা রাণীর বরাবরই ছিল। এই ছবিগুলি ঝাঁসীতে রাণী-মহলে তাঁর শয়নকক্ষের সংলগ্ন নিজের বসবার ঘরে থাকত। ছবিগুলি প্রমাণ মাপের ছিল না। হিউরোজের সৈন্যদল যখন রাণীর প্রাসাদ নিঃশেষে লুণ্ঠন ও ধ্বংস করেছিল, তারপর থেকে ছবিগুলির আর কোন খোঁজ মেলে না। সম্ভবতঃ সেগুলি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, অথবা ১৮৫৭ সালের অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে।

রাণীর মৃত্যুর পর তাঁর মাথায় বাঁধবার সাদা মসলিনের 'ফেটা' এবং হাতের তরবারি দামোদররাওকে দেওয়া হয়েছিল। তরবারির হাতল সোনার পাতে জড়ান এবং রত্ন-খচিত ছিল। ১৮৯৫, ১৮৯৮, ১৯০৩ এবং ১৯০৪ সালে শ্রীযুত তাম্বে চারবার সেই স্মৃতিচিহ্ন দেখেছিলেন। তরবারির হাতলে 'মোড়ি' অক্ষরে 'লক্ষ্মীবাঈ গঙ্গাধররাও নেবালকর—পত্তন—ঝাঁসী' এই কথা কয়টি লেখা ছিল। দামোদররাও-এর মৃত্যুর পর এই স্মৃতিচিহ্ন দুটি হারিয়ে অথবা চুরি হয়ে যায়। লক্ষ্মণরাওকে বারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তিনি সে-সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করতে পারেননি।

রাণীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবার জন্য এলিসকে কোর্ট অফ ডিরেক্টারস-এর তরফ থেকে অভিযুক্ত করে পান্না রাজ্যে বদলি করা হয়েছিল।

ঝাঁসীতে ইংরেজ নরনারীদের হত্যাকাণ্ডের সময়ে পান্না রাজ্যের জনৈক উকীল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এলিস তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে প্রশ্ন করে নিঃসন্দেহ হন যে, সেই হত্যাকাণ্ডে রাণীর কোন দোষ ছিল না। ক্যানিংকে তিনি উক্ত মর্মে একখানি চিঠি ও উকীলটির জবানবন্দী পাঠান। ক্যানিং এলিসের ওপর এজন্য অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

আরস্কাইন রাণীকে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে চিঠি লেখার পর ক্যানিং আরস্কাইনকে লেখেন—

> 'I do not blame you for what you have done, but the Rani was responsible for the massacre all the same. If you can capture her, she should be tried specially.'

অরছা ও দতিয়ার ফৌজকে পরাজিত করবার পর রাণী স্যার রবার্ট হ্যামিল্টনকে লিখেছিলেন—

> 'অরছা ও দতিয়ার অকারণ আক্রমণ আমি পর্যুদস্ত করেছি। রাজ্যের কোথাও আমার আর কোন শত্রু নেই।'

এই চিঠি পেয়ে হ্যামিল্টন কোন জবাব দেননি সত্য কিন্তু হরকরাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছিলেন। তাদের অর্থ, খাদ্য

এবং বস্ত্র দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য পার্লামেন্টের সভ্যরা ক্যানিংকে বিদ্রোহী রাণীর হরকরাদের সঙ্গে সুব্যবহার করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন।

রাণীর সম্বন্ধে আন্দোলন যা হয়েছে, শ্রীযুত তাম্বের ভূমিকা তাতে অগ্রগণ্য। ১৯৩৫ সালে কাশীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে রাণীর জন্ম শতবার্ষিকী পালন করবার প্রস্তাব করেছিলেন তিনি। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাতে রাজী হননি। পরে সারনাথে সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

১৯২৯ সাল পর্যন্ত গোয়ালিয়ারে রাণীর কোন স্মৃতিচিহ্ন ছিল না। গোয়ালিয়ারের মহারাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় বাসিন্দারা একটি ছত্রী নির্মাণের জন্য ১৯২৩ সালে আন্দোলন শুরু করেন। ১৮-৬-১৯২৩ সালে তারা শোভাযাত্রা করে গিয়ে রাণীর মৃত্যু ও দাহের স্থানটিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। মধ্যভারতের রাজপ্রমুখ, বর্তমান সিন্ধিয়ার জ্যেষ্ঠা বিমাতা মহারাণী চিন্‌কুবাঈ সিন্ধিয়ার কাছে তারা একটি উপযুক্ত সৌধ নির্মাণ করে রাণীর স্মৃতিকে অক্ষয় করবার জন্য আবেদন জানান।

কয়েকবছর আন্দোলনের পর স্থির হয় একটি স্মৃতিবেদী নির্মাণ করা হবে। বর্তমান রাজপথ থেকে সেই স্থান আনুমানিক ১৫০ গজ দূরে। সেই সময় একজন নাগরিক বলেছিলেন, 'রাম জন্ম অযোধ্যা মেঁ, কাহ্নাজী কা গোকুল মেঁ, যাঁহা যাঁহা ভক্ত তাঁহা তাঁহা মন্দির—' অতএব রাণীর ছত্রী এমন জায়গায় করা হোক, যাতে সকলে যেতে আসতে দেখতে পায়। অনেক বাদানুবাদের পর পুরাতত্ত্ব বিভাগ সমুদয় ভার নিয়ে জায়গাটি ভরাট করে বর্তমান স্মৃতিবেদী নির্মাণ করেন। হিন্দী সাহিত্যের প্রখ্যাত মহিলা কবি সুভদ্রা কুমারী চৌহান একবার গোয়ালিয়ারবাসীর আমন্ত্রণে এসে নিজে তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি 'বড়ী লড়তি হুয়ে মর্দানী, ও তো ঝাঁসী বালে রাণী থী' স্মৃতিসভায় পাঠ করেছিলেন।

১৯২৯ সালে এই বেদী নির্মিত হয়। ১৯৩৫ সালে রাণীর জন্ম শতবার্ষিকী সভায় সাভারকর গোয়ালিয়ারে এসেছিলেন। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।

ঝাঁসীতে রাণীর স্মৃতিচিহ্ন বলতে অশ্বপৃষ্ঠে বালক দামোদরসহ রাণীর একটি মূর্তি ছাড়া আর কিছু নেই। সুভাষচন্দ্র 'ঝাঁসীর রাণী ব্রিগেড' গঠন করে এই মহীয়সী রমণীকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন। চণ্ডীচরণ মিত্র তাঁর একখানি জীবনী লিখেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'চিকাগো বক্তৃতায়' রাণীর কথা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের 'আত্মজীবনী' বইখানিতেও রাণীর সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত 'ঝাঁসীর রাজপুত্র' বইখানি দামোদররাও প্রসঙ্গে লিখিত। জনৈক সিন্ধুকুমার বসু—ঝাঁসীর বীরাঙ্গনা নামে একটি ছোট কবিতার বই লেখেন। হিন্দী ও মারাঠি ভাষাতে রাণীর ওপর বিভিন্ন নাটক, গীত ও বুন্দেলখণ্ডী ভাষায় কাহিনী ছড়া এবং বহু 'রাসো' আছে।

১৯৫৭ সাল সমাসন্ন। পুণ্যস্মৃতি ১৮৫৭ সালের পর শতবর্ষ পূর্ণ হতে চলেছে। আসন্ন শতবার্ষিকীর পরিপ্রেক্ষিতে পেছনে তাকালে কি দেখব আমরা? সেই মহান অভ্যুত্থান ব্রিটিশের পক্ষে লজ্জা ও কলঙ্কের চিহ্ন বলেই আমাদের দেশে তার এতটুকু নজির মিলবে না। ইতিহাস যা আছে তাও তাদের রচিত। শাসক ও শাসিতের সেই সংগ্রামের ব্রিটিশ বিবরণী পড়ে আমাদের যা জানতে হবে তাতে কতটুকু সত্য মিলবে সে প্রশ্ন ভারতীয়দের মনে জাগা অস্বাভাবিক নয়। ভারতীয় পক্ষের চিঠিপত্র বা অন্যান্য নজিরের একান্ত অভাব। তার কারণ এই ঘটনাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলে দিতে চেয়েছিল ইংরেজ। তাই নির্বিচার নরহত্যা বন্ধ হয়ে গেলে পরেও এ-সম্পর্কে ভারতীয় পক্ষের সমস্ত চিঠিপত্র তারা সুপরিকল্পিতভাবে দীর্ঘকাল ধরে ক্রমান্বয়ে সরিয়ে ফেলেছিল। বিদ্রোহী রাজ্যগুলিকে লুণ্ঠন করে বিদ্রোহের সামান্যতম নিশানা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছিল। হুলিয়া ছিল বিদ্রোহের সক্রিয় অংশগ্রহণকারীদের ওপর।

ঝাঁসীর কেল্লার ভেতরে প্রবেশের বাধা নেই, কিন্তু প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে একটি হতাশার গুরুভার মনকে আচ্ছন্ন করে।

কি যে অবহেলিত সেই দুর্গ তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নিরাভরণ সেই পাথরের কেল্লাতে আগ্রার দুর্গের জাঁকজমক বা শিল্পচাতুর্য কিছুই চোখে পড়বে না। বড় বড় রাজাবাদশাহের মনোযোগে কখনও সমৃদ্ধি লাভ করেনি সেই দুর্গ, তবু এতখানি নগ্ন ঔদাসীন্যও যেন মেনে নিতে মন চায় না। তার ঐতিহ্য এবং গৌরব অনেক ঐশ্বর্যের চেয়েও সমৃদ্ধ। কাজেই বর্তমান পরিণতি দেখলে মন ব্যথিতই হয় বারবার। আমাদের সকলের ঔদাসীন্যই যেন সেজন্য দায়ী। ম্যালকম ও এলিস এবং গোড্‌সের বর্ণনায় পড়েছি বিভিন্ন প্রাসাদ ছিল ঝাঁসীর কেল্লায়। কেল্লার সমৃদ্ধি এবং বিশাল বিস্তৃতি দেখে ম্যালকম ঝাঁসীর অন্তর্ভুক্তির সময়ে রক্ষণকারী ফৌজ মোতায়েনের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাতে নাকি হাতীশালা ঘোড়াশালা ছিল। কেল্লার প্রাসাদেই সখুবাঈ থাকতেন। কর্নেল শ্লীম্যান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং রাণীও বধূজীবনের প্রথম দিনগুলি সেখানে কাটিয়েছিলেন।

আজকের ঝাঁসীর কেল্লায় ঢুকলে বোঝা যায় না কোথায় কি ছিল। যে জায়গাগুলি দেখান হয় সেগুলি প্রায়শঃ ভাঙা এবং অব্যবহৃত। বাগিচা কিল্লা, ফাঁসিমঞ্চ, শিবমন্দির এইরকম কয়েকটি জায়গা এবং প্রধান বুরুজগুলি মাত্র অবিকৃত আছে। কেল্লা থেকে পাঁচিলের ভিতর দিয়ে শহরের পুবে ও উত্তরে যাবার অনেকগুলি দরজা ছিল। এখন প্রায় সর্বত্রই মাটি দিয়ে ভরাট করা। ঐ সব দরজা বা পাঁচিলের কোন নিশানা মেলে না। কেল্লার ভিতরে সে সমস্ত বদলে ফেলে ইংরেজদের সময়ে সৈন্যদের থাকবার ও গোলাবারুদ রাখবার ঘর যে তৈরি হয়েছিল, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। মনে হয় কেল্লার ভেতরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলি ঝাঁসী অধিকারের পর বন্ধ করে ফেলা হয়েছে। বর্ণনায় যা পড়া যায় (বর্ণনা মাত্র একশ' বছরের বা তারও পরের), কেল্লার ভেতর তার মিল পাওয়া কঠিন। স্থবির দেহ নিয়ে পড়ে আছে, 'ভবানীশঙ্কর' ও 'কড়কবিজলী'। তাও বোধহয় তাদের সরান যায়নি বলেই।

রাণীমহালের সম্পর্কেও সেই একই কথা। একদা এই বাড়িটি

চারতলা ছিল। বর্তমান রাণীমহাল সেদিনের রাজপ্রাসাদের একটি অংশমাত্র। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে আগুন লেগেছিল এই প্রাসাদে এবং তার পরে আরও দু'বার তাতে আগুন লেগেছে। আজ সেই বাড়ি শহর-কোতোয়ালি। ঘরের প্রাচীর-চিত্র, দেয়ালের উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি জরাজীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ। সেই বাড়িতেই রাণী বাস করেছেন, সেখানেই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে।

রাণীর নিত্যপূজিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরটিও আজ অনাদরে একান্ত জীর্ণ দেহ। লছমীতালের প্রান্তে প্রান্তে যে ভাস্কর্য-শোভিত প্রস্তরের প্রাসাদ, মীনার ও ঘাটগুলি আছে তারা খসে খসে পড়ছে।

সমস্ত ঝাঁসী শহরে রাণীর স্মৃতিলাঞ্ছিত আরও অনেক জায়গা আছে যার সংস্কার প্রয়োজন।

ঝাঁসীতে সবচেয়ে সুরক্ষিত স্মৃতিসৌধ হচ্ছে জোকানবাগ। সেখানে নিহত ইংরেজ নরনারীদের স্মৃতি-ফলক উদ্যান দিয়ে ঘেরা। তার দরোজায় তালাবন্ধ।

সংস্কার ও রক্ষার সুবন্দোবস্ত আশু না করলে ক্রমশই ভেঙে পড়বে রাণীমহাল। কেল্লার অবস্থাও সেইরূপ হবে।

গোয়ালিয়ার ও লক্ষ্ণৌ-এ তাঁর নামাঙ্কিত দুটি রাস্তা আছে সত্য। কিন্তু আসন্ন ১৯৫৭-র পরিপ্রেক্ষিতে রাণীর স্মৃতিকে উপযুক্ত সম্মান দেবার জন্য তাঁর স্মৃতিবিজড়িত প্রাসাদ, কেল্লা এবং মন্দিরটির সংস্কার অবিলম্বে করা উচিত।

আমরা ভারতীয়। ভারতবর্ষ আমাদের দেশ। ভারতের গৌরবময় অতীত আমাদের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য আমরা জন্মসূত্রে পেয়েছি। ১৮৫৭-৫৮ সাল, ভারতের পরম গৌরবময় অতীতেরই এক পবিত্র অধ্যায়। স্বাধিকার রক্ষার বেদীমূলে বহু লক্ষ মানুষের আত্মাহুতিতে পবিত্র সেই গরিমাময় অতীতকে কোন্ পাদপীঠে রেখে দেখব, কোন্ পটভূমিকায় তাকে চিনব?

ঝাঁসীর রাণী অন্য দেশের বীরাঙ্গনা হলে কি হত সে প্রসঙ্গ অবান্তর। তিনি ভারতীয় ছিলেন এবং ভারতবর্ষে তাঁর স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত নেই সে কথা অতি নির্মমভাবে সত্য।

কালস্রোতে জীবন যৌবন ধনমান সব ভেসে যায় সত্য।

কিন্তু বর্তমানের মানুষের কাছ থেকে তার অতীতকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায় না। উত্তরপুরুষের হাতে তুলে দিতে হয় অতীতকে। সে অতীত-সম্পদ কখনও লুপ্ত হয় না, তার মূল্য কখনও ম্লান হয় না।

সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে অভিনন্দিত করবার দিন সমাগত। এ সামান্য বিষয় নয়, এ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের মানুষের এক সচেতন অভ্যুত্থানের কথা। তাকে সম্মান জানাতে হবে, বীরকে দিতে হবে প্রাপ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি। ১৮৫৭ সাল হল রাণীর পটভূমিকা। সেই চালচিত্রে মূর্তি রেখে দেখলে তবে মিলবে প্রতিমা। একটিকে জানলে অপরকে জানা হবে। সেই দিনকে জানবার, তার সত্যিকারের ইতিহাসের উপাদান খুঁজে বার করবার এবং তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার দাবি নিয়ে ১৯৫৭ সাল সমাসন্ন। কিন্তু ১৮৫৭-৫৮-এর সত্যস্বরূপ কি? বিস্মৃতির কোঠা থেকে অতীতকে টেনে এনে যদি দেখা যায় তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই, তাহলেও নির্মম সেই সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে চলবে না। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ধরে নিয়ে জাগ্রত মানসের কাছ থেকে এই দাবি সরিয়ে রাখা আর সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের মানুষের নবজাগ্রত মানসের সেই দাবি দুর্নিবার হয়ে উঠুক। এক শতকের বিবর্ণ যবনিকা উত্তোলিত হোক। পূর্বতন বিদেশী শাসকের লেখনীর সীমাবদ্ধ কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করুক আমাদের ইতিহাস। নিঃসন্দেহে তার ওপর আমাদের দাবি অগ্রগণ্য, কেননা সেই ইতিহাসই আজ আমাদের উত্তরাধিকার। বিস্মৃতির আবরণ ভেদ করে ১৮৫৭-কে ভাল করে দেখবার দাবি নিয়ে তাই ১৯৫৭ আসন্ন।

Innes McLeod.	The Sepoy Revolt.
Sleeman Col.	Rambles and Recollections.
Ball Charles	History of the Indian Mutiny. (2 Vols.)
Malleson G. B.	Indian Mutiny of 1857.
Kaye and Malleson	History of the Sepoy war in India. (6 Vols.)
G. D.	Indian Revolt.
Lowe Thomas	Central India during the Rebellion of 1857-58.
Keene	Fifty Seven.
Meade	Sepoy Revolt.
Trevellyan G. O.	Cawnpore.
Sylvester J. H.	Recollections of the Compaign in Malwa and Central India.
Forrest G. W.	History of the Indian Mutiny. (3 Vols.)
Thompson E.	The other side of the Medal.

Rice Holms T. — The History of Indian Mutiny.

Thompson Mowbray — The story of Cawnpore

Burne O. T. — Clyde and Strathnairn.

Thornton's Gazetteer of India.

Central India Gazetteer.

Papers Relative to the Annexation of states presented to both houses of Parliament 1854.

Selection from State papers preserved in the Military Department edited by Forrest G. W. (4 Vols).

Dalhousie's Administration of British India.

A plea for the Princes of India.

Evans Major — Retrospect & Prospect of Indian Policy

Taylor Meadows — Seeta

Glliean — Rane

Macpherson — Memorials of Services in India

Macarthy — History of our Times

মিত্র চণ্ডীচরণ — ঝাঁসীর রাণী (বাংলা)

ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ — ঝাঁসীর রাণী „

গোডসে বিষ্ণুভট্ট — মাঝাপ্রবাস (মারাঠি)

দত্তাত্রেয় বলবন্ত্ পারসনীস — ঝাঁসী সংস্থানচ্যা মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ যাঞ্চে চরিত্র (মারাঠি)

ত্রিবাড়ী গোরেলাল	বুন্দেল খণ্ড্ কা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (হিন্দী)
মিশ্র শ্যামরঙ্গ	বুন্দেলা কা শূর কহানী (হিন্দী)
বর্মা বৃন্দাবনলাল	ঝাঁসী-কী-রাণী (হিন্দী)
কবি ভূপৎলাল	বীরাঙ্গনা রাসো (বুন্দেলখণ্ডী)
কুড়রা কল্যাণসিং	লক্ষ্মীবাঈ কী রাসো